দুলেন্দ্র ভৌমিক

কুরু-পাণ্ডব

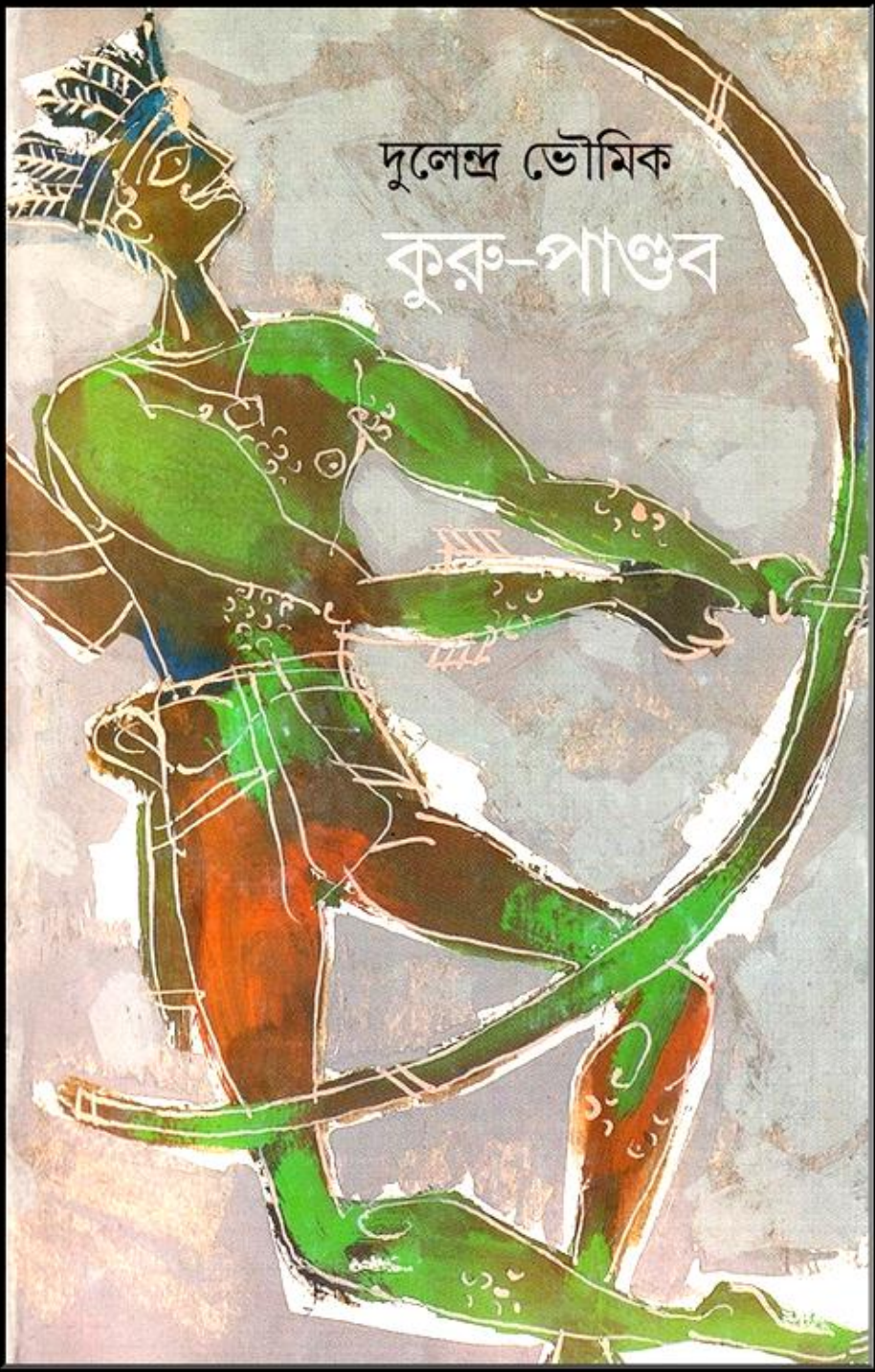

কদমখণ্ডীর ছোট্ট চৌহদ্দিতে বংশানুক্রমে নিরুপদ্রব দিন কেটে যাচ্ছিল যাদের, সেই নারান-গফুরেরা কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি, এমন ভয়ঙ্কর দিনকাল আসবে একদিন। তাদের অভাব ছিল, অভিযোগ ছিল ; জাতপাত কি ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারও যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে-ভেদাভেদ এমন সর্বগ্রাসী ছিল না, সকলের মধ্যে ছিল না। নারানের বাড়িতে গফুর থেকেছে, খেয়েছে ; গফুরের বাড়িতে নারানও। কিন্তু কীভাবে বদ্‌লে গেল দিনকাল। কি গ্রামে, কি শহরে।

বদ্‌লে দিল এ কালের শকুনিরা, যাদের নানান বেশ, নানান পাশার চাল। কখনও রাজনৈতিক নেতা, কখনও মাস্তান, কখনও প্রোমোটার। কখনও তিন মিলে এক। কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বকে আ[illegible] টিকিয়ে রেখে তারা [illegible] ছিয়ে নিতে চায় নিজেদের আখের। অসংখ্য নারান আর গফুরের মধ্যে বারবার তাই তুলে দেয় অবিশ্বাসের দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল, প্ররোচিত করে আত্মঘাতী যুদ্ধে। কীভাবে, তারই এক জীবন্ত ও মর্মন্তুদ আলেখ্য এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন দুলেন্দ্র ভৌমিক।

১৯৪৪-এর আগস্টে জন্ম, অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। ১৯৪৮-এ দেশত্যাগ। স্থায়ীভাবে বসবাস চব্বিশ পরগনার রহড়ায়। কৈশোর কাটে রহড়া গ্রামে। যেটা এখন শহরে পরিণত। স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের নৈশ বিভাগে কিছুকাল পড়াশোনার সুযোগ মিলেছিল।

জীবিকা : সাংবাদিকতা, 'আনন্দলোক'-এর সম্পাদক।

ছোট গল্প দিয়ে লেখার হাতেখড়ি। প্রথম মুদ্রিত গল্প 'বধ্যভূমি'। নানান লিটল ম্যাগাজিন, আনন্দবাজার, সাপ্তাহিক বসুমতী-তে বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্প ছাড়া আর যেটি লিখে থাকেন, তা হল নাটক। গ্রন্থাকারে প্রথম বই 'উলুখাগড়া', প্রথম উপন্যাসও এটা। শারদীয়া 'আনন্দলোক'-এ প্রকাশিত।

অন্যান্য লেখা : নাটক, প্রবন্ধ এবং চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখা।

শখ : রাত জেগে লাগাতার আড্ডা দেওয়া—অবশ্য এই সময়ে যদি কেউ সঙ্গী হতে রাজী হয়।

প্রচ্ছদ ☐ সুব্রত চৌধুরী

কুরু-পাণ্ডব

দুলেন্দ্র ভৌমিক

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৪
প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

ISBN 81-7215-335-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৩০·০০

শেষ বেলার আকাশটা ইদানীং অন্যরকম হয়ে যায়। একসময় দেখা যেত পাকা কামরাঙার মতো রঙে পশ্চিমের আকাশটা ছেয়ে যেতে থাকে। বাঁশ বাগানের মাথার ওপর দিয়ে সেই রঙ যেন নেমে আসে সোনা দিঘির জলে। কিন্তু অনেক দিন সে রকম হয় না। বিকেলের আকাশটা এত রুক্ষ হতে কদমখণ্ডীর মানুষরা কখনও দেখেনি। মনে হয় কোন দানব অথবা দত্যি যেন দু'হাতে গোটা আকাশটা অকারণে ঘষে ঘষে একেবারে অন্যরকম করে দিয়েছে। আকাশটা সকাল থেকে রোদে জ্বলে আর সেই জ্বলুনি ছড়িয়ে পড়ে কদমখণ্ডীর মতো আরও চার-পাঁচটা গ্রামে। খাল, পুকুর আর ডোবার জল শুকোতে শুকোতে পায়ের পাতায় নেমেছে গেল বছর। গত বর্ষাটা একেবারে বন্ধ্যা। দু'চার খণ্ড মেঘ কখনও ভেসে এসেছে বটে কিন্তু গাঁয়ের মাথায় বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। হা-হুতাশ শুরু হয়েছিল গত সনেই। কিন্তু সে আর নতুন কথা কি! ভগবানই তো সব। তিনি দয়া না করলে বর্ষণ হয় না। রাম-রহিমে মিলে মন্দিরে আর মসজিদে, ওলাইচণ্ডীতলায় অথবা পীর বাবার দরগাতে যতই পুজো দাও আর সিন্নি চড়াও না কেন ভবি ভোলবার নয়। কদমখণ্ডীর সনাতন বলে, 'ভগবানটা একটা খচ্চর!'

জিভ কাটে আতায়ুর। দু'হাতে নিজের কান ধরে বলে, 'এমন কথা মুখেও এনো না। ওতে পাপ লাগে। তাঁর বিচার বড় কঠিন। মানুষের সাধ্যি নেই যে তা বোঝে।'

সনাতন মাঝে-মাঝে বেপরোয়া হয়ে যায়। সে বলে, 'যা বোঝার সাধ্যি মানুষের নেই, তা দিয়ে আমার কি কাম। আমি অতশত বুঝি না।'

সনাতনের কথা ফেলতে পারে না আতায়ুর, তবুও মনে ভয় হয়, আল্লার নামে ও সব কথা কেউ বলে নাকি!' সে হাবাগোবা আর একরোখা সনাতনকে বলে, 'দেখ, তেনার মতি-গতি মানুষে বোঝে না। কিন্তু তিনি কুপিত হলে আমাদের সর্বনাশ।'

সনাতন লুঙির ভাঁজ থেকে বিড়ি বার করে ধরাতে ধরাতে বলে, 'যাঁকে শালা এ জন্মে চোখেই দেখিনি তারই ভয়ে কেঁপে মরছি। তার চাইতে বেশি ভয় হয় তেনাদের, ওই পঞ্চায়েতের বাবুদের। এক-একজন লাটসাহেবের বড় নাতি। ইচ্ছে হয়....'

আতায়ুর মুখে হিস্‌স করে শব্দ তোলায় সনাতন থেমে যায়। আতায়ুরের চোখ যে দিকে সেইদিকে তাকিয়ে দ্যাখে রশিদের রিক্সায় তেনারা দু'জন আসছেন। সনাতন মনে মনে বলে, 'যেন কেলেপানা বড় ঠাকুর। গাঁদের অস্থি-মজ্জা চিবিয়ে খাচ্ছেন।'

এ সব কথা শুধু মনে-মনেই বলা যায়। মুখে বলার সাহস হয় না। দেবতাদের চাইতেও এনাদের ক্ষ্যামতা বেশি। রিক্সাটা ওদের চোখের সামনে দিয়ে তরতরিয়ে চলে

গেল। যতক্ষণ দেখা গেল ওরা দু'জনে দেখল, তারপর চোখের দৃষ্টি খাটো করে এনে আতায়ুর বলল, 'বিড়িখানের শেষটান দিও।'

রাজপুরের হাট থেকে কেনা বিড়ি। তিনটখান মোক্ষম টানেই লালসুতোয় আগুন ছুঁয়ে যায়। সনাতন তাই তাড়াতাড়ি বিড়িটা আতায়ুরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'টান মারো।'

কদমখণ্ডীর চারপাশে রুক্ষতা জাগছিল গেল সন থেকেই। এখন যেন তার চেহারায় খটখটে শীর্ণতা। থেকে-থেকে মাতাল হাওয়া ওঠে বিকেলে। সেই হাওয়ায় রাজ্যের ধুলো শুকনো পাতা আর জঞ্জাল উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যায় গ্রামের চারদিকে। পুকুর আর ডোবা থেকে পাঁকের গন্ধ উঠতে থাকে। ওই গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে নারাণের বৌ পদ্মর। ছ' মাসের পোয়াতী পেট। এই গন্ধে বমি আসে।

নারাণ বোঝে, তবুও মাঝে-মধ্যে খেপে গিয়ে বলে, 'অত আদিখ্যেতা করিস নে বৌ। গাঁ-গঞ্জে বৃষ্টি-বাদল না হলে অমন হয়েই থাকে।'

পদ্ম এই রকম সময় তার স্বামীকে বুঝতে পারে না। মানুষটা সময়-সময় কেমন বদলে যায়। যেন আশ্বিনের আকাশের মতো। তা সেই নারাণ দাঁড়িয়েছিল বিলকান্দার জলার ধারে। কে বলবে এটার নাম বিলকান্দা। গলা সমান জলের তলায় টনটনে মাটি আর সেই মাটিতে আগাছার জঙ্গল। এখানে শীতের মরশুমে ঝাঁক ধরে পাখি নামে। সেই পাখি ছররা বন্দুকে মারবার জন্য চার চাকার মোটর গাড়ি চেপে বাবুরা আসেন কলকাতা থেকে। বলিহারি টিপ বাবুদের। ছররা থেকে গুলি বেরুবার আগেই জলের পাখি আকাশে উড়ে যায়। শেষমেষ ওই ছররা চালাতে হয় নারাণদের। তারপর বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে নেমে সেই জল কেটে-কেটে নিয়ে আসতে হয় মরা পাখিদের। বড্ড কষ্ট হয় নারাণের। কিন্তু এত সাজগোজ করে শিকারে এসে পাখি না পেলে বাবুদের কষ্ট আরও বেশি। তখন মন না চাইলেও পেটের চাহিদাতে বাবুদের কষ্টটাকেই বুঝতে হয়। পেট বড় বিষম বালাই। দিনভর তার চিন্তাতেই হেদিয়ে মরে গাঁয়ের লোকেরা।

নারাণের চোখ এখন স্থির হয়ে আছে। মুখ আকাশের পানে তোলা। বিলকান্দার শুকনো মাটিতে হাওয়া লেগে আগাছার জঙ্গল শনশন শব্দে নড়ছে। শুকনো নারকোল পাতায় হাওয়ার খরখরে আওয়াজ। বাঁশবাগানের ভিতর থেকে খট্টাশটা বেরিয়ে এসে হঠাৎ কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু নারাণের কান, চোখ অথবা মন এখন ওসব দিকে নয়। সে দেখছে আজকের আকাশটাকে। ডাঙ্গাডিঙ্গলের মাথার ওপর একখণ্ড সাদা মেঘ যেন মেঘেদের থেকে দলছুট হয়ে ভাসতে ভাসতে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হবে এক ধামা তুলো। মেঘ হল আকাশের শোভা। ন্যাড়া আকাশ দেখে দেখে চোখ পচতে লেগেছে। নারাণের দুই চোখ এখন ডাঙ্গাডিঙ্গলের আকাশটাকে দেখছে। ওই আকাশের বুকে এক ধামা তুলোর মতো মেঘটা দাঁড়িয়ে। ওই মেঘ থেকে কি জল নামবে? নামলে দু'সনের শুকনো মাটির কতটুকু ভিজবে?

নারাণের মতো কদমখণ্ডীর আরও কেউ-কেউ দেখছে ওই সাদা মেঘের টুকরোখানাকে। ওরাও তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। রাস্তার পাশে পঞ্চায়েতের চাপা কল। সেই কলে জল নিতে এসে নারাণের বৌ পদ্মও মাথার ঘোমটা সরিয়ে ডাঙ্গাডিঙ্গলের আকাশের দিকে তাকাল। চাপা কলের চারপাশে এ সময় বৌ-মেয়েদের ভিড় হয়। ইঁদারার জল নীচে নামতে নামতে এখন তলার মাটি চাটছে। সেই তলানি পর্যন্ত বালতি পৌঁছয় না, পৌঁছে দিলেও জল মেলে না। কয়েক খাবলা মাটি মাখা ঘোলা

BanglaBook.org

জল, যা মুখেও তোলা যায় না। তাই পঞ্চায়েতের চাপা কলে সকাল থেকে রাত অব্দি ভিড় যেন সরতেই চায় না। বিকেলের দিকে ভিড় বাড়ে মেয়ে-বৌদের। সবাই একবার করে আকাশের দিকে তাকায়। এ যেন রোজকার অভ্যেস। কিন্তু আজ সবার চোখই আটকে গেছে আকাশের গায়।

নারাণের মতো আরও যারা ডাঙ্গাডিঙ্গলের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল তারা এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে মাথা নামিয়ে ঘরের দিকে হেঁটে যায়। তাদের চোখের সামনে সূর্য ডোবে, বিকেল গাঢ় হতে হতে সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার জমাট বাঁধতে থাকে। চৌধুরীদের রাধাগোবিন্দের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। মসজিদের আজানধ্বনি অন্ধকারে ভেসে ভেসে চলে যায় বিলকান্দার শুকনো মাঠের দিকে। একটু পরে ঘোষালদের বাঁশবাগান থেকে শেয়াল ডাকতে থাকে এবং তারও পরে বাঁশবাগানের মাথার ওপর একফালি চাঁদ ভেসে ওঠে। এমনি করেই হেমন্তের পাতা ঝরে যাওয়ার মতো কদমখণ্ডীর মানুষদের একটা-একটা করে শুকনো দিন শেষ হয়ে যায়। সারাদিনের তাপে মাটি তেতে থাকে। রাত্তিরে মাটি থেকে যেন গরম নিঃশ্বাসের মতো হলকা বেরোয়। নারাণের বৌ পদ্ম ঘরের মেঝেতে খেজুরপাতার চাটাই বিছিয়ে কেবলই হাঁস-ফাস করে। বারান্দায় শুয়ে শুয়ে নারাণ তাই শোনে। মাটির ঘরে বাঁশের দরজা। দরজার ফাঁক-ফোকর বোজাবার জন্যে ভিতর থেকে একখানা ক্যাঁথা ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে এখন আর সে সবের দরকার নেই। দরকার ছিল গোড়ার দিকে। যখন গোকুলপুর থেকে সবে বিয়ে করে এনেছিল পদ্মকে। সবে আঠারো পেরিয়ে উনিশে যাচ্ছে। ওই বয়সে মেয়েদের লজ্জা থাকে একটু বেশি। ঘরে সারারাত্তির বৌ নিয়ে শুতে হলে দরজায় অমন ফাঁক-ফোকর রাখা যায় নাকি? তাই ঘরের ভিতর থেকে একখান ক্যাঁথা ঝুলিয়ে দেওয়া। পদ্ম ছিল বড্ড ঘুম কাতুরে। দুপুরে ভাত খেয়ে ভাতঘুম দিতো আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। আবার রাত্তির ন'টাও বাজতে পারতো না। দাওয়ায় বসে নারাণের পিঠের ওপর মাথা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়তো। সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে বিকেল বেলায় স্নান করত নারাণ। তারপর ভেলিগুড়ের চায়ের সঙ্গে খান চারেক আটার রুটি। ছোট একখানা এনামেলের মগ। সেই মগ ভর্তি চা আর তাতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে রুটি খাওয়া। বারান্দার এক কোণে উপুড় হয়ে বসে রান্না করতো পদ্ম। আর বারান্দার অন্য কোণে বসে নারাণ ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা বাঁশি এনে বাঁশি বাজাতো। জীবনে এটাই একটা মস্ত শখ নারাণের। একসময় স্বপ্ন দেখতো, ব্রজগোপালের 'বিনোদিনী অপেরায়' সে হবে বংশীবাদক। কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয়নি। তবে দোলে, রথযাত্রার উৎসবে আর মাঘী পূর্ণিমায় দরগাতলাতে পাড়ার ছেলেদের যে যাত্রা হয় তাতে বাঁশি বাজাত নারাণ। হ্যাঁ, বাজাতো। এখন আর বাজায় না। কয়েক বছর আগে কলকাতার চিৎপুর থেকে দল এনে গাওনা হতো, এখন তাও বন্ধ। এখন রাত ভোর গানের জলসা। গান আর ঠ্যাং নেড়ে নেড়ে কেমন যেন একটা নাচ। কত রকমের বাজনা আসে গাড়ি বোঝাই করে। এ সব জায়গায় কে তাকে বাঁশি বাজাতে ডাকবে? মনের দুঃখে তাই বাঁশিটা রেখেছিল টিনের সুটকেসে। বিয়ের পর পদ্ম একদিন ওটা খুঁজে পেল।

সেটা ছিল মাঘের মাঝামাঝি। বিলকান্দার বিলে পাখিদের মেলা। কলকাতা থেকে বাবুরা আসেন পাখি শিকার করতে। শখের শিকারি। গাড়ি ভর্তি খাবার, বিলেতি মদের বোতল, লম্বা-লম্বা বোতলে বিয়ার। গাড়ি এসে দাঁড়ায়, বিলকান্দার খালের ধারে। জায়গাটার নাম ষষ্ঠীতলা। ওখানে এক জোড়া অশ্বত্থ গাছের নীচে ষষ্ঠীঠাকরুণের ছোট্ট

BanglaBook.org

মন্দির। মাটি থেকে হাত-চারেক উঁচু মন্দিরটা। এখন অবশ্য তাতে ফাটল ধরেছে। গাঁয়ের কারও বিয়ে হলে একবার ষষ্ঠীতলায় এসে প্রণাম করতেই হবে। সন্তান হবার পর পুজো দিতে হবে ওইখানেই। আর যাদের সন্তান হতে চায় না, তারা এসে ভর সন্ধেবেলায় পিদিম জ্বেলে ষষ্ঠীমায়ের পুজো দেয় আর গাছের গায়ে লাল সুতো বেঁধে মানত করতে হয়। সন্তান হওয়ার পর বাতাসা আর মুড়কি দিয়ে পুজো, পাঁচখানা মাটির পিদিমে ঘি না হয় তেল ঢেলে পিদিম জ্বালাতে হয় আর খুলে দিতে হয় লালসুতোর গেরো। তা ওই ষষ্ঠীতলাতেই কলকাতার বাবুদের গাড়ি এসে দাঁড়ায়। পাশেই ঘোষালবাবুদের আড়তখানা। পাট, পাটালিগুড়, সরষে, বিলকান্দার বিলের ট্যাংরা আর পারসে মাছ, ধান আর খেজুরপাতার চাটাই সব টেম্পো করে কলকাতায় চালান হয় ওই আড়তঘর থেকেই। কলকাতার বাবুদের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা যাদের বেশি ঘোষালরা তাদেরই একজন। ছেলেদের মধ্যে বড়জন ছাড়া কেউ বাপের ব্যবসায়ে জড়িয়ে নেই। মেজটা কলকাতায় লেদ মেশিন বসিয়ে কি সব যেন বানায়-টানায়। ছোটটা এখনও কলেজে পড়ে। মেয়েরাও গাঁয়ে আসে ছুটি-ছাটায়। কলকাতার বাড়িতেই ওদের নাকি থাকার ব্যবস্থা। বিলকান্দার গহীন খালে যাদের ডিঙ্গি আর নৌকা চলে তাদের মধ্যে ঘোষালরা হলেন বড় শরিক। ছ'খানা বড় নৌকা আর তিনখানা ডিঙ্গি বাঁধা থাকে ষষ্ঠীতলার ঘাটে। মাছ ধরার কাজে ওগুলো বড় কাজে দেয়। বড় নৌকাগুলি বিলকান্দার খাল ধরে ভাসতে ভাসতে চলে যায় দক্ষিণে। বড় নদীর বাঁকে পড়ার আগে পর্যন্ত বিস্তর মাছ ওঠে নৌকাতে। পাটাতনের নীচে সেই মাছ বোঝাই করে নৌকা ফিরে আসে ষষ্ঠীতলায়। নৌকা আসবার আগে পাইকারের টেম্পো পৌঁছে যায় ষষ্ঠীতলার মাঠে। তারপর মাছ দেখা, একটু টেপাটেপি, দরদাম তারপর সব মাছ টেম্পোতে তুলে দেওয়া। ডিঙ্গিগুলো খাল বেয়ে খানিকটা গিয়ে ঢুকে পড়ে বাঁয়ে। ঢোকার মুখে যে খাঁড়ি, তাতে জঙ্গল দিয়ে আটকানো। বাইরে থেকে দেখে নতুন লোক কিছুই বুঝবে না। না বুঝে ডিঙ্গি নিয়ে ঢুকতে গিয়ে নাকাল হতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, গহীন খাল থেকে বিলকান্দার জলায় ঢোকার রাস্তাটাই খুঁজে পাবে না অচেনা লোকেরা। ওই বিলে ঢুকতে পারে শুধু ঘোষালবাবু, চৌধুরীবাবু আর খালেদ মিঞার ডিঙ্গি। অন্যদের বিলকান্দার বিলে গিয়ে মাছ ধরা বারণ। কেন বারণ সে কারণ নারাণ জানবে কেমন করে। বাঁশের চালার ওপর কলাগাছের ভেলা তার ওপর কচুরিপানা আর ঝোপ-ঝাড় চাপিয়ে খাঁড়ির মুখটা আটকানো। বাঁশের চালার দু'প্রান্তে নাইলনের দড়ি দিয়ে খাঁড়ির মুখে বসানো দু'প্রান্তের দু'টি শালখুঁটির সঙ্গে বাঁধা। শীতকালে এক গলা জল থাকে বিলকান্দার বিলে। খাড়ির মুখে একমানুষ জল। শালখুঁটি থাকে জলের তলায়। তার ওপর কচুরিপানার ঢাকনা স্তূপ করা। যেন বাইরে থেকে কিছু বোঝা না যায়। যারা যেতে পারে, তাদের ডিঙ্গি যাবার আগে দড়ির ফাঁস খুলে নেয়। ভিতরে ঢুকে আবার ফাঁস পরিয়ে দেয়। খাল থেকে দেদার ট্যাংরা, মৌরলা, পুঁটি আর পারসে এসে ঢোকে বিলকান্দার বিলে। দো কাঠি জাল পেতে সেই মাছ ধরে নেয় তিন শরিকে। তারপর ডাঙায় উঠে ভাগাভাগি। ধানকাটার পর ক্ষেতের কাজ ফুরিয়ে গেলে বিলকান্দার বিলে মাছ ধরার কাজ পায় নারাণ। দো কাঠি জাল ছাড়াও নানা কায়দায় ছোট মাছ ধরতে পারার ক্ষমতা আছে নারাণের। ঘোষালদের কাছে তাই নারাণের কদর আছে। কলকাতার বাবুরা পাখি শিকারে এলে ঘোষালবাবুর বড় ছেলে নারাণকেই ডেকে নেয়। শিকারিবাবুরা এলে নারাণের খুব আহ্লাদ হয়। খাটুনি যথেষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু বাবুরা

BanglaBook.org

যাবার সময় বিশ-পঁচিশ টাকা বখশিস হিসেবে দিয়ে যান। তেনাদের আনা টিফিনকৌটো থেকে খাবার দেন। আর ? হ্যাঁ, সেটা বড় মজার। কলকাতা থেকে কেনা বিলেতি মদ নিজে থেকে ঢেলে দিয়ে বলেন, 'খা, খেয়ে নে, গা গরম থাকবে।'

তা সেবার সাত সকালে সাইকেলে করে এসে ঘোষালবাবুর লোক খবর দিল, 'বাবু ডেকেছেন-। কলকাতা থেকে শিকারি পার্টি আসছে। তোকে ডিঙ্গি বাইতে হবে।'

তখন সবে পুব আকাশে আলো ফুটেছে। চৌধুরীদের রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চূড়ায় কচি আলো। কলাবাগানের সবুজ পাতায় আলোর চকচকানি ফুটছে। নারাণ একবার ঘরের ভিতরে তাকাল। শীতের রাতেও পদ্ম ব্লাউস খুলে শোয়। ব্লাউসটা থাকে বালিশের পাশে। পদ্ম বুকের আঁচল দাঁতে চেপে বুক আড়াল করে ব্লাউস পরছে। নারাণের কাছে বড্ড লজ্জা লাগে। মেয়েদের মুখের চাইতেও বুক দুটো বেশি ফর্সা হয় কেমন করে! পদ্ম ঠিক ফর্সা নয়, ওকে বলা যায় চকচকে শ্যামলা। কিন্তু ওর বুক দুটো শরীরের তুলনায় দিব্যি ফর্সা লাগে। ভগবান মেয়েদের শরীরের খাঁজে খাঁজে এত ধাঁধা পুরে রেখেছে যে, নারাণ অবাক হয়ে যায়। মরুভূমিতে নাকি আলেয়া বলে একটা ব্যাপার আছে। তা সেটা যে কেমন তা নারাণ জানে না। কিন্তু বিলকান্দার জলাতেও এক রকমের আলেয়া তৈরি হয়। ঘোষালবাবুদের বড় খোকা একবার আলেয়া ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়েছিল। কিছু কিছু বুঝেছিল। তার মনে হয়েছিল অমন আলেয়া বিলকান্দার জলাতেও আছে। বিয়ের পর বুঝেছে মেয়েদের শরীরেও আলেয়া আছে। পুরুষদের নাকাল করে ঘুরিয়ে মারে সেই আলেয়া।

নিজের বাড়ি থেকে বিলকান্দার ষষ্ঠীতলার মোড় তা প্রায় দু-আড়াই কিলোমিটার। ওটুকু পথ হেঁটেই যায় নারাণ। কিন্তু এবার ঘোষালবাবুদের শিবু কাহার সাইকেল রিক্সাভ্যান এনেছে। বৌয়ের সঙ্গে দুটো কথা সেরে নারাণ উঠে বসল রিক্সাভ্যানের ওপর। ঘোষালবাবুদের বড় খোকা তখনও আড়তে আসেনি। ন'টা নাগাদ তাঁর আসার টাইম। আজ তিনি এলেন সাতটা নাগাদ। নারাণকে ডেকে বললেন, 'কলকাতার বন্ধুরা আসছেন। ওনাদের সঙ্গে আমাদের লেনদেনের কারবার। খাতির যত্নে রাখিস।'

নারাণ জানে বাবুরা এলেই ডিঙি বাইতে হবে। ঢুকতে হবে বিলকান্দার বিলে। কখন কি জুটবে কে জানে। তার চাইতে ড্যাঙ্গায় থাকতে থাকতেই কিছু পেটে পুরে রাখা ভাল। লতিফের চায়ের দোকান ততক্ষণে খুলে গেছে। কয়লার উনুনের ওপর পাছাপোড়া কেটলিটা চাপানো। মাথায় আনাজের ঝুড়ি নিয়ে যারা যাবে সদর হাটের বাজারে তারা এখানেই মাথার বোঝা নামিয়ে লতিফের দোকান থেকে চা খেয়ে নেয়। সে জন্যেই কাকভোরে উনুন জ্বলে লতিফের। নারাণ গিয়ে এক গ্লাস চা আর দু'খানা তক্তা বিস্কুট খেল। জামার পকেটে তিনখানা মোটে বিড়ি। সারাদিনের জন্যে আরও অন্তত খান দশেক চাই। নারাণ বিড়ি কিনে নিয়ে ডিঙ্গিতে গেল। ডিঙ্গির ভিতরে দড়ি বাধা একখান দোয়াত আছে। ওতে কালি নয়, সরষের তেল রাখে নারাণ। দোয়াতটা নিয়ে ঘোষালবাবুর আড়তের সামনে এল। বড় খোকাকে দেখে নারাণ দোয়াতটা দেখিয়ে বলল, 'বাবু, এট্টু তেল চাই।'

বড় খোকা দোকানের একজন কর্মচারীকে ইশারা করে কাছে ডাকলেন। কাছে আসার পর বললেন, 'নারাণের পাত্রে এট্টু তেল দে।'

দোয়াতের গলা পর্যন্ত সরষের তেল ভরে দিয়ে দোয়াতটা ফেরত দিল নারায়ণকে। নারাণ দোয়াতের মুখটা ভালভাবে আটকে নিয়ে দোয়াতটা রেখে এল ডিঙ্গির ভিতরে।

BanglaBook.org

এখন আর নারাণের কোন কাজ নেই। এখন শুধু তেনাদের জন্য অপেক্ষা। তেনারা মানে শহর কোলকাতার বাবুরা। তা সেই তেনারা এলেন বেলা আটটা নাগাদ। একখানা সাদা রঙের মোটর গাড়ি করে। এ আবার যেমন-তেমন মোটরগাড়ি নয়। গাড়ির ভিত্‌রে কলের গান। বোতাম ঘুরিয়ে দিলেই গান বাজতে থাকে। শখ-আহ্লাদের কত রূপ, কত না বাহার। গাড়ি চলবে, সেই সঙ্গে চলবে গান। আড়তঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বড় খোকা। শুরু হয়ে গেল হাঁকডাক। তেনারা, মানে বাবুরা নামলেন। পা ঢাকা জুতো, মাথায় টুপি, গলায় মাফলার, রঙিন উলের সোয়েটার তার ওপর আবার কোট। শীত তো বিশ গজ দূর থেকেই সেলাম ঠুকে পালাবে। পয়লা চোটে এল চা-বিস্কুট। তারপর গরম কচুরি আর জিলিপি। বাবুরা খেয়ে-দেয়ে বিলকান্দার খালের ধারে এলেন। ডিঙ্গিতে প্রথমে তোলা হল বিলিতি মদের বোতল আর বিয়ারের পেটি। খাবারের সরঞ্জাম। তারপর জলের বোতল। এ গাঁয়ের জল খেলে নাকি শহরের বাবুদের ন্যাবা হবে। তারপর দুখানা ছররা বন্দুক নিয়ে চারজন উঠলেন ডিঙ্গিতে। ডাঙার ওপর থেকে চেঁচিয়ে বড় খোকা বললেন, 'নারাণ, ভাল করে বিস্তারা পেতে দে।'

ভাল বিস্তারা আর জুটবে কোথায় ? ছেঁড়া ক্যাঁথা আর চটের ওপর আড়ত থেকে আনা একখানা সতরঞ্চি পেতে দিল নারাণ। শহরের বাবুদের নাকি পাছা বড় নরম আর সোহাগী। মেয়েদের বুকের মতো। নরম-সরম না হলে তেনাদের বড্ড অসুবিধে। প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ ডিঙ্গিখানা খাঁড়ির গেট পেরিয়ে বিলে ঢুকল। বিল তো নয়, যেন সমুদ্র। যতদূর চাও কেবল টলটলে জল। সকালের রোদ পড়ে সেই জল যেন আয়নার মতো চিকচিক করছে। মাঝে মাঝে জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আগাছার ঝোপ। উত্তরের কনকনে হাওয়া নাকে-মুখে বরফের ছুরি চালাচ্ছে। বুকে কাঁপ ধরানো ঠাণ্ডা। বাবুরা শুধোয়, 'নারাণ পাখি কোনদিকে ?'

নারাণ বলে, 'আরও এট্টু এগিয়ে যাই।'

কালো রঙের কাদম্বরীরা ছোট-ছোট ঝাঁক ধরে জলার ওপর দিয়ে চক্কর মারছে। ঝাঁক ধরে কখনও নেমে আসছে জলের ওপর। কাগজের নৌকার মতো পাখিগুলো জলের ওপর ভাসছে। এগিয়ে যাচ্ছে জলার ওপর জেগে থাকা জঙ্গলের দিকে। দূর থেকে পাখিগুলোকে আর আলদা-আলদা মনে হয় না। যেন একখানা ছাই-ছাই রঙের চাদর জলের ওপর ফুলে আছে। বাবুরা বন্দুক তোলেন। নারাণ বলে, 'এখন নয়, ডিঙ্গিখান আরও এট্টু এগ্‌য়ে নে যাই।'

বিলে ঢোকার পর থেকেই বাবুরা এন্তার বিয়ার খেয়ে চলেছেন। একজন আবার ডিঙ্গির মধ্যে বোতাম টিপে গান বাজাতে যাচ্ছিল। নারাণ সাবধান করে দিয়ে বলল, 'মোটে আওয়াজ করবেন না। শব্দ পেলে ওরা উড়ে যাবে।'

কিন্তু বাবুদের নিশানা ঠিক থাকে না। ছররা থেকে গুলি বেরুবার আগেই পাখির ঝাঁক জল ছেড়ে ওপরের দিকে উড়ে যায়। অথচ সারা দিন-মান ঘুরে যদি চার-ছ'টা পাখি না মারতে পারে, তাহলে বাবুদের মান থাকে না। তাই একসময় ডিঙ্গি থেকে কনকনে ঠাণ্ডা জলে নামে নারাণ। নামবার আগে দোয়াত থেকে তেল ঢেলে দু হাতের তালুতে নিয়ে সারা গায়ে মাখে। তারপর জলের ওপর থেকে ঝোপ-ঝাড় আর খাঁড়ির মুখ থেকে ভেসে আসা কচুরিপানার পাতা তুলে মাথা আর গলা ঢাকে। ছররা হাতে নিয়ে পা টিপে-টিপে জল ভেঙে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় পাখির ঝাঁকের দিকে। বাবুরা তখন ডিঙিতে বসে বিয়ার আর মদ খেতে থাকেন। নারাণ এগিয়ে গিয়ে গলা জলে দাঁড়িয়ে বন্দুক চালায়। ছররার

BanglaBook.org

গুলিতে দুটো কখনও বা তিনটে পাখি জলে পড়ে থাকে, বাকিরা ঝাঁক ধরে উড়ে যায় শূন্যে। তখন সাঁতরে গিয়ে মরা পাখি তুলে এনে ডিঙ্গিতে বেঁধে রাখে নারাণ। ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপে নারাণ। বাবুদের দয়ার শরীর। তেনারা মারলেও পাখি তুলে আনার জন্যে তো নারাণকেই তেল মেখে জলে নামতে হবে। তাই ডিঙিতে উঠে আসার পর বাবুরা বলেন, 'নারাণ গা মুছে নাও। তোমার জন্যে রাম এনেছি। গলায় ঢালো, দেখবে শরীর গরম হয়ে যাবে।'

নারাণ এসব ব্যাপারে রপ্ত হয়ে গেছে আঠারো বছর বয়স থেকেই। তা সে সেইবার মাঘের মাঝামাঝি এমনটাই হল। সন্ধের আগে ষষ্ঠীতলার ঘাটে বাবুরা ডিঙ্গি থেকে নামবার আগে 'রাম'-এর বোতলটা দিয়ে গেলেন নারাণকে। আর পঞ্চাশটা টাকা। চোদ্দ খানা পাখি শিকার হয়েছে। যার মধ্যে আটখানাই মরেছে নারাণের হাতে। বাবুদের মেজাজ তাই খুব ফুরফুরে ছিল। বড় বড় ডিব্বায় ছিল বাবুদের দেদার খাবার। সব খেয়ে উঠতে পারেননি বাবুরা। কিছু খাবারও জুটেছিল নারাণের। শালপাতায় মুড়ে সেই খাবার আর অর্ধেক খাওয়া বোতলটা নিয়ে নারাণ এল নিজের বাড়িতে। সেদিন ছিল ছমছমে জ্যোৎস্নার রাত। পূর্ণিমার আগের দিন। কাল থেকে তো দরগাতলায় পীরের মেলা। নারাণ এসে খাবারটা দিল পদ্মর হাতে। নিজে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসল বারান্দায়।

পদ্ম এসে পিছন থেকে পিঠে হাত রাখল। নারাণের শরীর ক্লান্তিতে এলিয়ে আসছিল। তবু ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কী রে?'

পদ্ম বলে, 'আজ তোমার বাক্সে একখানা জিনিস খুঁজে পেয়েছি।'

ঘুরে বসে নারাণ। জানতে চায়, 'কেমন জিনিস?'

পদ্ম উঠে ঘরে যায়। এখন তার দু হাত পিছনে। মনে হচ্ছে ঘর থেকে হাতে করে কিছু একটা এনেছে। কিন্তু জিনিসটা কী?

নারাণ বলে, 'তোর হাতে কী?'

পদ্ম বাঁশিটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এটা কার? কে বাজাতো?'

নারাণ হাত বাড়িয়ে বাঁশিটা নেয়। বাঁশিটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'আমিই এক সময় বাজাতুম। এখন আর বাজাই না।'

পদ্ম বলে, 'কেন? বাজাও না কেন?'

নারাণ কেমন করে পদ্মকে সে কথা বোঝাবে। রাগ হলে বলা যায় কেন রাগ হয়েছে। কিন্তু অভিমান বোঝানো যায় না, ওটা যে নিজে নিজে বুঝে নিতে হয়। নারাণ বাঁশিটা হাতে নিয়ে চুপ করে থাকে। পদ্ম হাঁটু গেড়ে নারাণের সামনে বসে। তার চোখের দিকে চোখ রেখে কেমন একটা গলায় যেন পদ্ম বলে ওঠে, 'আজ জোছনার রাত। এটু বাজাও না। বিয়ের পর তো কখনও বাজাওনি।'

অনেকদিন পর আবার ঠোঁটে বাঁশি তোলে নারাণ। ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে নারাণ বাঁশি বাজায়। অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে পদ্ম। তার মাথার ঘোমটা খসে যায়। তার দু' চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে যায় জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশে। একসময় নারাণ থামে। পদ্ম এসে তার ঠোঁটে আঙুল বোলায়। শরীরের সব ক্লান্তি আর অবসাদ যেন পদ্মর আঙুলের ছোঁয়ায় মুছে যেতে থাকে। রাত্রে ক্যাঁথার নীচে শুয়ে নারাণের বুকের কাছে ঘন হয়ে আসে পদ্ম। ওর নাকটা নারাণের ঠোঁটের কাছে।

সেই থেকে আবার বাঁশি বাজানোর অভ্যেস ফিরে আসে নারাণের। কিন্তু ইদানীং বাঁশি বাজাতেও আর ইচ্ছে করে না তার। পদ্মর আগ্রহই একদিন তার পুরনো অভ্যাসকে

BanglaBook.org

জাগিয়ে তুলেছিল অথচ সেই পদ্মই এখন আর বাঁশি বাজাতে বলে না। বরং হাতে বাঁশি দেখলে বলে, 'রেতের বেলা বাঁশি বাজালে ঘরে লতা উঠে আসে। রেতে বাজিও না।'

নারাণ বুঝতে পারে, কদমখণ্ডীর আকাশটার মতো মানুষজনও কেমন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। পদ্মর মতো সবারই যেন রাগ বেড়ে যাচ্ছে। বুকের ভিতরে একটা জ্বালা। তারই জ্বলুনি সারা গায়ে। কদমখণ্ডীর মাটির মতো মানুষরাও তেতে থাকে। তবুও আকাশের দয়া হয় না। বিলকান্দার গহীন খালের জলে টান পড়ে। কেমন করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামানো যায় তার নিদান কেউ বাতলাতে পারে না। ব্রত-মানত, অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় মাটির কলসিতে জল আর আমের পল্লব দিয়ে বৃক্ষ দেবতার পুজো—এসব পাট চুকে গেছে গেল সনে। এ সনে পয়লা চোটে এল পুরুত। কদমখণ্ডী শুদ্ধ করার নামে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হোম-যজ্ঞ আর কাঁসর-ঘণ্টার বাদ্যি। তারপর উলাগড় থেকে আনা হল এক বিখ্যাত গাজিবাবাকে। কালো আলখাল্লা পরা গাজিবাবার লম্বা দাড়ি আর গলায় হরেক রঙের বড় বড় পুতির মালা দেখলে ভক্তির চাইতে ভয় জাগে বেশি। তা সেই গাজিবাবাও অনেকক্ষণ ধরে নাচোন-কোদন করে উলাগড়ে ফিরে গেল। এরপর এলেন ওঝা। নাটাগড়ের এই ওঝা একা এলেন না। এলেন সদলবলে। এসেই গ্রামের চারপাশে তাকাতে লাগলেন। তেনারে বসানো হল চৌধুরীবাবুদের চাতালে। কাঁধের বিশাল ঝোলা চাতালে নামিয়ে রেখে বললেন, 'তোদের অনেক আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। গাঁয়ে পা রাখা মাত্র টের পেয়েছি। ওরাও পেয়েছে। কী রে মালুম পাচ্ছিস?'

নিজের দুই চ্যালার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন তিনি। চ্যালা দুজন একই সঙ্গে বলে উঠল, 'টের আবার পাইনি। তালগাছের পাতার কাঁপুনি লক্ষ করেছেন?'

তিনি মিটিমিটি হাসছেন আর পা দোলাচ্ছেন। ডাঙ্গাডিঙ্গলের দিক থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে চৌধুরীদের জামগাছের মাথায় ধাক্কা খেয়ে উত্তরে উড়ে গেল। জামগাছের পাতাগুলো কাঁপতে লাগল। রাস্তার ধুলো উড়ল আর চৌধুরীদের গোয়ালঘরের দিক থেকে একটা নেড়িকুত্তা কেঁউ-কেঁউ করে ডেকে উঠল। তা এসব জিনিস তো হয়। কিন্তু তিনি যেন এসব জিনিসের মধ্যেই কিছু একটা খুঁজে পেলেন। যেন তেনার জন্যেই এমনটা হল। তাই তড়াত করে চাতালের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কমদখণ্ডীর নির্মেঘ আকাশটার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ যাত্রাদলের রাবণের মতো হা-হা—হা করে অট্টহাসি হাসতে আরম্ভ করলেন। সে এমনই হাসি যে থামতে চায় না। কোলের ছেলেপুলেরা তো ভয় পেয়ে কেঁদে ককিয়ে উঠল। হাসতে হাসতেই কাশি উঠল তেনার। কাশি থামলে আবার হাসি। এবার দুই চ্যালাও একই রকম ভঙ্গিতে হাসতে শুরু করে দিল। এই রকম হাসি-কাশি চলল প্রায় পাঁচ মিনিট। নারাণের মতো আফজল, বিষ্ণুপদ আর শিবু কৈবর্তরাও ঘাবড়ে গেছে। ওঝা কি তাহলে হেসে-কেশেই বৃষ্টি নামাবে।

হাসি থামার পর তিনি গর্জন করে উঠে বললেন, 'সাবধান! এ গাঁয়ের যা ক্ষেতি করবার করেছিস, আর ক্ষেতি হতে দেব না। আমাকে চিনিস? তোর বাপ-চোদ্দপুরুষ চেনে। গেল মাসে তোর বাপকে গোয়ালপাড়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি। এবার তোর পালা। আয় নেমে আয়— আয় বলছি।'

পাঠশালাতে পড়া না পারলে হাতে বেত মারার জন্যে ছাত্রকে যেভাবে ডাকে, ওঝা সেই রকম ভঙ্গিতে ডাকতে লাগলেন। আফজল নারাণের কানের কাছে মুখ এনে

BanglaBook.org

ফিসফিস করে বলে, 'কারে ডাকে রে ?'

নারাণ উত্তর দেয়, 'ভূত-পেত্নী গোছের কেউ হবে।'

আফজলের গলায় ভয়ের ছোঁয়া। সে বলে, 'তেনার ডাকে ওঁরা কি এইখানডায় আসবে নাকি !'

নারাণ মাথা নেড়ে বলে 'জানি না।'

অদেখা ভূতদের বকাবকি করে ওঝা ফের বসেন চাতালে। বলেন, 'গাঁয়ের মাতব্বর কারা ? তাদের ডাকো।'

গাঁয়ে এখন মাতব্বর বাছাবাছির মহা ফ্যাসাদ। পঞ্চায়েত প্রধানকে ডাকলে তিনি আসবেন কি না বলা মুশকিল। আবার যদি উপেন মণ্ডলকে ডাকা যায় তাতে আবার তেনার গোঁসা। গাঁয়ে-গাঁয়ে এখন সতীনের ঝগড়া। অবশেষে ডাকা হয় চৌধুরীমশাইকে। তিনি ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সর্বত্রই আছেন। জোত-জমি, মাছের পুকুর, বিলকান্দার অংশ, সুদের কারবার সব মিলে লোহার সিন্দুকে লক্ষ্মীকে পুরে রেখেছেন। তা টাকা হল গিয়ে একটা মস্ত বড় শক্তি। সবাই সেই শক্তির সামনে গড় করে। চৌধুরীবাবুরা কিছু করলে লোকে দোষ ধরতে সাহস পায় না—এমনকি তেনারাও। যাঁরা এই গ্রামখানাকে শাসন করেন, দেশের ভালর জন্য মিটিং-মিছিল করেন।

চৌধুরীবাবুকে দেখে ওঝা দু হাত তুলে পেন্নাম করলেন। করতেই হবে। চেহারাতেই তো বোঝা যাচ্ছে, এই চাতালের চারধারে যারা গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের চাইতে ইনি একেবারেই আলাদা। যিনি ভূতের বাপ-চোদ্দপুরুষকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে পারেন তিনিও জানেন কাকে পেন্নাম করতে হয় আর কাকে হুকুম দিতে হয়।

ওঝা গলার সুর নরম করে বললেন, 'এক ধামা আতপ চাল, এক ধামা সেদ্ধ চাল, এক কুনকে সরষে, সাতখানা হলুদ, তিনটে কাঠ, সেরখানেক বাতাসা, খই আর পাকাকলা চাই। ওদের এই সব দিয়ে বিশক্রোশ দূরের গাঁয়ে পাঠিয়ে দেব। আমি এবার মন্ত্রে বসব।'

দেদার মাল নিয়ে ওঝা চলে গেলেন সূয্যি ডোবার পর। যাবার আগে বলে গেলেন, 'কাল থেকে শুক্লপক্ষ শুরু হচ্ছে। গাঁয়ের আপদ আজ রাতেই গাঁ ছেড়ে উত্তরের ধলাডাঙ্গার মাঠ পেরিয়ে যাবে। ওরা গাঁ ছাড়ার বারো ঘণ্টার মধ্যে গাঁয়ে বৃষ্টি নামবে। নাগাড়ে তিন দিন চলবে এই বাদলা।'

বারো ঘণ্টার পর বারো দিন পার হয়ে গেল তবু আকাশে একবিন্দু মেঘের দেখা মিলল না। কেবল আজই ডাঙ্গাডিঙ্গলের মাথার ওপর এক ধামা তুলোর মতো একটুখানি মেঘ দেখা গিয়েছিল। পঞ্চায়েতের বাবুরা ধমক দিয়ে বলেন, 'ওঝার বৃষ্টি নামাবে ! তোমাদের আক্কেল দেখে হাসি পায়। তাহলে তো মরুদেশে ওঝারা গিয়ে কৃষিবিপ্লব ঘটিয়ে দিত। এ হল প্রকৃতির ব্যাপার। গাঁ বাঁচাতে হলে সবাই এক হয়ে থাকো। সদর থেকে রিলিফ আসবে। লরি করে খাবার জল আনারও ব্যবস্থা হচ্ছে। কত বছর ধরে বলে আসছি বিলকান্দার খালের মতো এই গাঁয়ের ভিতর দিয়েও একটা খাল কাটা হোক। তা না হলে গাঁ বাঁচবে না।'

আতায়ুর বলে 'ছেল তো, এ গাঁয়েও একখান খাল ছেল। সোনাইডাঙার খাল। ওই বড় মসজিদের পিছন পানে যে ঢালু পথখান দ্যাখেন ওটাই তো খাল ছিল।'

পঞ্চায়েতের বিপিন গড়াই বলেন, 'সে তো ছিল লর্ড ক্লাইভের আমলে। ক্ষমতা পেয়ে

BanglaBook.org

কংগ্রেসরা তো গ্রামের দিকে নজরই দিল না। সোনাইডাঙার খালের মতো এদেশের হাজারটা খাল হেজে-মজে নষ্ট হয়ে গেছে। কোন সংস্কার তো হয়নি। এবার গিয়ে দেখে এলুম গঙ্গাও বেহাল। মাঝগঙ্গা অব্দি চড়া। সেখানে ঘাসের জঙ্গল গজিয়ে গেছে। আশ্বিনের গঙ্গায় থইথই জল থাকার কথা। আমার ভাগ্নেরা বললে, কাঁধে করে দুর্গা ঠাকুর নিয়ে গিয়ে অনেকটা চড়া পেরিয়ে জলের নাগাল পাওয়া গেল। তা এমনই জল যে মা তাতে ডোবেন না। তাই জলের ওপর চিৎ করে মাকে শুইয়ে জল ছেটাতে হল। ওই গঙ্গাও একদিন শুকিয়ে মাঠ হবে।'

আতায়ুর যেন গঙ্গা শুকিয়ে যাওয়ার সংবাদে বিষম ঘাবড়ে গেল। সে বলল, 'বলছেন কি গড়াই দা, গঙ্গা হল গিয়ে মানুষের মা। আমার জ্ঞাতি ভাইরা তো ওই গঙ্গায়, টালির নৌকা বয়। ওদের কী হবে তাহলে!'

বিপিন গড়াই বলেন, 'ওদের হতে দেরি আছে, কিন্তু আমাদের তো দেরি নেই। ঘরে-ঘরে পেটের রোগ ছড়াচ্ছে। এর পরই মহামারী লেগে যাবে। পলাশডাঙায় তো আন্ত্রিক লেগে গেছে।'

আক্কাস মিঞা তার শনের মতো সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করে, 'ওই তোমার আন্ত্রিক রোগখানা কেমন বলদিনি। রোগ লক্ষণ শুনে তো মনে হয়, ওলাওঠা। যারে ভাল ভাষায় বলে কলেরা।'

সনাতন আক্কাস মিঞাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'রোগের নাম দিয়ে কী হবে চাচা! রোগ হলেই মরণ। তা সে যে নামেই হোক।'

মেঘ হলে তবে বৃষ্টির আশা। সেই আশা স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যেতে থাকে। এবার নতুন আশা, রিলিফ। কদমখণ্ডীর গাঁয়ের মানুষ এতকাল মুখ তুলে আকাশ দেখেছে। দু চোখ দিয়ে আকাশে মেঘ খুঁজেছে, এখন সেই দু চোখ দিয়ে রিলিফের গাড়ি খোঁজে। বিলকান্দার ঘাট থেকে পাকা সড়ক গিয়েছে শহরের দিকে। রিলিফের গাড়ি আসবে সেই শহর থেকে। কিন্তু কোথায় গাড়ি! পঞ্চায়েত অফিসে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকে গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা। পঞ্চায়েতের বাবুরা শহরের লোকজনদের গালমন্দ করেন। বিপিন গড়াই চৌধুরীবাবুদের বলেন, 'সরকারি ব্যাপারের হাজারো ঝামেলা। সরকারিভাবে খরা ঘোষণা না করলে সরকারি রিলিফ পাওয়া সহজ নয়। সরকারিবাবুরা আসবেন, দেখবেন, ঘুরবেন তারপর শহরে গিয়ে ব্যবস্থা হবে।'

চৌধুরীবাবু বলেন, 'একবার রেডিওতে একটু ঘোষণা করাবার ব্যবস্থা করা যায়!'

বিপিনবাবু বলেন, 'সেও তো সরকারি। এক হতে পারে কাগজের লোকদের যদি ডেকে আনা যায়।'

চৌধুরীবাবু হামানদিস্তায় থেঁতো করে পান খান। দাঁত নেই বলে এই ব্যবস্থা। এবার পানের পিক ফেলে বললেন, 'বিপিন, আমার বড্ড ভয় করে। গাঁয়ের চুরি-চামারি বেড়ে যাচ্ছে। কাল ইঁদারার পাশ থেকে পেতলের বদনাখানা কে যেন নিয়ে গেল। খালেদের পুরনো সাইকেলখানা কাঁঠালতলায় ছিল। সেটাও আর পাওয়া গেল না। এসব তো এ গাঁয়ে কখনও ছিল না। খোলা উঠোনে বাসনের পাঁজা সারারাত পড়ে থাকতো, কেউ কোন দিন ছুঁতে আসেনি। এর পর তো ডাকাতি শুরু হবে।'

বিপিনবাবু বলেন, 'হবে কি, হতে আরম্ভ করেছে। কামারপাড়ার পেছনে ওই ইস্কুলটা আছে। ওই ইস্কুলের সামনে সন্ধেবেলায় গোকুল মাস্টারের ঘড়ি টেনে নিয়ে চলে গেল।'

BanglaBook.org

চৌধুরীবাবু অর্থাৎ যাঁর পোশাকি নাম ব্রজগোপাল চৌধুরী, তিনি চোখ পিটপিট করতে করতে ঘটনাটা শুনলেন। তারপর বললেন, 'আমি তো এখন থেকে সদরে তালা দিয়ে রাখতে বলেছি। নিজে বাঁচলে তবে গাঁয়ের কথা। বিপিন তোমারে একটা কথা কয়ে রাখি, দেশ সেবা-টেবা খুব ভাল কথা। ইংরেজ আমলে আমরাও করেছি। তবে পলাশডাঙার রোগ যদি ইদিক পানে ধায় তাহলে কিন্তু আমার কল থেকে গাঁয়ের লোককে জল নিতে দেব না। জলের ব্যবস্থা পঞ্চায়েত থেকে করবে।'

বিপিন গড়াই বললেন, 'ব্রজদা, পঞ্চায়েতের দশখানা কল আছে এ গাঁয়ে। আরও দশটা বসার কথা। ফান্ডে টাকা নেই বলে কাজ আটকে আছে। তবে ওই দশখানা কলই যদি ঠিক থাকতো তাহলে কোন ভাবনা ছিল না। খান তিন-চার বোধহয় বিগড়ে আছে।'

ব্রজ চৌধুরী বললেন, 'নতুন করতে না পারো পুরনোগুলোই সারাবার ব্যবস্থা কর। কিছু একটা কর।'

বিপিন গড়াই ফিরে আসেন। কাঁচা রাস্তা থেকে ধুলো পাক খেতে খেতে উড়ে যাচ্ছে শুকনো খেতের ওপর দিয়ে। গাছ-গাছালির পাতাগুলো ধুলোয় ঢাকা। বৃষ্টি না হলে এই ধুলো যাবার নয়। দরগার কাছে রাস্তা পেরোতে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। ধুলোর ওপর সাপ চলে যাওয়ার দাগ। বোধহয় এইমাত্র গেল। বিপিন গড়াই দু পাশে তাকালেন। শুকনো পাতায় মৃদু খরখরে আওয়াজ। বিপিন গড়াই দেখলেন একটা দাঁড়াশ ধীর গতিতে কামিনী গাছের তলা দিয়ে দরগার দিকে যাচ্ছে। ঝাঁকড়া মাথা কামিনীর পাতাগুলো ধুলোয় ঢাকা। এমনটা হয় চোত-বোশেখ মাসে। কিন্তু জল নামার পর আবার চকচকে হয়ে ওঠে গাছটা। কদমখণ্ডীর ঘাড়ে যেন চোত ওত্ পেতে বসে আছে। এ চোতের শেষ নেই। গাছের পাতা শুকিয়ে হলদে হয়ে যাচ্ছে। গেল সনে আমের বোল জ্বলে-পুড়ে মরে গেছে। এ সনে বোলের দেখাই মিলল না।

বিপিন গড়াই কাঁধের গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। শহরে চারবার খবর পাঠানো হয়েছে তবুও এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি। এ ব্যাপারে গাঁয়ের মাতব্বরদের নিয়ে আরও একবার মিটিং করা দরকার। খরার সঙ্গে মহামারীর গাটছড়া বাঁধা থাকে। আগু-পিছু ওরা আসবেই। পলাশডাঙায় এসে গেছে, এবার কদমখণ্ডী, ডাঙ্গাডিঙ্গলে আর বিলকান্দা। চৌধুরীবাবুদের মতো তার মধ্যেও আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। দু পাশের শুকনো খেতে রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে। খেতের ওপর দিয়ে গেছে হাই পাওয়ারের বিদ্যুৎ নেওয়ার তার। তিন ঠেঙে স্টিলের খাম্বা বসেছে মাঠের বুকের ওপর। শুকনো মাঠের আলের ওপর অল্প কয়েকটা শালিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরছে আর খাবার খুঁজছে। গাঁয়ের মানুষ ভিটে ছাড়তে পারে না, কিন্তু গাঁয়ের পাখিরা গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। নিশ্চয়ই গেছে, নইলে গাঁয়ের গাছে-গাছে যে এত পাখি দেখা যেত, এত কলকলানি শোনা যেত সকালবেলায় সে সব গেল কোথায়।

বিপিন গড়াই স্কুলের মাঠ পেরোতে গিয়ে শুনলেন কৈবর্ত পাড়ার দিক থেকে একটা গোল আসছে। এখন দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার সময়। আলোয় তেজ আছে তবে ঠিক দুপুরের মতো নয়। বাঁশবাগানের ওপাশটাতেই কৈবর্ত পাড়া। এক সময় পদবী আর পেশা বুঝে-বুঝে বোধহয় পাড়ায় মানুষের বসতি তৈরি হত। এখন অবশ্য সে সব নিয়ম নেই। যে যেখানে মাথা গোঁজার জায়গা পেয়েছে সেখানেই ঘর তুলেছে। অথচ পুরনো নামগুলো রয়ে গেছে স্মৃতিতে, ভোটার লিস্টে আর পঞ্চায়েতের খাতাপত্রে।

বিপিন গড়াই যতই এগোন গোলমালটা ততই যেন বাড়তে থাকে। বাঁশবাগানের

BanglaBook.org

সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। বাঁশবাগানের ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ আসছে। বিপিন গড়াই দু পা সরে এলেন। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার সময়, বাঁশবাগানের ভিতরে ফালা-ফালা ছেঁড়া-ছেঁড়া আলো। বিপিন গড়াই দেখলেন বাঁশবাগানের নালির ভিতর থেকে দুজন লোক হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে ছুটতে লাগল। শুকনো বাঁশের পাতায় ওদের ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

বিপিন গড়াই হাঁকলেন, 'কে ? কে যায় ?'

কেউ সাড়া দিল না। আস্তে-আস্তে পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল। বিপিন গড়াই একটু ভেবে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন কৈবর্ত পাড়ার দিকে । বাঁশবাগানের পথটুকু পেরিয়ে এসে তিনি পাড়ার দিকে তাকালেন। সুদামার বাড়ির দিক থেকেই গোলটা আসছে, তবে এখন আর আগের মতো নয়।

বিপিন বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাংচিতার বেড়া। বাঁশের কঞ্চির গেট। বাঁ হাতে গেট ঠেলে বিপিন ডাকলেন, 'সুদামা, সুদামা বাড়ি আছিস ?'

স্পষ্ট কোন উত্তরের পরিবর্তে ভিতরের ঘর থেকে কান্না ভেসে এল। বিপিনের বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলেন। এবার ঘরের ভিতর থেকে হুড়মুড়িয়ে কয়েকটা ছেলে-ছোকরা বেরিয়ে এসে বিপিন গড়াইকে দেখে বলে উঠল, 'বিপিনদা এয়েচেন, বিপিনদা—'

মেয়েদের কান্নার রোলটা বেড়ে গেল। অবাক চোখে বিপিনদা সবার দিকে তাকালেন। দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করবার আগেই কে একজন যেন বলে উঠল, 'রতন দলুইকে পিটিয়ে ধলাডাঙার মাঠে ফেলে দিয়ে গেছে।'

'সেকি !' অস্ফুট আর্তনাদের মতো শব্দটা বেরিয়ে এল বিপিন গড়াইয়ের মুখ থেকে।

জিজ্ঞেস করলেন, 'রতন কোথায় ?'

যে খবরটা দিয়েছিল সেই বলল, 'ওকে হেলথ সেন্টারে নে গেছে। সেলাই-ফোঁড়াই করতে হবে।'

বিপিন গড়াইয়ের শরীরটা টান টান হয়ে উঠল। মনে পড়ল বাঁশবাগানের মধ্যে দেখা ছেলে দুটোকে। ওরা কারা ? এই গাঁয়ের ছেলে কি ?

॥ ২ ॥

সকাল হবার আগেই খবরটা রটতে লাগল। কৈবর্ত পাড়ার রতন দলুইকে কারা যেন মেরে ধলাডাঙার মাঠে ফেলে দিয়ে গেছে। হেলথ সেন্টারে রতনের মাথায় পাঁচটা সেলাই দিতে হয়েছে। বাঁ হাতের কনুইয়ের হাড় ভেঙেছে। কেউ কেউ বলছে, প্রাণে বেঁচে উঠলেও একখানা চোখ জন্মের মতো যাবে। ব্রজ চৌধুরী বিপিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটা বাঁচবে তো ?'

বিপিন বললেন, 'চিকিৎসে তো চলছে। মাথায় পাঁচটা সেলাই দিতে হয়েছে। কিন্তু এ কাণ্ডটা করলে কে ?'

ব্রজ চৌধুরী বললেন, 'এসব কাণ্ড তো ডাঙাডিঙ্গলের দিকে অতীতে দু'একবার হয়েছে। এ পাড়ায় তো কখনও হয়নি। এ সব উৎপাত শুরু হলে তো মুশকিল। পুলিশকে জানিয়েছো ?'

BanglaBook.org

বিপিন বললেন, 'ও সব হয়ে গেছে। সদরে এস ডি ও সাহেবকেও সব বলা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, এ সব কংগ্রেসি ছেলেদের কাজ। ধলাডাঙ্গার ওই ইঁটভাটাটা নিয়ে অনেকদিন থেকে টানা পোড়েন চলছে। রতন তো আমাদের দলের হয়ে কাজ-টাজ করে। ও ইঁটভাটার ব্যাপারে লড়াই করছিল। সেই রাগে গুণ্ডা লাগিয়ে এই কাণ্ডটা করল। আমরাও ছেলেদের তৈরি থাকতে বলেছি। পড়ে-পড়ে আমরা মার খাব এমন তো হতে পারে না।'

ব্রজ চৌধুরী হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'যাই কর না কেন বিপিন, গাঁয়ের শান্তি নষ্ট কোরো না। একে তো খরার কবলে পড়ে গাঁ জ্বলছে। তার ওপর যদি মারদাঙ্গা শুরু হয় তাহলে তো গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে। খবরের কাগজ খুললেই দেখি দেশ জুড়ে কেবল খুনোখুনি চলছে। এসব হলে কি দেশের ভাল হবে? গেল সন থেকেই তো জোত-জমির কারবার লাটে উঠেছে। এমন চলতে থাকলে ভিটে ছেড়ে কলকাতায় ছেলেদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে।'

বিপিন গড়াই কোন কথা বলতে পারলেন না। পঞ্চায়েত অফিসের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন, সব কথা কি সবাইকে বলা যায় না কি! ওই ইঁটভাটার ওপর তো চৌধুরীবাবুরও নজর আছে। কাদের মিঞা, চৌধুরীবাবু আর ঘোষালরা যতই বন্ধু হোক, সবাই তো তলে তলে চাইছেন বন্ধ ইঁটভাটাটার দখল নিতে। ঘোষালরা এই পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করেছেন। অঞ্চল প্রধানের বাড়িতে গেছেন কাদের মিঞাও। শুধু চৌধুরীবাবু নিজে সামনে না থেকে দালাল ধরেছেন। ভাটার আসল মালিক গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন বিশ মাইল দূরে নসীপুরে। পক্ষাঘাতে শরীর পঙ্গু হবার পর মেয়ের জামাই শ্বশুরের হয়ে কথা বলেন। কিন্তু বিপিন গড়াইরা চান না, ওরাই আবার এসে ভাটা চালু করুক। লোকটা অন্য দলে ভিড়েছিল। ভাটায় বসে তাদের পঞ্চায়েত থেকে উৎখাত করার ফন্দি-ফিকির আঁটতো দলের ষণ্ডা গণ্ডা ছেলেদের নিয়ে। ধলাডাঙা আর বাঁশবেড়িয়ার চারটে আসন পঞ্চায়েতে ওরা ছিনিয়ে নেবার পর দুর্গাদা বলেছিলেন, 'ওদের আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। ওই ইঁটভাটার মধুচক্র ভাঙতে হবে।'

কাজটা তেমন কঠিন ছিল না। কুলি-কামিনরা বড্ড সরল লোক। ওদের খেপিয়ে দেবার মতো ঘটনা সব ভাটাতেই থাকে। কুলি-কামিনদের খ্যাপাবার আগে ওদের সামনে লোভের টোপ দিয়ে বঁড়শি ফেলতে হয়। ওরা লোভের নেশায় টপাটপ গিলে ফেলে। হলও তাই। ওই রতন দলুই আর বিপিন গড়াই কুলি-কামিনদের বোঝাল, আমরা চেষ্টা করছি এই ভাটা সরকারের হাতে তুলে দেবার জন্যে। সরকার নিলে তোরা সব সরকারী কর্মচারী হয়ে যাবি। মাইনে বাড়বে, ছুটি বাড়বে, রোগ-ব্যাধি হলে সরকার টাকা দেবে। ওই একরোখা মালিকের মেজাজ মর্জিতে তোদের চলতে হবে না।'

প্রথমে না হলেও আস্তে আস্তে কাজ হল। প্রথমে রোজ বাড়াবার আন্দোলন, তারপর চলল স্ট্রাইক। তার মধ্যে চুরি হয়ে গেল ভাটার ইট। মালিকের মাথায় হাত। মালিক ভাটা বন্ধ করে দিলেন। সেই থেকে ভাটা বন্ধ। কুলি-কামিনরা গোড়ার দিকে পঞ্চায়েত অফিসে আসতো। কেউ কেউ বলতো, 'হেই বাবু, তোর সরকার যে ভাটা লিবে বলেছে তা লিচ্ছে না কেনে? পেটের লাড়ি শুইক্যে গ্যাল।'

দুর্গাদা তখন বুঝিয়েছেন, 'দ্যাখ, আইন বলে একটা ব্যাপার আছে। ওই লোকটা তো তোদের পথে বসিয়ে ভাটা বন্ধ করে কেটে পড়েছে। ও চাইছে এটা বিক্রি করে সদরে পাথরের ব্যবসা করবে। জোর করে তো সরকার ভাটা দখল করতে পারে না। তাই

BanglaBook.org

সরকার দেখছে আইনের দিক। আমরা লোক পাঠাচ্ছি নসীপুরে ভাটার মালিকের কাছে। ভাল কথায় রাজি না হলে আইন মোতাবেক কাজ করতে হবে। ওই লোকটার খেয়াল-খুশিতে তো তোদের জীবন চলতে পারে না। এই সব করতে একটু সময় লাগছে।'

ওরা বলে, 'আর কত সময় লিবে গো তোমরা। যাদের জুটেছে তারা তো নয়া ভাটায় কাজ লিয়েছে। আমরা কুথায় যাব গো।'

দুর্গাদা একবার বিপিন আর রতন দলুইয়ের দিকে তাকালেন। তারপর নাকে নস্যি নিয়ে বললেন, 'তোরা সব এককাট্টা আছিস তো?'

ওরা একসঙ্গে বলে ওঠে, 'ইটা কিমন কুথা বলছিস। ইখানে তো সবাই মাগ-ভাতারে কাম করে। ইরা দু'কাট্টা হবে কেমন করে গো।'

দুর্গাদা বললেন, 'তোরা সবাই আমাদের দলে নাম লিখিয়ে দে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। আসছে শুক্রবার আমাদের মিছিল আছে। তোরা সবাই ওই মিছিলে থাকবি। তোদের দায়-দায়িত্ব আমাদের। সরকারের হাতে ওই ভাটা আমরা তুলে দেবই।'

এর পরেই পশালডাঙার মাঠে মিটিং হল। মিছিল করে লোক গেল কদমখণ্ডী, ধলাডাঙা, বিলকান্দা আর ডাঙ্গাডিঙ্গলে থেকে। হাজার তিনেক লোকের জমায়েত। কলকাতা আর ব্যারাকপুর থেকে নেতারা এলেন। প্রথমে সার বেঁধে মেয়েরা গান গাইল। এই মেয়েরা টেম্পো করে এসেছে সদরহাটি থেকে। সবার পরনে লাল পাড়ের শাড়ি। কি যেন একখানা গান গাইল। 'কাস্তেতে শান দাও' শুধু ওই কথাটুকুই সবার মনে আছে। কামিনদের দলও মিছিলে এসেছিল। মংলুর বৌ বরখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমরাও তো গাইতে পারি, লাচতে পারি। ই গানে কী বলে বুঝি না। কলকাতার বাবুরা এইছেন, আমরা সার বেঁধে ওই গানখানা গাইব।'

মংলু বলে, 'কোন খাম?'

বরখে বলে, 'ওই যে, পুন্নিমের রাতে গাই। ওই চাঁন্দ আহারে/কী সুখ বাহারে/প্যাট জ্বলে ক্ষুধায় ক্ষুধায়/জীবন গ্যাল শুকায়-শুকায়/ধান কেড়েছে মহাজনে, মান কেড়েছে জোতদারে/ভিটে গেল দেনার দায়ে/নেকড়ে ঘোরে ডাইনে বাঁয়ে/যৈবনের চান্দ ডুবেছে, অভাবের অন্ধকারে/ওই চান্দ আহারে/কী সুখ বাহারে।'

মংলু বৌকে থামিয়ে দিলে বলে, 'চুপ যা, দুগ্গাবাবু ভাটার কথা বলছে।'

দুর্গাবাবু ভাটার কথা বললেন। বাইরে থেকে আসা বাবুরাও ভাটার কথা বললেন। এরপর কি আর ভাবনা থাকে।

ভাটা এখনও তেমনই পড়ে আছে। দুর্গাবাবুরা ওটা খুলতে দিচ্ছেন না। কিন্তু দখলও নিতে পারছেন না। নসীপুরের মলিক ডাঙ্গাডিঙ্গলের ছেলেদের সন্তোষী মার পুজো করার চাঁদা দিয়ে বশ করেছে। এখানে কংগ্রেসীদের জোর কম। তাই পাড়ার ছেলেদের হাত করার চেষ্টা। রতন দলুই ওই ছেলেদের চিনতো। অরই নেতৃত্বে ত্রিপলের ছাউনি পড়েছে। ফালতু লোকদের হটিয়ে দেবার জন্যে পাহারা বসেছে।

সদরহাটি এ অঞ্চলের গঞ্জ। ওখান থেকে কোলকাতা যাবার বাস ছাড়ে। খেয়ে-দেয়ে রাত্রে উঠলে রাত পোহাতেই কলকাতা পৌঁছে যাবে। সদরহাটিতে তিনতলা হাসপাতাল, সিনেমা হল, বিজলি বাতি দিয়ে সাজানো দোকান। মোটর গাড়ি সারাবার ছোট কারখানা, গ্রিলের ফ্যাক্টরি সবই আছে। ওখানে বিস্তর দোকান করে ব্যবসা ফেঁদেছে বনওয়ারীলাল আর ভজনলালরা। ওদের নজর জমির দিকে। জলা-ডোবা, পুকুর, মাঠ যা পাচ্ছে তাই

BanglaBook.org

কিনে নিচ্ছে। তারপর লরি করে আসছে পাওয়ার হাউসের ছাই, কখনও বা পেপার মিলের মাটি। তাতেই বোজাই হচ্ছে এঁদো পুকুর, ডোবা আর জলা জমি। সদরহাটির মানুষ কস্মিনকালেও ভাবতে পারেনি ওইসব জমিতে বাড়ি উঠতে পারে। কিন্তু তাই উঠছে। কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, শস্তায় ফ্ল্যাট কিনতে হলে সদরহাটিতে আসুন। শহরের কোলাহলের বাইরে শান্ত-নির্জন প্রকৃতি। হাট-বাজার, স্কুল, হাসপাতাল, বাসস্টপ আর রেল স্টেশন দশ থেকে তিরিশ মিনিটের পথ। বিজ্ঞাপন বেরুবার পরই পটাপট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট পাবার আগেই টাকা আসছে বনওয়ারীলাল আর ভজনলালদের পকেটে।

ধলাডাঙার ইঁটভাটার আধ কিলোমিটার দূর দিয়ে সরকারি বড় রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। ওই রাস্তা পলাশডাঙার পাশ দিয়ে অনেকটা গিয়ে মিশেছে হাইওয়েতে। ওই হাইওয়ের একটা দিক গেছে কোলকাতায়, অন্য দিকটা পুরুলিয়া ছাড়িয়ে খানিকটা। ওই একখানা রাস্তার জন্যই ধলাডাঙার ভাটার দাম চড়ে গেছে। বনওয়ারীলাল আর ভজনলাল দু'জন দুভাবে ওই ভাটা বাগাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা বড় হিসেবি লোক। নসীপুরের মালিক কার্ত্তিক পোদ্দার, মেয়ের জামাই সুবল দত্ত, পঞ্চায়েতের দুর্গাপদ মণ্ডল, অন্য পার্টির মধু বড়াল সবার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছে আর খেপে-খেপে টাকা দিচ্ছে। কিন্তু কে পাবে সেটা বনওয়ারী, কিংবা ভজন কেউই জানে না। তবে ওরা জানে কেমন করে গিলতে হয়। মরুভূমির চরিত্রটা ওদের চাইতে এ অঞ্চলের কেউ বেশি বোঝে না। তাই একদিন বনওয়ারীলালের বাড়িতে ভজনলালের নিমন্ত্রণের ডাক পড়ে। বৌ-বাচ্চা নিয়ে ভজনলাল পৌঁছয় সন্ধেবেলা।

অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা নিখুঁত। সদর দরজায় ভজনলাল, তার বৌ আর দুই বাচ্চা এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারীলালের বৌ পিতলের ছোট ঘড়ায় জল এনে অতিথিদের পা ধুইয়ে দিল। এসব কেতা-কানুন ভজনলালের জানা। সম্মানিত অতিথিদের জন্য এমনই করতে হয়। ঘরে আসার পর এল বাদামের সরবত। মেয়েরা গিয়ে বসল মেয়েমহলে। বাইরের বসবার ঘর থেকে বনওয়ারীলাল ভজনলালকে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। মেঝের ওপর মোটা গদির বিছানা, তাতে গোটা চারেক তাকিয়া। হাতজোড় করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বনওয়ারীলাল বলল, 'আজকের দিনটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন। আমরা একই দেশের লোক। টাকা রোজগারের জন্যে একই দেশে, একই জায়গায় এসেছি। এখানে শুধু আমরাই পরদেশী। অথচ আমাদের মধ্যে পরিচয় থাকলেও কোন পারিবারিক আত্মীয়তা নেই। এটা খুব দুঃখের। এজন্য আমিই দায়ী। কেননা, আমিই এখানে আগে এসেছি। আজ আমার সেই দুঃখ দূর হল।'

ভজনলাল বলল, 'দোষ আমারও। এখানে আপনিই আমার দেশওয়ালী। আমারই উচিত ছিল এগিয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করা। কিন্তু সদরহাটির নিকুঞ্জ সাহা, আবদুল খোন্দকার, মেহবুব গোলদার আর গোবিন্দ সাঁতরা আমায় বোঝালো বনওয়ারীলাল খুব খারাপ লোক। তোমায় হয়তো লোক লাগিয়ে খুন করতে পারে। সব শেরই পছন্দ করে জঙ্গলে সে একাই থাকবে। নয়া-নয়া এসেছি তো, তাই ঘাবড়ে গিয়ে দূরে-দূরে থাকতুম।'

বনওয়ারীলাল হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'এমন কথা আমাকেও বলা হয়েছিল। ওরা বলেছিল, কলকাতা আর হাওড়ায় আপনার পেট্রোল পাম্প আছে। কলকাতার আই জি আপনার চেনা। আপনি সদরহাটিতে খুন করে ফেললেও পুলিশ আসবে না। কিন্তু

BanglaBook.org

আমার মনে হল, আমরা এক দেশের লোক। আমরা তো সবসময় দেশভাইদের দেখভাল করি। পলিটিক্যাল দাদারা মাড়োয়ারী বলে আমাদের গালমন্দ দিলেও ওদের কেনা যায়। কিন্তু গাঁয়ের লোকদেরতো ঠিক বুঝতে পারি না। ওদের মতি-গতি বোঝা ভার। ওরা আমাদের আপন নয়। কিন্তু লোকগুলো সরল। কাজকম্ম দিলে মাথা নিচু করে থাকে। তাই ভাবলাম, এক দেশের লোক মানেই ভাই ভাই। তাহলে ডেকে একদিন দোস্তি করা যাক।'

ভজনলাল তাকিয়াতে হেলান দিয়ে সব কথা শুনে বলল, 'আমিও তো সেইজন্যেই এক ডাকে চলে এলাম।'

এবার বনওয়ারীলাল বলল, 'ভাইসাব একটা কথা বলব!'

ভজনলাল বলল, 'কী কথা।'

বনওয়ারীলাল বলল, 'আমার এক কাজিন থাকে লন্ডনে। বছরে একবার করে আসে। আমার এক-আধটু অভ্যেস আছে বলে সে লন্ডন থেকে আমার জন্যে হুইস্কির বোতল নিয়ে আসে। এবার এনেছে শিবাস রিগ্যাল, জনিওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল আর পাসপোর্ট। আমি শুনেছি, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ নাকি পাসপোর্ট হুইস্কি খুব পছন্দ করতেন। তা আজকে আপনার সেবায়, আমাদের দোস্তিতে কোনটা খুলব?'

ভজনলাল বলল, 'আমি পছন্দ করি জনিওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল। তবে আজকে আপনি ওই পাসপোর্টটাই খুলুন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ফেবারিট ডিংক্স। আচ্ছা উনি কি এখনও আছেন?'

বনওয়ারীলাল বলল, 'ডিয়ার ব্রাদার, যখন আমেরিকাতে ব্যবসা করতে যাব তখন জানব ওখানকার প্রেসিডেন্ট কী খান, কী তার হবি, কী পেতে তিনি ভালবাসেন। আপনিও আমার মতো ব্যবসায়ী। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ব্যবসার স্বার্থে উল টু উওম্যান সবই আমরা সাপলাই করতে পারি। নাফা যেখানে সেখানেই আমরা।'

বনওয়ারীলাল জয়পুরী কাজ করা খাটো একটা আলমারির ভিতর থেকে পাসপোর্টের বোতল বার করল। গ্লাসে ঢালবার আগে জিজ্ঞেস করল, 'কী নেবেন? সোডা না প্লেন জল?'

ভজনলাল হাসতে হাসতে বলল, 'বিদেশী মালের সঙ্গে দেশি জল বা দেশি সোডা মেশালে স্কচের ভার্জিনিটি নষ্ট হয়ে যায়। আমি শুধু বরফ দিয়ে খাব।'

অগত্যা বনওয়ারীলালকেও শুধু বরফ দিয়েই খেতে হল।

তিনবার খাওয়ার পরই বনওয়ারীলাল বুঝতে পারল তার নেশা হচ্ছে। অতএব তৃতীয় গ্লাসটা সে শেষ করল না। ভজনলাল তৃতীয় গ্লাস শেষ করে বনওয়ারীলালকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনি আমার ভাই। আজ থেকে আমরা একসঙ্গে থাকব। বিজনেস আলাদা থাকলেও আমাদের ইন্টারেস্ট এক। যা কিছু অপারেশন আমরা একসঙ্গে আলোচনা করে করব। এখানকার পলিটিক্যাল দিকটা আমি সামলাবো, অন্যদিকটা আপনি দেখবেন।'

বনওয়ারীলাল সোফা থেকে উঠে এসে ভজনলালকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক এই সময় বনওয়ারীলালের বৌ এসে খাবারের তাগাদা দিল এবং খেতে বসে জানা গেল বনওয়ারীলালের বৌয়ের বাপের বাড়ি ভজনলালের গ্রামেই। অতএব দোস্তি আরও পাকা হয়ে গেল। ভাবীজি থেকে একলাফে বনওয়ারীলালের বৌ বহিনজি হয়ে গেল। এবার শুরু হয়ে গেল দুই লালের যুগ্ম অপারেশন। দুর্গাদা বললেন, 'ওরা ব্যবসায়ী লোক।

BanglaBook.org

ভাটাটা পেলে পেরেককল করবে। গাঁয়ের লোকের চাকরী হবে। ওরা কথা দিয়েছে, নিজেদের টাকায় কদমখণ্ডীর স্কুল বাড়িটা পাকা করে দেবে। ওদের হাতেই তুলে দেওয়া তো ভাল।'

বিপিন গড়াই জোরালো প্রতিবাদ করতে পারে না। প্রতিবাদ করলেই সামনের ইলেকশনে নমিনেশন জুটবে না। একেবারে অকেজো করে ফেলে রাখবে। তবুও আমতা-আমতা করে বলে, 'আমি বলছিলাম, দিতেই যদি হয় তাহলে ওই চৌধুরী, ঘোষাল কিংবা কাদের মিঞাদের কাউকে দেওয়া যায় না ?'

দুর্গাদা বলেন, 'সেটা হলে তো খুবই ভাল হতো। কিন্তু ওদের মধ্যে কোন ইউনিটি নেই। তিনজনকে তো দেওয়া যায় না। এটা তো মহাভারতের দ্রৌপদী নয় যে, এক বৌকে পাঁচজনে ভাগ করে নিল। একজনকে দিলে অন্যজনের গোসা হবে। তার চাইতে ওদের দেওয়াই ভালো। গাঁয়ের ঝক্কি আমরা সামলাবো, অন্য ঝক্কি ওদের। ওরা হয়তো টাকা-পয়সা দিয়ে কার্ত্তিক পোদ্দার আর সুবল দত্তকে ম্যানেজ করে ফেলবে। এত কেরামতি কি ওই ঘোষাল, চৌধুরী আর কাদের মিঞাদের আছে। তাছাড়া কথা হয়ে গেছে, লোহাকল, সুরকিকল, কিংবা পাথর ভাঙার কল যাই করুক, মাসে-মাসে দু'হাজার টাকা পঞ্চায়েতে দেবে।'

একথার পর আর কথা কইতে পারে না বিপিন গড়াই। সে চুপ করে থেকে মাথা নাড়ে। একটু পরে বলে, 'কিন্তু ভাটার ওই কামিনদের কী হবে ?'

দুর্গাদা বলেন, 'ওরা ওদের কলে কাজ পাবে। আমার সঙ্গে ভজনলালের কথা হয়ে গেছে। লোকটা সাচ্চা। তাছাড়া গাঁয়ে-গঞ্জে ইকোনমিক্যাল গ্রোথও তো চাই। গ্রামটাকে ডেভলাপ করতে হবে তো।'

পঞ্চায়েতের অফিসে তখন অনেক লোকের ভিড়। সবার মুখই থমথমে। রতন দলুইয়ের ব্যাপারটা সবাইকে জোর ধাক্কা দিয়েছে। এখনই এর বদলা নিতে না পারলে পার্টির ছেলেরা তার দলের ওপর আস্থা হারাবে। নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে ওরা দলের কাজকর্মে আর আগের মতো সামিল হবে না। দলের কর্মীদের সেন্টিমেন্টটাকে ভাল বুঝতে পারেন দুর্গাদা। তিনি জানেন, কোন পরিস্থিতিতে কেমন কথা বলতে হয়, কেমন করে বোঝাতে হয়। বিপিন গড়াইকে দেখে দুর্গাদা বললেন, 'বিপিন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। রতন দলুইয়ের ব্যাপারটা আমরা হজম করে যেতে পারি না। ওদের এত সাহস যে বাইরে থেকে লোক এনে রতনকে পেটাই করল। ছেলেটা তো মরেও যেতে পারত। এর পাল্টা অ্যাকশন নিতে না পারলে দলের ছেলেরা কোন্ ভরসায় থাকবে !'

বিপিন গড়াই শান্ত গলায় বলল, 'কী করতে চান ?'

দুর্গাদা বললেন, 'এস পি-র কাছে মাস পিটিশন পাঠাবো। এম. এল. এ সাহেবকেও বলবো। রাইটার্সে গিয়ে তদারক করব। পুলিশ যদি অ্যাকশন নেয় ভাল, না নিলে আমরাই পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব। তুমি গ্রামে-গ্রামে ছেলেদের নামিয়ে দাও স্বাক্ষর সংগ্রহ করার জন্য। তারপর দেখি পুলিশ কী করে। একটা কিছু কর্মসূচী তো চাই, তা না হলে ছেলেরা আমাদের বিশ্বাস করবে কেন ! ওরা জানে প্রশাসন আমাদের হাতে, অথচ আমাদের ছেলেরা মার খাবে, আমরা কিছু করতে পারব না ! তুমি কাজে নেমে পড় !'

শুরু হয়ে গেল গণস্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান। এ গাঁয়ে যত লোকের বাস তাদের মধ্যে

BanglaBook.org

সবাই নাম সই করতে পারে না। অতএব, তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা হল। নামের পাশে টিপছাপ। কদমখণ্ডী, ধলাডাঙা আর বিলকান্দার যত লোক টিপছাপ দিল বা সই করল তাদের অনেকেই জানল, রাজধানী থেকে রিলিফ আসছে না বলে চিঠি পাঠানো হচ্ছে মন্ত্রীর কাছে। চিঠির বয়ানে কী লেখা আছে সেটা পড়ে দেখার সময় হল না কারও-কারও, আর বাকি লোকরা তো পড়তেই পারে না। এক হপ্তার মধ্যে চিঠি গেল। তারও এক হপ্তা পরে থানার দারোগা সাহেব জিপগাড়িতে চড়ে এলেন পঞ্চায়েত অফিসে। দুর্গাবাবুকে বললেন, 'আপনি তো সবই জানেন। রতন দলুই তো কাউকে চিনতে পারেনি। আমরা এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারাও কোন ক্লু দিতে পারেননি। আমরা তো হাতগুনে আসামি ধরতে পারি না।'

দুর্গাদা বললেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, এটা কংগ্রেসীদের কাজ। ওদের ছেলেদের ধরুন।'

দারোগা সাহেব বললেন, 'তাহলে আপনি ওই কংগ্রেসী ছেলেদের নাম দিয়ে থানায় ডায়েরী করুন। আপনার ডায়েরীর ভিত্তিতে আমি ধরব।'

দুর্গাদা নস্যি নিয়ে বললেন, 'কানাইবাবু, আমি একজন সেনসেবল লোক। হঠাৎ করে তো কারও নাম করে দিতে পারি না। কারণ, আমি তো দেখিনি। আমি শুধু আমার সন্দেহটা আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারি। এবার আপনার কাজ আপনি করুন।'

দারোগাবাবুর জন্য চা-সিগারেট এসে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দারোগাবাবু বললেন, 'আপনাদের যেমন পাবলিককে নিয়ে কাজ করতে হয়, আমাদেরও কিন্তু তাই। বিনাপ্রমাণে দু' পাঁচটা কংগ্রেসী ছেলেকে তুলে নিলে ওরাও কি চুপ করে বসে থাকবে ভেবেছেন। আমাকেও তো আমার কাজের একটা কৈফিয়ত দিতে হবে।'

দারোগাবাবু সিগারেট ধরালেন। দুর্গাদা আবার নস্যি নিলেন। রুমালে নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'আপনার যা করার আপনি সেইমতো কাজ করে যান। যে কোন সৎ কাজে আমাদের সহযোগিতা আপনি পাবেন। তা এবার আপনাকে একটা কাজের কথা বলি। পার্টিকর্মীদের সেন্টিমেন্টটাও তো দেখতে হবে। তাছাড়া গাঁয়ের যা অবস্থা, শহরের রিলিফ আদৌ আসবে কি না জানি না। রিলিফ না আসা মানেই অন্য দলগুলো এটাকে ইস্যু করবে। গাঁয়ে একটা হাঙ্গামা শুরু হবে। তার চাইতে একটা কাজ করা যাক।'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে দারোগা সাহেব বললেন, 'কী কাজ?'

দুর্গাদা বললেন, 'গাঁয়ের যা অবস্থা আর লোকজন যেভাবে ফুঁসছে তাতে যে কোন মুহূর্তে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই ইস্যুটাকে একটু বদলে দিতে চাই। যতদিন সরকারী রিলিফ বা কিছু একটা না হচ্ছে ততদিন গাঁয়ের লোকগুলোকে অন্য একটা ব্যাপারে আটকে রাখা দরকার। তাই ভাবছি একদিন আপনার থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচী নেব।'

দারোগাবাবু বললেন, 'কিন্তু কারণটা কি?'

দুর্গাদা হাসতে হাসতে বললেন, 'কারণের কি অভাব হয়। ওই রতন দলুইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে থানা ঘেরাও, একটু-আধটু বিক্ষোভ-টিক্ষোভ হবে আর কি! তা কবে সেটা করা যায় বলুন তো?'

দারোগা সাহেব সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'এ হপ্তায় তো সম্ভব নয়। আগামী হপ্তায় শুক্রবার আমি থাকবো না। আপনারা শনিবার করতে পারেন।'

দুর্গাদা সঙ্গে সঙ্গে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমরা একটা

BanglaBook.org

নোটিস আগে দিয়ে দিচ্ছি। শনিবারই হবে। ওইদিন পলাশডাঙায় হাট হয়।'

দারোগা সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে দুর্গাবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ঘেরাও-বিক্ষোভ কতক্ষণ চলবে ?'

দুর্গাদা বললেন, 'তা ঘণ্টাখানেক তো চালাতেই হবে। তারপর আমাকে আর বিপিনকে ভিতরে ডেকে নেবেন। ওখানে আরও দশ-পনেরো মিনিট। তারপর আমি যা বলবার বক্তৃতা দিয়ে বলে দেব।'

দারোগা সাহেব জিপে ওঠবার আগে দুর্গাবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং জিপ ছাড়বার পরে মনে মনে বললেন, 'খচ্চর।'

দারোগা সাহেব পঞ্চায়েত অফিসে ঢোকবার পর অফিসের সবাইকে বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছিল। ভিতরে ছিলেন দুর্গাবাবু আর বিপিন গড়াই। এবার দারোগা সাহেবের জিপ চলে যেতে রাস্তার দু'ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কৌতূহলী মানুষরা ভিড় করে এল পঞ্চায়েত অফিসের সামনে। দুর্গাদা বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখলে তো তোমারা, তোমাদের গণস্বাক্ষরের কেমন ফল। দু' ক্রোশ দূর থেকে জিপগাড়িতে সরকারী পেট্রোল পুড়িয়ে ছুটে এসেছে আমার কাছে। কিন্তু আমি আপোষ করার লোক নই। নিজের দলের মধ্যেও অন্যায় দেখলে আপোষ করিনি। করবও না। এই কদমখণ্ডীর মানুষরাই আমার বল-ভরসা। আমি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস করি। তিনদিন সময় দিয়েছি, তার মধ্যে ফয়সালা না হলে আমি নিজে যাব থানায়। তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে থানা ঘেরাও করব, বিক্ষোভ দেখাবো। মহকুমা কাঁপিয়ে দেব।'

এখন সন্ধ্যার পর ভজনলালের বাড়িতে শতরঞ্চ খেলতে আসেন বনওয়ারীলাল। দাবার চাল দিতে দিতে বনওয়ারীলাল বললেন, 'আসছে শনিবার থানা ঘেরাও হচ্ছে ?'

ভজনলাল এক চামচে পানপরাগ মুখে ফেলে বললেন, 'দারোগা সাহেব তাই বলছিলেন।'

বনওয়ারীলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন গণ্ডগোল হবে না তো ? কেন না, ওইদিন পোস্তা থেকে আমার ডালের লরি এখানে এসে পৌঁছবার কথা।'

ভজনলাল পানপরাগ চিবুতে চিবুতে বললেন, 'এ হচ্ছে আপোষের কাজিয়া। কিচ্ছু হবে না।'

বনওয়ারীলাল চাল দিলেন। ভজনলালের কৌটো থেকে পানপরাগ মুখে দিয়ে বললেন, 'নসীপুরের পোদ্দার আর তার দামাদকে ম্যানেজ করা হয়ে গেছে। কিন্তু পজিশন নেওয়ার আগে গ্রামের দিকটা দেখতে হবে। এই একটা ইস্যুতে চৌধুরী, ঘোষাল আর কাদের এককাট্টা হয়ে যাবে। ধলাডাঙ্গার পাবলিক ওদের বেশি চেনে। তাই...'

ভজনলাল হাসতে হাসতে বললেন, 'গুরুবারে হুইস্কি খাই না বলে আমার মতো আপনার মাথাটাও ভাল খেলে না। ওসব ছোটখাট ব্যাপার আমি সামলে নেব। এখন যত পারবেন শুধু জমি কিনে যান আর চাষীদের টাকা ধার দিয়ে যান। এ সনে দুর্ভিক্ষ হবেই। হয়তো মহামারীও লাগতে পারে। ওই ফয়সালা ঘোষাল আর কাদের মিঞাদের নিতে দেবেন না। গ্রামের লোক যাতে ওদের ওপর খেপে যায় সেই ব্যবস্থার দিকে এগোতে হবে।'

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। গুরুবারে চৌধুরীদের রাধাগোবিন্দের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা থেমে যায়। নিমগাছের শুকনো ডালে কর্কশ গলায় একটা পাখি ডেকে ওঠে, অন্ধকার আকাশে কয়েকটা তারা দেখা যায়। মাটির দাওয়ায় বসে নারাণ আকাশটাকে দেখতে

BanglaBook.org

দেখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দাওয়ার একপাশে একফালি ছেঁড়া চাটাইতে ন্যাকড়ার পুঁটুলির মতো পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে নারাণের পোয়াতি বৌ পদ্ম। রান্নার জায়গাটা আজ বড় ন্যাড়া-ন্যাড়া। কাঠ জ্বেলে হাঁড়িতে ফোটাবার মতো আজ আর কিচ্ছু নেই নারাণের ঘরে। নারাণ উদাস চোখে শ্যাওড়াগাছের অন্ধকার মাথাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাম-কাজের ধান্দার কথা ভাবে। ঘোষালদের আড়তে একটা কাজের আশায় ক'দিন থেকে ঘুরে ঘুরে সে বুঝে গেছে ও কাম তার ভাগ্যে নেই। বিলকান্দার খালের জল শুকোতে আরম্ভ করেছে। বিলকান্দার বিল এখন ঠনঠনে মাটি। মাছের ব্যবসা মন্দা হওয়াতে ঘোষালদের মেজাজ-মর্জি ভাল না। বিলে জল থাকলে ডিঙ্গি চালিয়ে কিছু রোজগার হয়। এখন সেটিও হবার উপায় নেই। পদ্মর পেটের বাচ্চা বাড়ছে, তার সঙ্গে খাই-খাই বেড়ে যাচ্ছে পদ্মর। এ সময় নাকি এমনটাই হয়।

নারাণ মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে উদাস গলায় ডাকে, 'পদ্দ, অ্যাই পদ্দ।'

পদ্ম মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'হুঁ।'

নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'দুপুরে যে চিড়ে খেলুম, ও আর ঘরে নেই?'

পদ্ম উত্তর দেয়, 'না।'

নারাণ চুপ করে যায়। বাইরের অন্ধকার বাড়তে থাকে। আজ আর তাদের মধ্যে কোন কাজের ব্যস্ততা নেই। নারাণ পদ্মর গায়ে হাত রাখে। পদ্মর খোলা পিঠে থিকথিক করছে ঘাম। ঘামাচিতে পিঠ ছেয়ে আছে। পদ্ম যেমন শুয়ে ছিল তেমনই শুয়ে থাকে। নারাণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। দাওয়া থেকে নেমে উঠোনে আসে। তারপর কি একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'পদ্দ, তুই ঘরে গিয়ে দোর দিয়ে শুয়ে পড়গে। আমি আসছি।'

পদ্ম দাওয়ার ওপর উঠে বসতে বসতে বলে, 'কোন ঠাঁয় চললে?'

নারাণ যেতে যেতে বলে, 'তুই ঘরে যা। আমি গফুরের দোকান থেকে আসছি।'

পদ্ম যেন মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'আগের ধার এখনও শুধতে পারোনি, সেটা মনে আছে তো?'

নারাণ কোন উত্তর না দিয়ে রাস্তায় আসে। বাইরেও ছ্যাঁক ছ্যাঁকে গরম। কাঁধের গামছাটা দিয়ে পিঠ মুছতে মুছতে সে গফুরের দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে। দোকানের সামনে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে গফুর বসেছিল দোকানের সামনে বাঁশের মাচায়। নারাণ গিয়ে বসল তার পাশে। গফুর একখানা কঞ্চি দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'রতন দলুই নাকি বাড়ি ফিরে এয়েছে?'

নারাণ বলল, 'আমি জানি না। সারাদিন পেটের ধান্ধায় ঘুরে মরি, ওসব খোঁজ কখন রাখব।'

গফুর হাতের কঞ্চিটা পাশে রাখতে রাখতে বলে, 'আমিও তো শালা বেচবার ধান্ধায় ঝাঁপ খুলে বসে থাকি। কেনবার খদ্দের আর আসে না। শুকনো গাঁয়ে কি ব্যবসাপত্তর চলে!

গফুর থেকে থেকে পিঠ চুলকোয় আর অনর্গল কথা বলে যায়। নারাণ চুপ করে থাকে। যে কথাটা বলবার জন্যে এখানে এল সেই কথাটা বলতে পারছে না। যতক্ষণ না বলতে পারছে ততক্ষণ তবু মনের মধ্যে একটু ক্ষীণ আশা জেগে থাকে। কিন্তু বলবার পর যেই মুহূর্তে গফুর বলে দেবে, 'আগের দেনা এখনও শুধতে পারলি না, আবার দেনা করছিস কিসের ভরসায়?' তখনই সব শেষ হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে গফুর বলে 'নারাণ তাড়ি খাবি? সাঁঝের তাড়ি?'

BanglaBook.org

নারাণ গফুরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'সকালে একমুঠো চিড়ে খেয়ে কাজের ধান্ধায় বেরিয়েছিলুম। একটা পয়সাও রোজগার করতে পারিনি। ঘরে পোয়াতী বৌটা খিদের জ্বালায় নেতিয়ে পড়ে আছে। এ সময় খালি পেটে তাড়ি গিলব কেমন করে!'

গফুর পিঠ চুলকোতে চুলকোতে হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার পিঠ চুলকোতে আরম্ভ করল। তারপর বলল, 'তুই শালা একটু খচ্চর মার্কা আছিস। দোকানে এসে ঝেড়ে কাশলেই তো পারিস।'

গফুর উঠে গেল দোকানের ভিতরে। দোকান থেকে চাল, আটা, ডাল আর একটু তেল নিয়ে এসে বলল, 'এগুলো ধর। এট্টু দাঁড়া।'

দোকানের পিছনে কিছুটা জমি। ও জমিতে বেগুন, লঙ্কা এসব গাছ লাগায় গফুর। এ সনে আর গাছ গজায়নি। তারপর খান বিশেক কলাগাছ। কলাবাগানের পাশেই গফুরের বাড়ি। গফুর যেতে যেতে বলল, 'ঘর থেকে আলু নিয়ে আসি।'

গফুর মিনিট পনেরোর মধ্যে খান সাতেক আলু নিয়ে ফিরে এল। নারাণের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তুই বাড়ি যা। আমি ঝাঁপ ফেলে তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে তোর বাড়ি যাচ্ছি। তোর বৌ ঝামেলা করবে না তো।'

নারাণ বলল, 'না-না, পদ্দ কিছু ভাববে না। কিন্তু তুই এখনই দোকান বন্ধ করবি?'

গফুর বলল, 'সাতটা বেজে গেছে। এখন আর খদ্দের কোথায়?'

নারাণ মনে মনে খুশি হল। এতটা সে আশা করেনি। সে শুধু ভেবেছিল, গফুরকে কষ্টের কথাটা বললে, সে হয়তো একেবারে খালি হাতে ফেরাবে না। একই গাঁয়ে, একই ইস্কুলে পড়েছে। এ গাঁয়ে বন্ধু বলতে যারা, তাদের মধ্যে গফুরও একজন। কিন্তু গফুর যে এতটা করবে সেটা সে ভাবেনি। ধুলোর রাস্তা ভেঙে হেঁটে আসতে আসতে সে ভাবল, আজ যদি সে গফুরের জায়গায় থাকতো তাহলে সেও কি এমনটাই করত না। তার মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা। তখনও তার বিয়ে হয়নি। দেশের কোথায় যেন কি একটা ঘটনা ঘটল। তার ঢেউ গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল সদরহাটিতে। সদরহাটি এখান থেকে মাত্র চার ক্রোশ। পলাশডাঙার মাঠ দিয়ে হেঁটে গেলে রাস্তা আরও কমে যায়। সদরহাটির মোল্লাপাড়ায় আগুন লাগানো হল। সেই আগুনে দশ-বিশখানা ঘর পুড়ে ছাই। দমকল এসে পৌঁছবার আগেই আগুনকে বাগে এনে ফেলল যারা তারা সবাই মোল্লাপাড়া আর তার পাশের লোকেরা। গফুরদের তখন ভয়ে-ভয়ে দিনকাটে। দোকানের ঝাঁপ খোলার সাহস হয় না। মনে হয় কারা যেন দল বেঁধে এসে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার দোকানে। দোকান লুট হবে, আগুন লাগাবে আর বাধা দিতে গেলে এক কোপে গলা নামিয়ে দেবে কাঁধ থেকে। সবাই বলে, দাঙ্গা লেগেছে। দাঙ্গা কেমন করে লাগে সে সম্পর্কে নারাণের কোন ধারণা নেই। সে কেবল ভাবে দাঙ্গা লাগলে কি মানুষ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। গফুর, আফজলরা কি তাহলে আর বন্ধু থাকে না?

তখন ছিল শেষ ফাল্গুনের সময়। আকাশে-বাতাসে কেমন যেন ভালবাসার গন্ধ। গাছে ফুল ফোটে, ভোর থেকে কোকিল ডাকে আর শেষরাতের বাতাসে চাপা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। শিশিরও পড়ে। ঘাসের মাথাগুলো ভেজা-ভেজা। এমন সময় কদমখণ্ডীর বাতাসে ভেসে আসে বারুদের গন্ধ। সদরহাটির গোলমাল থামে না। লোকজন বাঁচবার তাগিদে নিজের আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয়ের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে। সদরহাটির বাজারের

BanglaBook.org

কাছে পুলিশচৌকি বসে। কদমখণ্ডীতে কোন গোলমাল নেই ঠিকই, তবুও যেন কোথাও শান্তি নেই। নানা জনে নানা কথা বলতে থাকে। ভয় আর আতঙ্কটা একটা বুনো শুয়োরের মতো চেহারা নিয়ে কদমখণ্ডীতে ঘোঁত-ঘোঁতিয়ে বেড়ায়। ধলাডাঙার হাট বসে। কিন্তু সে শুধু নামেই হাট। বেচবার লোক এবং কেনবার লোক দুই-ই কম। ওই হাট থেকে খবর আসে পলাশডাঙায় লোক জমায়েত হয়েছে। রাতের আঁধার নামলেই ওরা রৈ-রৈ শব্দে এই গাঁয়ে ঢুকবে। কদমখণ্ডীর মুসলমানদের এ যাত্রা আর রেহাই নেই।

গফুরদের মতো ভয়ে বুক কাঁপে নারাণদেরও। নারাণের বাপ বলতেন, শয়তানের লাঠি মানুষের মাথা ভাঙে। সে খোঁজে মানুষের মাথা, জাত-পাত দেখবার ফুরসত পায় না। দুর্গাদারা তখন ছেলেপিলে জুটিয়ে রাত জেগে কদমখণ্ডী পাহারা দিত। একদিন বিকেল শেষ হবার মুখে গফুর এল নারাণের দাওয়ার সামনে। ওর দুই চোখে জমাটবাঁধা ভয়। কেমন অচেনা গলায় গফুর ডাকল, 'নারাণ ! নারাণ রে !'

দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে নামল নারাণ। গফুরের চোখের দিকে তাকিয়ে সে ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ?'

গফুর বলল, 'এখনও কিছু হয়নি। শুনতে পাচ্ছি রেতেরবেলা আমাদের ঘরে আগুন লাগাবে। বাপ আর চাচা গিয়েছে দুগ্গাদার বাড়িতে। মা আর চাচিরা কৈবর্তপাড়ায়। ঘরে তালা ঝুলিয়ে আমি এলাম তোর ঠাঁয়। রেতেরবেলা থাকতে দিবি ?'

গফুরের গলায় যেন করুণ প্রার্থনা। কান্না নয়, অথচ কান্নার থেকেও বেশি স্পর্শ করে এই উদ্বেগভরা কণ্ঠস্বর। নারাণ ওকে হাত ধরে দাওয়ায় টেনে তুলতে তুলতে বলে, 'আয়, ঘরে আয় !'

গফুর ঘরে ঢোকে না। দরজার কাছে থমকে যায়। নারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি ক্যাঁথা মুড়ি দিয়ে বারান্দায় শোব।'

নারাণ বলে, 'কেন ?'

গফুর একটু ইতস্তত করে বলে, 'তোদের ঘরে ঠাকুর আছে না ? তোর মা রাগ করবে।'

নারাণ এসব কথা বুঝতে পারে না। তাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর ফটো আছে। কালীঠাকুরের ফটোও একখানা রয়েছে। এই দুই ঠাকুরকে ঘিরে আরও হরেক রকমের দেবদেবী। সবাইকে নারাণও ভাল করে চেনে না। মা রোজ স্নান করে এসে ঠাকুরকে পুজো দিয়ে তবে নিজে খায়। ঘরে ঠাকুরের আসন পাতা হলে তেমনটাই তো করার নিয়ম। কিন্তু ঘরে ঠাকুর থাকলে সেই ঘরে গফুর ঢুকতে পারবে না কেন ? মানুষের মতো ঠাকুরের মধ্যে হিঁদু আর মোচলমান আছে নাকি !

নারাণ ছোট্ট করে একটা ধমক দিয়ে বলে, 'তুই ভেতরে যায়। মা ওপরে তক্তপোশের ওপর শোবে। তুই আর আমি নীচে শোব।'

তবু সংশয় ঘোচে না গফুরের। কেমন করে ঘুচবে ? জন্মে অবধি সে যা দেখে এসেছে তাই শিখেছে। চৌধুরীদের ঠাকুর দালানে রাধাগোবিন্দের রাস উৎসবে তারা কখনও ভিতরে যেতে পারেনি। সে দেখেছে দূর থেকে, তার বাবা-কাকারাও দেখেছে দূর থেকে। থালা থেকে কলাপাতায় প্রসাদ তুলে ওপর থেকে হাতের ওপর ফেলে দেওয়া হতো এমনভাবে যেন ছোঁয়া না লাগে। বাবার কাছে গল্প শুনেছে, একসময় হিঁদুদের ইঁদারা থেকে মুসলমানরা জল নিতে পারত না। ইঁদারা ছোঁয়াও বারণ ছিল। তার জ্যাঠা

BanglaBook.org

জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘোষালদের বাড়িতে আম বিক্রি করতে যেত। ভিতরে উঠোনে বসে গণ্ডা হিসেবে আম দেওয়ার পর সেই আম জলে ধুয়ে ঘরে তোলা হোত। জ্যাঠা যে জায়গাটায় বসতো সেই জায়গাটায় গোবর ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে নিতেন ঘোষালরা। এটা তখন এমনই গা-সওয়া ব্যাপার ছিল যে এসব নিয়ে ভিতরে ভিতরে কষ্ট হলেও কেউ সেই কষ্টের কথা মুখ ফুটে বলতে পারত না। এখন সেই বাড়াবাড়িটা কমে এলেও দু'জাতের মধ্যে অদৃশ্য একটা বেড়া রয়েই গেছে। কিন্তু সবাই কি তাই ?

দুগ্গাদা, বিপিন গড়াই, কৈবর্তপাড়ার রতনরা গোড়া থেকেই অন্যরকম। কিন্তু সবাই অন্যরকম হতে পারেনি। নারাণের বিধবা মা'ও কি অন্যরকম ? নারাণ তার মা'কে জানে তো ? নিজের মনেই কথাগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে গফুর। নারাণকে নিয়ে তার কোন দ্বিধা নেই। ইস্কুলে পড়ার সময় তো গাছের একখানা আম দু'জনে কামড়া-কামড়ি করে খেয়েছে।

গফুর তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে নারাণ মা'কে ডাকল। গফুরকে তার মা চেনে। রোজই তো দেখে। নারাণ মা'কে সব বলতেই মা বললেন, 'তুই দাওয়ায় শুবি কেন রে ! যাদের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে এলি তারা কি তোকে আমার দাওয়ায় দেখতে পেলে ছেড়ে দেবে। তুই ভেতরে যা। আমি না বললে একদম বাইরে বেরুবি না।'

সেবার পর-পর কয়েকটা রাত নারাণ আর গফুর পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটিয়েছে। নারাণের মা রান্না করেছে, কাঁসার থালায় মা'র সামনে বসে নারাণ আর গফুর খেয়েছে। প্রথম রাত্রে খেতে খেতে গফুর জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'অনেক হিঁদুরা বলে, আমাদের সঙ্গে খেলে জাত যায়। তা তোমার আর নারাণের জাত যাবে না ?'

নারাণের মা গফুরের থালায় ভাত দিতে দিতে বলে, 'মায়েদের জাত যায় না। তোর বন্ধুকে জিজ্ঞেস কর, ওর জাত যাবে কি না।'

গফুর তাকায় নারাণের দিকে। নারাণ বলে, 'কিসে জাত আসে আর কিসে জাত চলে যায় সে হিসেবটা আমি বুঝতে পারি না। কেবল বুঝতে পারি গরিবলোকরা সবাই এক জাতের। ওদের জাত আর যাবার নয়।'

গলায় জল ঢেলে নিয়ে গফুর বলে, 'তোরা মনে হয় হিঁদুই নোস !'

সে সব দিনের কথা কি গফুর এখনও মনে করে রেখেছে ! নারাণ ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে এসে দাওয়ায় উঠল। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নারাণ ডাকল, 'পদ্দ, অ্যাই পদ্দ।'

গফুর এল তারও একটু পরে। ততক্ষণে পদ্ম একখানা চ্যালাকাঠের সঙ্গে কিছু শুকনো কঞ্চি আর নারকোল পাতা দিয়ে উনুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। গফুর দাওয়ায় চাদরের ভিতর থেকে তাড়ির হাঁড়িটা বার করে বলল, দাঁড়া, আগে দু' খাবলা মুড়ি পেটে দে।'

এক খাবলা মুড়ি মুখে ফেলে চিবুতে যাবার আগে নারাণ পদ্মর দিকে তাকাল। গালের মুড়িটা একটু চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'পদ্ম মুড়ি খাবি ?'

গফুর মুড়ির ঠোঙা নিয়ে পদ্মর কাছে গেল। পদ্মর আঁচলে কিছুটা মুড়ি ঢেলে দিয়ে ফিরে এল নারাণের কাছে। তাড়ির হাঁড়িটা দু'জনে মিলে অল্পক্ষণেই শেষ করে ফেলল। গফুর দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বলল, 'কদমখণ্ডীর আকাশখান এত বেইমান হয়ে গেল ক্যান বলদিনি ! গাঁখান জ্বালায়ে দিল। কলাগাছের পাতাগুলো জ্বলে জ্বলে হলদে মেরে গেল। খেতে ফসল নেই, গর্মির গাঁজা উঠে পুকুরের মাছগুলান হেঁদিয়ে পরে মরে গেল। ওদিকে আবার পলাশডাঙায় আন্ত্রিক নেগেছে। ধলাডাঙায় রতনদারে কারা যেন

BanglaBook.org

পেটাল। তাই নিয়ে শুনতেছি থানা ঘেরাও হবে। শালা যেন চৌদিকে গেরো নেগেছে।'

নারাণ তাড়ি খেয়ে গুম হয়ে বসে আছে। গফুরের সব কথা সে মন দিয়ে শুনছে না। দাওয়ার যে দিকটায় পদ্ম রান্না করছে ওই দিকটা থেকে গরম ভাতের গন্ধ নাকে ভেসে এল।

গফুর বলল, 'শনিবার থানা ঘেরাওয়ের মিছিলে দুগ্গাদা তোরে যেতে বলেছে?'

নারাণ মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর দিল, 'এখনও কিছু বলেনি।'

গফুর বলল, 'তাহলে বলবে। দুগ্গাদা না বললে বিপিনদা বলবে। তা তুই কি যাবি?'

নারাণ বলল, 'পেটের ভাত জোটাতে পারছি না তো ঘেরাও। আমার ওইসব ঝুটঝামেলা ভাল লাগে না।' গফুর বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলে, 'আমাদের তো ভাল না লাগলেও যেতে হবে। দুগ্গাদাদের কুপিত করা চলে না। ভিটে ছাড়ার ভয় আছে না?'

নারাণ গলায় রাগ ফুটিয়ে বলল, 'তুই কি শালা দুগ্গাদার ভিটেয় থাকিস নাকি! ওটা তো তোদের চোদ্দপুরুষের ভিটে।'

গফুর বিড়িতে টান দিয়ে ফুকফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে কত মানুষ এদেশ-ওদেশ চালান হয়ে গেল। তাই সবার মন জুগিয়ে জুগিয়ে থাকা। তুই শালা হিঁদু, তুই বুঝবি না।'

তাড়ির নেশাটা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছিল। এসময় বেশি কথা কইতে ভাল লাগে না। সাধ হয়, বাঁশি বাজাতে। নারাণ বলল, 'তুই চুপ কর। আমি ঘর থেকে বাঁশি এনে বাজাই, তুই শোন।'

গফুর বারান্দার চাটাইয়ের ওপর গেঞ্জি খুলে শুয়ে পড়ল। নারাণ বাঁশি বাজাতে যাবার আগে পদ্ম বলল, 'আবার তুমি রেতেরবেলা বাঁশি বাজাচ্ছো। বলেছি না, ওতে লতা আসে।'

পদ্মর কথা শোনার পর গফুর শোয়া থেকে উঠে বসল। নারাণের হাত থেকে বাঁশিটা টেনে নিয়ে বলল, 'বৌঠান তো ঠিকই কয়েছে। ওই লতাতে আমারও বড় ভয়। তোর ভয় করে না?'

নারাণ কিছুটা জেদের গলাতেই উত্তর দিল, 'না।'

গফুর কয়েক মুহূর্ত নারাণের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলছিস?'

নারাণ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

গফুর এবার একটু সরে এসে বলল, 'যদি তোর ভয় না থাকে, তাহলে একটা রোজগারের ধান্দা বলতে পারি।'

নারাণ বলল, 'কী রকম ধান্দা?'

গফুর শেষ হয়ে যাওয়া বিড়ির আগুনটা বারান্দায় টিপে-টিপে নেভাল। তারপর বলল, 'লতা ধরতে পারবি? ধরে দিতে পারলে হাতে-হাতে নগদ পয়সা। যত দিবি তত পয়সা পাবি।'

নারাণ জিজ্ঞেস করল, 'কাকে দেব?'

গফুর উত্তর দিল, 'পার্টি আছে। ওরা নাকি সদরহাটিতে এয়েচেন। কলকাতার লোক। জ্যান্ত লতা কিনে নিয়ে যায়। ধলাডাঙা আর বিলকান্দার দিকে তো লতাদের আকছার ঘোরাফেরা। কদমখণ্ডীতেও কম নেই। যদি সাহস থাকে সদরহাটিতে গিয়ে তেনাদের খোঁজ কর।'

BanglaBook.org

নারাণ অবিশ্বাসের চোখে গফুরের দিকে তাকাল। এমনও হয় নাকি! কিন্তু এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পদ্ম ওদের খেতে ডাকল।

খেতে খেতে নারাণ একবার গফুরের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নিচু করে ভাতের দলা মুখে তোলবার আগে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি জ্যান্ত সাপ নিয়ে কলকাতায় চলে যায়?'

গফুর উত্তর দিল, 'যদি তোর মুরোদ থাকে তাহলে সদরহাটিতে গিয়ে জেনে আয়।'

ওদের দু'জনকে খেতে দিয়ে উঠোনের পেঁপেতলায় পদ্ম গিয়েছিল উনুনের পোড়া কাঠ নেভাতে। ওদের সব কথা সে শুনতে পায়নি। কিছুটা কানে গিয়েছিল, তাই ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সদরহাটিতে কী হয়েছে?'

নারাণ উত্তর দিল, 'ও কিছু নয়। কোলকাতা থেকে বাবুরা এয়েচেন, তারা নাকি কাজের জন্য ছেলে খুঁজছে। তাই ভাবছি একবার ঢুঁ মারতে যাব।'

কথাটা বলেই নারাণ গফুরের দিকে তাকাল। গফুর ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে বিড়ি ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পদ্ম স্বগতোক্তির মতো বলল, 'কিছু একটা কাম-কাজের ব্যবস্থা হলে ...'

পদ্মর কথা শেষ হল না। গফুরের দোকানের দিক থেকে একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল। দাওয়ার ওপর কান খাড়া করে বসে রইল নারাণ আর গফুর। পদ্ম বারান্দার খুঁটি ধরে ভীত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু গোলমালটা থামছে না। ওটা বাড়তে বাড়তে এগিয়ে আসছে নারাণের বাড়ির কাছাকাছি।

নারাণ আর গফুর উঠোনে নেমে এল। আকাশে ক্ষীণকায়া চাঁদ। অন্যদিকের আকাশটা কেমন যেন কাঁসা-পেতলের মতো। অল্প একটু হাওয়া বইল এইমাত্র। একটা শুকনো পেপের পাতা উঠোন দিয়ে সেই হাওয়াতেই গড়াতে গড়াতে কিছুটা এগিয়ে এসে থেমে গেল।

গফুর বলল, 'ব্যাপারখান কী? এখন তো প্রায় ন'টা বাজে। এত রাত্তিরে ...'

এসব অঞ্চলে রাত ন'টা মানে ঘুমিয়ে পড়ার সময়। কোন-পালা-পার্বণ না থাকলে কদমখণ্ডীর মতো গাঁয়ের মানুষরা ন'টার মধ্যেই শুয়ে পড়ে। রাত দশটা সাড়ে দশটাকে মধ্যরাত বলা যায়। ওরা ঘুম থেকে জেগে উঠতে থাকে যখন, তখন রাত্রি প্রায় চারটে। ছ'টার মধ্যে গোটা গ্রাম জেগে যায়। ভোর চারটেতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে চৌধুরীদের রাধা-গোবিন্দের ঘুম ভাঙানো হয়। তারপরে শোনা যায় আজানের শব্দ। বোধহয় তারও আগে থেকে রোজকার কাজে নেমে যায় ভোলাকাকারা। পুকুরঘাটের কাঠের পাটায় তাদের কাপড় আছড়ানোর ধপাস-ধপাস শব্দ শোনা যায়। কিন্তু এত রাতে এমন কোলাহল তো কখনও শোনেনি গফুর আর নারাণরা। ওরা গুটি গুটি পায়ে উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

॥৩॥

গোটা ঘটনাটা এখনও অবিশ্বাস্য লাগছে দুর্গাপদ, বিপিন আর রতনদের কাছে। কুলি-কামিনদের জীবনে কষ্ট কোন নতুন ঘটনা নয়। ওরা তো কষ্টের মধ্যেই জন্মায়, কষ্টের মধ্যেই বড় হয় আর কষ্টের মধ্যেই মরে যায়। কিন্তু সেই কষ্টের জন্য ওরা এমন

কাণ্ড করবে কেন ? মাগি-মদ্দরা মিলে হাঁড়িয়া টেনে মশাল জ্বালিয়ে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে ভাঙচুর করবে ? দুর্গাবাবু আর বিপিনবাবুদের মুখের সামনে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা কইবে !

দুর্গাদা বললেন, 'কাজটা ওরা করলেও ওদের পিছনে অন্য মাথা আছে। আমি আর বিপিন ছাড়া কেউ জানে না, ওই ভাটা পোদ্দারদের কাছ থেকে কারা পেয়েছে, আমরা কাদের মদত দিয়েছি। ইঁটভাটা উঠে গিয়ে যে পেরেককল হবে সেটাও আমরা দু'জন ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু ওই মংলু, বরখে আর ঝমরুরা কেমন করে জানল, যদি না কেউ ওদের জানিয়ে থাকে। এটা কিন্তু সামান্য ঘটনা নয়। রতনকে পেটানো, গতকাল রাত ন'টায় পঞ্চায়েত অফিসে হামলা এসব কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই মুহূর্তে রুখে দাঁড়াতে না পারলে ওরা দিন-দুপুরে আমাদের অ্যাটাক করবে। পার্টিকর্মীরা আমাদের ওপর ভরসা হারাবে, ওরা বসে যাবে।'

রতন বলল, 'দুগ্গাদা, থানা ঘেরাও করার কর্মসূচিটা এগিয়ে আনা যায় না ?'

দুর্গাদা বললেন, 'ওতে লাভ হবে না। ওটা যেমন আছে তেমনই থাক। ওর সঙ্গে কাল রাতের ব্যাপারটাকেও ইস্যু করতে হবে।'

রতন বলল, 'কাল রাতে যারা এসেছিল তাদের সবাইকে তো চিনতে পেরেছি। ওদের নামে ডায়েরি করলেই তো হয়।'

দুর্গাদা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'রাজনীতিটা বোঝবার চেষ্টা কর। পরিবেশ আর পরিস্থিতিকে শুধু সামনে থেকে নয়, পিছন থেকেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা কর। কদমখণ্ডী, ধলাডাঙা, পলাশডাঙা আর বিলকান্দা এই চারটে গ্রামে হিন্দু ভোট আছে চুয়ান্ন শতাংশ, মুসলমান ভোট বত্রিশ শতাংশ। দুইয়ে মিলে কত হল ? চুয়ান্ন আর বত্রিশ মিলে হল ছিয়াশি। বাকি চোদ্দ শতাংশ ভোট কোত্থেকে আসে জানো ? আসে ওই সাঁওতাল, আর ধাঙড়দের থেকে। গত বারো বছরে ওই চোদ্দ পার্সেন্ট ভোটের একটাও অন্য দলে যায়নি। মুসলিম ভোটের পঁচিশ থেকে আটাশ আমরা পাই। হিন্দু ভোট পঁচিশ পার্সেন্ট পেলেই আমরা হেসে খেলে জিতে যাই। ওই মংলুদের ভোটটা আসলে আমাদের পকেট ভোট। একেবারে ব্লক ভোট।'

দুর্গাদা থেমে যান। বিপিন গড়াই পকেট থেকে বিড়ি বার করে মাথার দিকে একবার ফুঁ দিয়ে বিড়িটা ধরান। তারপর খুকখুক করে একটু কেশে নিয়ে বলেন, 'সমস্যাটা জটিল হচ্ছে। সবকটা আক্রমণের লক্ষ্যই কিন্তু আমরা। কংগ্রেসিদের এত শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে কেমন করে ?'

দুর্গাদা নস্যি নিয়ে বলেন, 'ওই শক্তির উৎস খুঁজে বার করতে হবে। মংলুদের ওপর কোন অ্যাকশন নিও না। পুলিশ ওদের ধরলে ওই চোদ্দ পার্সেন্ট অন্য দলে যাবে। বরং ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে বোঝবার চেষ্টা কর কারা ওদের পিছন থেকে ইন্ধন জুগিয়েছে। পেটে ভাত নেই অথচ এতগুলো লোক হাঁড়িয়া কেনার অথবা বানাবার পয়সা পেল কোত্থেকে ? নাটের গুরু কারা ?'

পঞ্চায়েত অফিসে জনা দশেক লোক। সব্বাই বিষম চিন্তায় পড়ে গেল। সন্দেহটা সকলেরই অন্য দলের ওপর কিন্তু সন্দেহের কোন সূত্র তাদের হাতে নেই। এটা এখন এক ধরনের অভ্যাস। সেই সূত্রটা খুঁজে বার করতে হবে তাদের। দুর্গাদা অফিস থেকে উঠতে উঠতে বললেন, 'কাল আমি সদরহাটিতে যাব। সদরহাটির পার্টি অফিসে এটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ওখান থেকে কেউ যদি দু' একদিনের মধ্যে কলকাতা যায়

BanglaBook.org

তাহলে তার হাত দিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে।'

সবার পরে অফিসের তালাবন্ধ করে বেরুলেন বিপিন গড়াই। এখান থেকে পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলেই তাঁর বাড়ি। হেঁটে যেতে যেতে আফজলকে বললেন, 'তুই কাল একবার সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখ তো ইদানীং কারা ওখানে যাতায়াত করছে। মংলু আর বরখেদের সঙ্গে কাদের বেশি দোস্তি।'

আফজল মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে অচিরেই একটা গণ্ডগোল বেধে উঠবে। গাঁয়ের বুক শুকিয়ে মাঠের মাটি ফেটে হাঁ হয়ে যাচ্ছে, বিলকান্দার গহীন খালেও যেন ভাটার টান, গাছ-গাছালির মাথা শুকিয়ে পাতা জ্বলে-জ্বলে খসে যাচ্ছে। পলাশডাঙায় দিনে এক-দু'জন করে মরতে লেগেছে আন্ত্রিকে। কিন্তু সে সব কথা ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছে। দুগ্গাবাবুদের মাথায় সেঁধিয়েছে অন্য কথা। আবার গোকুলমাস্টার, জীবন দাস আর খালেদরা বলছে, 'আফজল, ওদের তো চিনিস না, ওরা গাঁয়ের সমস্যাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্যে লোকের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নতুন-নতুন ইস্যু তৈরি করে একটা হাঙ্গামা বাধাবে। তোরা কিন্তু ওদের কথায় ভুলবি না। ওরা রাজ্যে থাকলে জানবি আমরা সেন্ট্রালে আছি। পঞ্চায়েতের কত টাকা নয়-ছয় করেছে জানিস? ঘূর্ণিঝড়ে দেড়শো বাড়ি ভেঙে গেল। কলকাতা থেকে সরকারি টাকা এল। তোরা কত পেয়েছিলি?'

আফজল অনেক ভেবে-টেবে বলল, 'ঘরে দেবার টালি, কেউ কেউ টিন আর নগদ দু'শো টাকা পেয়েছিলুম।' গোকুলমাস্টার বললেন, 'তোদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল পাঁচশো টাকা। বাকি তিনশো টাকা ওরাই মেরেছে। সাপকে বিশ্বাস করবি, তবু ওদের করবি না।'

দুর্গাবাবুর সামনে যেমন, গোকুলমাস্টারের সামনেও তেমনই মাথা নাড়ে আফজল। লোকজনের কথা শুনে সে মাঝেমধ্যে বড় ধন্দে পড়ে যায়। চেনা লোকের মুখগুলো মাঝে-মধ্যে বড্ড অচেনা হয়ে ওঠে। কে যে হক কথা বলছে সেটা আফজল বুঝতে পারে না। একদিন থাকতে না পেরে খালেদচাচার দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। চাচা তখন একা দোকানে বসে কামিজ সেলাই করছে। আফজলকে দেখে বলল, 'কী রে আফজল, বিপিনবাবুদের ডেরা ছেড়ে হঠাৎ আমার দোকানে কেন?'

আফজল খালেদচাচার সামনে বসতে বসতে বলল, 'ওসব পার্টি-ফাটির কথা ছাড়ো। গতর না খাটালে স্বয়ং খোদাও খেতে দেয় না, পার্টিও দেবে না।'

খালেদ চাচা সেলাইয়ের মেশিন থামিয়ে কামিজটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'তবে কেন ওদের পাছায়-পাছায় ঘুরিস! ওরা কি তোর বাপ?'

আফজল খালেদচাচার মুখের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল তারপর চোখ নামিয়ে নিতে নিতে বলল, 'ঘুরি প্রাণের দায়ে। ওনারা আছেন বলে রেতের বেলা এখনও ঘুমোতে পারি। ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করেনি। চাচা তুমি আপন জাত, তোমারে বলতে বাধা নেই, তোমাদের দলের ছেলেদের ওপর ভরসা কম। ওরা তো নিজেরাই নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে। গোকুলমাস্টার যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে বিলকান্দার পরেশ মণ্ডল বলবে না, আবার পলাশডাঙার অহীন ঘোষ যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে বিলকান্দার সুজন নন্দী বলবে, অহীন কে? আমি যা বলব তাই হবে। সবার উপরে সদরহাটি। তেনারা সবাই নাকি দিল্লি যান। কলকাতার নেতারা তাদের হাতের মুঠোয়। সদরহাটির কো-অপারেটিভ নিয়ে দু'দলে বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যেই

BanglaBook.org

যখন এত বিবাদ তখন তাঁদের ওপর ক্যামনে ভরসা করি।'

খালেদ মিঞা বলল, 'বিবাদ ওদের মধ্যেও আছে। তবে কিনা ওরা ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচে।'

খালেদচাচা মেশিন চালাতে আরম্ভ করল। সেলাই মেশিনের ঘরঘর আওয়াজ উঠল আবার। মেশিনটা থামতেই আফজল বলল, 'চাচা, তুমি আমাদের জ্ঞাতি। তোমারে একটা সাচ্চা কথা কই। দুম্বাবাবুরা সাচ্চা পয়গম্বর এমন কথা কইছি না। কিন্তু তেনারা আছেন বলে অনেক নিশ্চিন্তে আছি। ভোটগুলান তেনাদের দিলে তেনারা আমাদের দেখবেন। মোচলমান বলে উৎখাত করবেন না।'

খালেদ মিঞা সেলাই মেশিন থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই কি মনে করিস তেনারাই তোদের আগলে রেখেছেন? একদম মিছে কথা। '৪৬ সালে তুই জন্মাসনি। তখন কে তোদের বাঁচিয়েছিল? দুম্বাবাবুরা তখন কোথায়? ওদের পাটিকে তখন কটা লোক চেনে। তেরঙ্গা ছাড়া অন্য কোন পতাকা তখন ছিল না। তারপর ওই পঞ্চাশ-একান্নর দাঙ্গায় এই কদমখণ্ডীর গায়ে আঁচ নেগেছে? সদরহাটির এক ক্রোশ দূরে চটকল। ওর নাম কামারডাঙা। ওখানে ছিটেফোঁটা গণ্ডগোল। তারপর চৌষট্টিতে আবার দাঙ্গা। তখন তো এ গাঁয়ের লোক টেরও পায়নি দাঙ্গা নেগেছে কি নাগেনি। তা এসব কাদের জন্যে, গোকুলমাস্টার, জীবন দাস আর প্রভাত রায় এদের জন্যেই তো। তা প্রভাতদা তো মারা গেছেন। ওঁরা ছিলেন বলেই আমাদের উৎখাত করেনি।'

আফজল একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'চাচা, অত হিসেব-নিকেশে কাম নেই। আমি জানি নিজে বাঁচলে বাপের নাম। বাঘ-সিংহের মধ্যিখানে আমরা হরিণছানা। কোনও একটা দলে না ভিড়লে ভিটেমাটি, বৌ-বাচ্চাদের নিয়ে টিকতে পারব না। আমার চাচাকে তো জান, গেঞ্জির দোকান ছিল কলকাতার রাজাবাজারে। আমার চাচার ছেলের জুতো সেলাইয়ের কারবার ছিল কলাবাগানে। ওই চৌষট্টি সালে কলাবাগানে আগুন লাগল। দাদার কারবার পুড়ে ছাই। ওই বছরেই কলকাতার পাট চুকিয়ে চাচা চলে গেলেন ঢাকায়। যাবার আগে চাচা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'জন্মে অবধি একটা দেশকেই জানি, সেই দেশটার নাম কলকাতা। চার পুরুষ ধরে এখানেই বাস। কলকাতার সঙ্গে নাড়ির টান—যেন মায়ের সঙ্গে ছেলের। চার পুরুষ আগে ছিলুম সন্দেশখালিতে। কাম-কাজের ধান্দায় ইদিকে আসা। আজ বড় দুঃখে কলকাতা ছাড়তে হচ্ছে।'

চাচি আঁচলে চোখ মুছে নাক টানছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাবধানে থাকিস। আজ বুঝতে পারছি যারা ওদেশ ছেড়ে এদেশে এসেছিল তাদের কত কষ্ট হয়েছিল। আমাদের মধ্যে এমন সব্বোনেশে বেড়া কে তুললে?'

সেদিন চাচির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল এসেছিল। আজও বুঝি না কে ওই সব্বোনেশে বেড়া তুলে দিয়েছে আমাদের মধ্যে। আমাতে আর সনাতনে কিসের তফাত, কেন তফাত।'

খালেদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মেশিনে তার সেলাইয়ের কাজ যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইল। সে মুখ তুলে বলল, 'আমার কুটুমরাও গেছে ওদেশে। টাঙ্গাইলে থাকে। মাঝেমধ্যে চিঠিপত্তর দেয়। আছে, ভালই আছে, তবে এখানে যেমন ছিল তেমন নয়। জাতের ভয় গেছে, কিন্তু পেটের ক্ষুধা মেটেনি। আর আমাদের, জাতের ভয় আর পেটের ক্ষুধা দুই-ই আছে। তাই তো কোন একটা বড় গাছে নাও বাঁধতে চাই। যে যেমন বুঝবি তেমন গাছে নাও বেঁধে থাক। নিজের দেশে নিজেকে বড্ড পরদেশী মনে হয় রে

BanglaBook.org

আফজল।'

শেষের দিকে খালেদচাচার গলাটা অন্যরকম হয়ে গেল। মাথা নিচু করে চাচা মেশিন চালাতে লাগল। মেশিনের ঘরর-ঘরর শব্দে অন্য শব্দরা হারিয়ে গেল। খালেদ মিঞা বললেন, 'যে যা ভাল বুঝিস তাই করে যা। আমি কি আর সাধে করি রে, বাপ-দাদার ভিটেতে যাতে মরতে পারি, এই দ্যাশের মাটিতেই যাতে আমার গোর হয় সে জন্যেই তো এত সব। কে যে আপন, কে যে আমাদের নিজের লোক সে আর বুঝতে পারিনে। সব যেন মাঘ মাসের কুয়াশায় ঢাকা। দু'হাত দূরের মানুষকে চিনতে পারি না। ধলাডাঙার ইঁটভাটাটা নিয়ে কি কেচ্ছাটাই না করলে দুন্নাবাবুরা।'

কথা শেষ করে খালেদ মিঞা আবার মেশিন চালাতে আরম্ভ করল। আফজল কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, 'চাচা, রতনরে কে মারল তা জানো?'

খালেদ মিঞা বলল, 'পঞ্চায়েতে ওদের কয়েকটা আসন চলে যাওয়ায় দুন্নাদাকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে সদরহাটির জেলা কমিটিতে। তাই নিজেরাই রতনকে পিটাই করে একটা ইস্যু করতে চাইছে। দোষটা চাপাতে চাইছে আমাদের কাঁধে। যাতে কৈবর্তপাড়ার এগারোশো ভোটে কোন ভাঙন না ধরে। ওখান থেকে আমরা এবার পাঁচশো ভোট পেয়েছি। কিন্তু গত জেনারেল ইলেকশনে এবং গতবার পঞ্চায়েতে আড়াইশোর বেশি পাইনি। তাই রতনকে শহিদ করার চেষ্টা হয়েছে।'

আফজল আবার ধন্দে পড়ে যায়। এতসব কাণ্ড হয় নাকি! এসবই কি ভোটের জন্যে? আফজল উঠে দাঁড়ায়। যেতে যেতে বলে, 'চাচা আজ চলি। বড় কষ্টে আছি। যদি পারো তবে গাঁয়ের জন্য একটু ভাবো। গাঁখান তো শুইকে মরে গেল গো।'

আফজল ধীর পায়ে চলে যায়। কাদের সেলাই মেশিন বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বুজে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'আল্লা, তুমি গেরাম আর গেরামের লোকগুলানরে বাঁচাও।'

নারাণ সদরহাটিতে এসে খোঁজ করতে করতে তাদের দেখা পায়। ফর্সা রঙের জনা চারেক লোক। ঘরের মধ্যে খাটো-খাটো সাদা রঙের প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর পাইপ টানছিল। থেকে থেকে বিয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে বিয়ার খাচ্ছিল। এসব জিনিসের সঙ্গে নারাণের পরিচয় আছে। বিলকান্দার বিলে যাঁরা পাখি শিকারে আসতেন তাঁদের কেউ কেউ পাইপ খেতেন, ডিঙ্গি নৌকায় তুলে নিতেন বিয়ার। বিলকান্দার জলে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না বলে তাঁরা কলকাতা থেকে বোতল-বোতল জল কিনে আনতেন। তবে সেই জল আর খাবেন কখন! বিয়ার খেয়েই তেষ্টা মেটাতেন আর থেকে থেকে ডিঙ্গির ওপর দাঁড়িয়ে বিলকান্দার বিলেই জল ছাড়তেন। সে বড় বিশ্রি ব্যাপার মনে হতো নারাণের। অমন সাফসুতরো চেহারার বাবুদের এ কেমন কাণ্ড। নারাণ আধঘণ্টা বসে থাকার পর একজন বলল, 'তোমার কী নাম?'

নারাণ নাম বলল।

লোকটা পাইপে টান দিয়ে বলল, 'সাপ ধরতে পারবে? এ কিন্তু আনাড়ি লোকের কাজ নয়। এর জন্য এলেম চাই। দাঁতে বিষ আছে এমন সাপ ধরলে সাপ পিছু পঞ্চাশ টাকা পাবে।'

নারাণ বলল, 'বাবু, বিষ তো সব সাপেরই আছে। তবে কিনা কম-বেশি।'

লোকটা এবার পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'তা জানি। তবে সব সাপের

BanglaBook.org

বিষেই মানুষ মরে না। অর্ধেক মানুষ মরে ভয়ে হার্টফেল করে। তুমি যদি কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড় এই জাতীয় সাপ জ্যান্ত ধরে আনতে পার তবে প্রতিটা জ্যান্ত সাপ পিছু তুমি পঞ্চাশ টাকা পাবে। যে সাপে মানুষ মারা বিষ নেই সেগুলোর কোন মূল্য নেই আমাদের কাছে।'

নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'সাপগুলান নিয়ে আপনারা কী করেন ?'

লোকটা পাইপে টান দিয়ে বলে, 'সাপ নয়, সাপের বিষে আমাদের দরকার। যদি তুমি রাজি থাক, তবে আমাদের হয়ে কাজ করতে পার।'

নারাণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, 'দেখি, যদি পারি তবে এইখানে নিয়ে আসবো।'

নারাণ বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন হয়তো সকাল এগারোটা, কিন্তু মনে হচ্ছে এটা যেন একটা দগদগে দুপুর। মাটিতেও রোদের তাপ ঠিকরে বেরুচ্ছে। সদরহাটির গঞ্জ এখন জম-জমাট। বাসের হর্ন, রিকশার প্যাঁক্-প্যাঁক আর লাউডস্পিকারের দোকানে শব্দ করে হিন্দি গান, সব মিলে যেন চড়কের মেলা বসে গেছে। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, কলকাতার সাপ কেনা বাবুরা, নারাণকে কিছু অগ্রিম দেবে, কিন্তু সে সব কোনও কথাই উঠল না। মনে হল এরা বড় সোজা কথার কারবারি। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল গোছের ব্যাপার। জ্যান্ত সাপ ধরে এনে হাজির করো, পছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা। অন্যথায় একটি পয়সাও গলবে না হাত দিয়ে। নারাণ হাঁটতে হাঁটতে এসে চায়ের দোকানে বসল। কদমখণ্ডীতে এখনও পঁচিশ পয়সা দিলে আধগ্লাস চা মেলে, কিন্তু সদরহাটিতে পঞ্চাশ পয়সার কমে কেউ চা বেচে না। পকেটে মোটে দেড়টা টাকা। তাও রোজগার হয়েছে চৌধুরীবাবুদের দৌলতে। রাধাগোবিন্দের মন্দিরের পেছনে দেদার আগাছার জঙ্গল। চৌধুরীদের বড়মা নাকি সন্ধ্যারতি দিয়ে ফেরার পর ওখানে সাপ দেখেছেন। তাই নারাণকে ডেকে জঙ্গলটা সাফ করাতে হয়েছে। সেই সুবাদে মজুরি মিলেছে সাত টাকা। চাল-ডাল কেনার পর দেড় টাকা থেকে গেছে। দোকান থেকে লাল সুতোর বিড়ি কিনতে গিয়ে নারাণ দেখতে পেল সনাতন উল্টোদিকের দোকানে বসে পরোটা আর আলুর দম সাঁটাচ্ছে। সনাতনদা এত পয়সা পায় কোথায় ? ভিটে-মাটির বড় অংশ তো কবেই চৌধুরীদের কাছে দেনার দায়ে বেচেছে। এখন শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই। কাজ-কম্মের কোন হদিশ নেই। অথচ এই দুর্দিনেও সনাতন রোজ সন্ধেবেলা এক পাঁইট মদ খায়, কাপ্তেনি করে সিগারেট ফোঁকে, থেকে-থেকে বৌ নিয়ে সদরহাটিতে আসে সিনেমা দেখতে। এখন আবার পরোটা-আলুর দম খাচ্ছে। ও শালা পয়সা পায় কোত্থেকে ?'

চার আনার বিড়ি কিনে একটা ধরাল নারাণ। রাস্তার এপাশ থেকে সনাতনদাকে দেখতে দেখতে বিড়ি টানছিল। সনাতন ওকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় ডাকল। কাছে যাবার পর বলল, 'খাবি ?' পরোটা ভাজার গন্ধে খিদেটা পেটের মধ্যে হামলে উঠলেও নারাণ বলল, 'না, থাক।'

সনাতন বলল, 'থাকবে কেন ! আয়-আয়, দু'খানা পরোটা খেয়ে নে।'

নারাণ আর আপত্তি করতে পারল না। তার পেটের খিদে তাকে আপত্তি করতে দিল না। সে খেতে খেতে একবার সনাতনদার দিকে তাকাল। সনাতন নিজের খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে টান দিতে দিতে বলল, 'সদরহাটিতে কেন এয়েছিলি ? কাজকম্মের ধান্দায় ?'

BanglaBook.org

নারাণ বলল, 'কাজ-কামের ধান্দা ছাড়া কে আর আসে বল।'

সনাতন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'কিছু হল ?'

নারাণ পরোটা চিবুতে চিবুতে বলল, 'তেমন কিছু নয়। কলকাতা থেকে কয়েকজন বাবু এয়েছেন জ্যান্ত সাপ কিনবেন বলে। বললেন, বিষওলা জ্যান্ত সাপ ধরে আনতে পারলে পঞ্চাশ টাকা। তা ভেবে দেখলাম, খেতের কাজ তো গেছে, চাষ-বাসও নেই। ঠনঠনে জমিতে গেঁড়িভাঙা কেউটেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধলাডাঙার ইঁটভাটার দিকেও অনেক আছে। যদি ধরতে পারি তা হলে কিছু রোজগার হয়।'

সনাতন বলল, 'যদি ধরতে গিয়ে বেমক্কা ছোবল খেয়ে তুই মরে যাস তা হলে কী হবে ? তোর পোয়াতি বৌটার কী গতি হবে ?'

নারাণ নিজের গলায় জেদ আর অভিমান মিশিয়ে বলল, 'না খেয়ে মরার চাইতে কিছু একটা করার চেষ্টা করে মরা ভাল। এভাবে শুকিয়ে-শুকিয়ে কদ্দিন থাকবো ?'

সনাতন সিগারেটে টান দিয়ে নারাণের দিকে তাকাল। খাওয়া শেষ হবার পর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে বলল, 'একটা নতুন ধান্দা আছে। যদি বেইমানি না করিস তাহলে বলতে পারি। তোর পেট-ভাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

নারাণ বিড়ি ধরাতে যাচ্ছিল। সনাতন তার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে, সিগারেট খা।'

নারাণ সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ধান্দা কী ?'

সনাতন যেতে যেতে বলল, 'চল, ওই দিক পানে যাই।'

সনাতন তাকে নিয়ে এল বাসস্ট্যান্ডের পিছনে। একটা বড় পুকুরের পাশে বড়সড় একটা শিশু গাছ। তার তলায় দাঁড়িয়ে সনাতন বলল, 'ধলাডাঙার ইঁটভাটা উঠে যাচ্ছে। ওখানে পেরেক কল হবে। তার পাশে কাঠ চেরাইয়ের মস্ত কারখানা। ধলাডাঙ্গার ওপাশে ওই টিলা-টিলা দেওয়া পাথুরে জমি, ওই জমির তলায় নাকি তেল পাওয়া গেছে। যে তেল দিয়ে গাড়ি চলে।'

নারাণ বলল, 'পেট্রোল ?'

সনাতন বলল, 'হ্যাঁ। দিল্লী থেকে লোক এসেছিল, সঙ্গে রাশিয়ার সাহেবরা। তারা পরীক্ষা করে দেখেছে ওই ধলাডাঙার ওপার থেকে বাঘমারির জঙ্গল পর্যন্ত নাকি তেল আছে।'

নারাণ বলল, 'সে তো কবে থেকে শুনছি।'

সনাতন বলল, 'এ আর শোনাশুনি নয়, এটা হক কথা। এমনটা হলে ইদিকে জমি-জমার দাম বেড়ে যাবে। তুই যদি আমার মতো জমির দালালি করতে পারিস তাহলে ভাল রোজগার করতে পারবি। তোর ওই সাপ ধরার চাইতে অনেক বেশি রোজগার।'

নারাণ বলল, 'আমি বললেই কি লোকে তার বসত ভিটে বেচবে ?'

সনাতন বলল, 'দূর শালা, বসত ভিটে কেন বেচবে। তার বাইরে অনেক জমি আছে না। সে সব জমির খালি সন্ধান দিবি। তারপর ওরা বুঝে নেবে।'

নারাণ বলল, 'ওরা মানে কারা ?'

সনাতন মুচকি-মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'আছে আছে। আমার সঙ্গে থাক সব জানতে পারবি। যেমন ধর দেনার দায়ে চাষিরা টাকা ধার করে না ? আমার বাবাও করেছে, তোর বাবাও করেছে। তা সেই টাকা শোধ না হলে কী হয় ?'

নারাণ উত্তর দেয়, 'জমি যায়। আমার বাবার দশ বিঘে ধান জমি তো ওই করেই

BanglaBook.org

চৌধুরীদের পেটে গেল। এখন তো ওই জমিতেই আমি সাত টাকা রোজে কাজ করি। তাও এ সনে একদিনও কাজ হল না।'

সনাতন বলল, 'যারা টাকার জন্যে চৌধুরীবাবু, ঘোষালবাবু, আর বিশ্বাসদের কাছে জমি বাঁধা রেখেছে তাদের জমিও আমি ইচ্ছে করলে খালাস করে আনতে পারি।'

নারাণ বলল, 'কেমন করে?'

সনাতন আবার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'আছে আছে। তারও উপায় আছে। বাপেরও বাপ আছে।'

নারাণ বলল, 'আমার বসত ভিটেও তো মোটে চারশো টাকায় বাঁধা আছে চৌধুরীবাবুদের কাছে। কবে যে শোধ হবে কে জানে।'

সনাতন ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, 'তুই ইচ্ছে করলে আজই শোধ হতে পারে।'

নারাণের মনে হল সনাতনদা যেন ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করেছে। যত সহজে বলছে তত সহজে এসব ব্যাপার মিটবে কেমন করে? লোকটার মাথায় গণ্ডগোল হয়নি তো?'

নারাণ জিজ্ঞেস করল, 'আমি ইচ্ছে করলেই হবে? কিন্তু কেমন করে হবে?'

সনাতন উত্তর দিল, 'চল যেতে যেতে কথা হবে। যদি কথা শুনিস তাহলে বাঁচবি, না শুনলে মাঠে-জঙ্গলে সাপ ধরে মরগে যা।'

বিকেলের আগেই সদরহাটি থেকে ফিরে এল নারাণ। কদমখণ্ডীর রাস্তায় তখন বিপিন গড়াইয়ের নেতৃত্বে মিছিল বেরিয়েছে। শনিবার থানা ঘেরাও অভিযানে গ্রামের সবাইকে যাবার জন্য ডাক দিচ্ছে মিছিল থেকে। নারাণ দেখল, ওই মিছিলে আফজল, গফুর, আকবর, গোবিন্দ, শিবু সবাই আছে। গফুর তাকে হাতের ইশারায় ডাকল। কিছু করার ছিল না বলে নারাণও মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যেতে লাগল। নারাণ যেতে যেতে বলল, 'কদ্দূর যাবি?'

গফুর বলল, 'বড়মসজিদ ঘুরে ধলাডাঙা পর্যন্ত যাব।'

নারাণের মনে পড়ল সনাতনদা বলেছে, 'তেলের ব্যাপারটা কাউকে বলবি না। কিন্তু এতে গোপন করার মতো কী আছে। কত বছর থেকেই তো এমন একটা কথা তারা শুনে আসছে। এই মিছিলে যত লোক যাচ্ছে তারা সবাই কোনও না কোনও সময় এই রকম একটা কথা শুনেছে। নারাণ গফুরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুই ধলাডাঙা অব্দি যাবি?'

গফুর বলল, 'যেতেই হবে। বিপিনদার শালা শকুনের চোখ। কেটে পড়লেই ভাববে আমি গোকুল মাস্টারের লোক, কাদেরচাচার চামচা। এ গাঁয়ে মোচলমানদের ম্যালা বিপদ। তেনাদের মন জুগিয়ে চলতে হয়।'

মিছিলটা ধলাডাঙায় গিয়ে পৌঁছল বিকেল গড়াবার মুখে। মিছিলে মংলুদেরও ডেকেছিলেন বিপিন গড়াই। কিন্তু কেউ মিছিলে আসেনি। ধলাডাঙার মাঠে দুগ্গাদা আর বিপিনদা বক্তৃতা দেওয়ার পর মিছিল ভাঙল। ধলাডাঙা থেকে কদমখণ্ডী ফেরার পথে বিপিন গড়াই বললেন, 'মংলুদের ব্যাপারটা দেখলেন তো দুগ্গাদা?'

দুর্গাদা গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। এবার বুঝতে পারছো তো কে ওদের পেছন থেকে সুতো নাড়ছে। তুমি আর রতন গিয়ে ওদের বলে এলে, আমিও গেলাম, তবুও কেউ এল না। থানা ঘেরাওয়ের দিনও কেউ আসবে না। গোকুল মাস্টার আর তাদের

BanglaBook.org

দলের লোকেরা ওদের বদ বুদ্ধি জোগাচ্ছে। মংলুরা তো বুঝছে না, ওরা কেউটের ফনার তলায় আশ্রয় নিয়ে ভাবছে বড় সুখে আছি।'

থানা ঘেরাওয়ের ব্যাপারটা যেন একটা উৎসব। গোটা গ্রামকে সেই উৎসবে মাতিয়ে দিতে চাইলেন দুর্গাদা। ভয়ে আর ভক্তিতে, ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় অনেকেই এসে মিছিলে যোগ দিল। মিছিলে ফেস্টুন আর পতাকা নিয়ে লাইন করে দাঁড়াচ্ছিল সবাই। হঠাৎ আতায়ুরের মা এসে বলল, 'অ্যাই আতায়ুর কই রে, থানার পানে গেলে ওখান থেকে দাঁতে দেবার দু' পুরিয়া গুল এনে দিস তো! ওদিককার গুল বড্ড ভাল।'

গোবিন্দর বুড়ি পিসি রাতের বেলা চোখে দেখে না। তাকে কে যেন বলেছে, গোবিন্দ তো থানায় যাচ্ছে, ওরে দিয়ে কোবরেজি কাজল আনিয়ে নাও। তিন দিন চোখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে চোখের দৃষ্টি রাতের বেলা ফিরে আসবে। তা সেই পিসি এখন দাঁড়িয়ে থাকা মিছিলে গোবিন্দকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। গফুর আর নারাণ রয়েছে মিছিলের শেষভাগে। নারাণ দেখল, তা প্রায় শ' পাঁচেক লোক জুটিয়েছেন বিপিনদা আর দুগ্গাদা। এরপর পলাশডাঙা আর বিলকান্দা থেকেও কিছু লোক আসবে। ডাঙ্গাডিঙ্গলের কিছু লোক এখানে এসে গেছে, বাকিরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। কিন্তু অতটা পথ পায়ে হেঁটে শেষ পর্যন্ত সবাই কি থানায় যাবে?

গফুর বলল, 'যাবে যাবে। কিছুটা ভয়ে আর বাকিটা পেটের টানে।'

নারাণ বলল, 'ভয়টা না হয় বুঝি, কিন্তু পেটের টানে কেন?'

গফুর বলল, 'মিছিলে গেলে চাল আর আটা মিলবে।'

নারাণ বলল, 'সে তো দেয় লরি করে কলকাতার মিছিলে গেলে আর গাঁয়ের ভোটের দিন।'

গফুর চাপা ধমকের সুরে বলল, 'তুই শালা কিছু জানিস না। চাল আর আটা মিলবে বলেই তো এত লোক। তাই তো তরে ডাকলাম। নইলে আমাদের মতো গরীব-গুর্বো লোকের কী কাম পড়েছে যে থানার দারোগার পাছায় গিয়ে খোঁচাবো। খিদে এসে পেটে খোঁচায় তাই অন্যরে খোঁচাবার জন্যে দলে ভিড়ে যেতে হয়।'

থানায় পৌঁছবার পর বোঝা গেল গফুর মিথ্যে বলেনি। রতন দলুই, নাজির আর পঞ্চানন মাঝি সবার হাতে একখান করে কাগজের টুকরো দিয়ে বলল, 'এই স্লিপটা মোটেও হারাবে না। কাল এটা নিয়ে নিজের-নিজের এলাকার পঞ্চায়েতে দেখালে স্লিপ পিছু এক কিলো চাল আর এক কিলো আটা পাবে। সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটের মধ্যে যেতে হবে। স্লিপটা সাবধানে রেখো।'

থানার বাইরে একজোড়া বকুল গাছের নীচে গফুর আর নারাণ বসল। একটু পরে ওদের পাশে এসে বসল গোবিন্দ আর আফজল। দুর্গাদা আর বিপিনদা হাতে মাইক নিয়ে কী যে বললেন তা ওরা কেউ ভাল করে বুঝতেই পারল না। বোঝা গেল না বলে শোনার আগ্রহও কমে গেল। তারপর দুর্গাদা আর বিপিনদা গেলেন দারোগাবাবুর ঘরে। এতটা পথ হেঁটে এসে নারাণের ঘুম পেতে লাগল। সকাল সাতটায় গিয়ে মিছিলের লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। এখন বকুল গাছের ছায়ায় বড্ড মিঠে হাওয়া। যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো। চোখ বুজে আসছিল তার।

এরই মধ্যে বিপিনদা একবার বেরিয়ে এসে বারান্দা থেকে মাইকে বললেন, 'এখনও আলোচনা চলছে। আপনারা কেউ যাবেন না। শান্ত হয়ে অপেক্ষা করুন।'

এরপর সত্যি-সত্যি নারাণ ঘুমিয়ে পড়ল। নারানের ঘুম ভাঙল যখন গফুর তাকে ধাক্কা

pathagar.net

দিয়ে জাগাল। ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠতে উঠতে নারাণ বলল, 'কী হল ?

গফুর যেতে যেতে বলল, 'যা হয় তাই হল। আমাদের নীতিগত নাকি একটা গত আছে তার জয় হল।' নারাণ বলল, 'তার মানে কী ? রতন দলুইরে যারা মারল তারা কি ধরা পড়েছে ? গাঁয়ের অশান্তি কি দূর হবে ?'

গফুর উত্তর দিল, 'কী হবে না হবে সেটা আমি কেমনে জানব। জানতে সাধ হয় তো সামনে গিয়ে দুশ্মার্দা আর বিপিনদারে শুধাগে। আসার কথা এয়েছি। সিলিপ পেয়েছি, কাল মাল পেলেই ল্যাটা চুকে যাবে।'

নারাণ পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল, তার সিলিপটা আছে কিনা।

ধলাডাঙা ছাড়িয়ে কিছুটা আসার পর মিছিলটা আর মিছিল রইল না। যে যার মতন বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। গফুর দোকানে ঢুকে যাবার পর বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে একা হেঁটে আসছিল নারাণ। তখন বিকেল ডুবে যাচ্ছে। শেষবেলার মলিন আলো রাস্তার ধুলোর ওপর ছড়িয়ে আছে আবছা অন্ধকারের মতো। চারপাশে কেমন যেন ঝিমধরা ভাব। রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নারাণ। শব্দটা তার চেনা। চাপা অথচ বিষম শিহর লাগানো এই শব্দ সে এর আগেও অনেকবার শুনেছে। সে প্রথমে ডাইনে তাকাল। ওদিকটায় আকন্দ গাছের ঝোপ-জঙ্গল। বাঁদিকে বাঁশবাগানের শেষ প্রান্ত। শুকনো বাঁশের পাতা পড়ে নালিটা বুঝে আছে। নালির ধার ঘেঁষে আগাছার ছোট-ছোট জঙ্গল। জল না পেয়ে সেই জঙ্গলও এখন ন্যাড়া-ন্যাড়া। নারাণের দৃষ্টি আটকে গেল ওই ন্যাড়া-ন্যাড়া জঙ্গলের একটা জায়গায়। মাটি থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলছে। বুঝতে পারছে ওর সামনে বিপদ। তাই বাঁচবার জন্য সে মাথা তুলে নিজেকে বিস্তার করছে। মাটির ওপরে প্রায় আধহাত মাথা তুলে ফণা তুলছে সে। ফণাটা ছড়াচ্ছে। শরীরটা ক্রমেই মাটি ছাড়িয়ে ওপরে উঠছে। বিকেল ডোবা আলোয় ওর চকচকে শরীরটা দেখাচ্ছে বড় অদ্ভুত। মুখের ভিতর থেকে সরু জিভটা বারবার বেরিয়ে আসছে। ও বাঁচতে চায় আর এই মুহূর্তে ওকে দেখে নিজের বেঁচে থাকার একটা উপায় ভাবে নারাণ। দুজনে মুখোমুখি। মাত্র দু'হাতের তফাত। কেউ কারও দিকে এগোচ্ছে না অথচ কেউ কারও ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। দিনের আলোর জোর না থাকলেও নারাণ চিনতে পারল। কলকাতার বাবুরা যেমন-যেমন জিনিস চান এটি তেমনই। ধরে দিতে পারলে নগদ পঞ্চাশ টাকা। নারাণ এক পা পিছিয়ে এসে পা দিয়ে রাস্তা থেকে একটা কঞ্চি তুলে নিল। এবার উবু হয়ে বসে বাঁ হাতে এক খাবলা ধুলো তুলল। সাপুড়ে যেমন উবু হয়ে বসে দুটো হাঁটু ডাইনে-বাঁয়ে দোলাতে থাকে নারাণও তেমনটাই করতে লাগল। ফণাটা আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে পিছু হটতে চাইছে কিন্তু যেতে পারছে না। নারাণ একটু এগোল। এবার দূরত্ব প্রায় হাত খানেক। নামিয়ে আনা ফণাটা আবার একটু তোলবার আগেই নারাণ বাঁ হাতের ধুলোটা ঝাপটা মেরে ছুঁড়ে দিল ওর মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কঞ্চি দিয়ে ঠিক ফণার ওপর টুকুস করে একটা আঘাত। শরীর ঘষড়াতে ঘষড়াতে পিছু হটছিল ওটা। নারাণ কঞ্চিটা দিয়ে মাথায় আবার মারতে যাবার আগেই কে যেন তার হাত টেনে ধরল। নারাণ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাঁ কাঁখে কলসি নিয়ে ডান হাতে নারাণকে ধরে রেখেছে পদ্ম। ওর দু'চোখে গভীর ভয়ের মধ্যে কান্না কাঁপছে। রাস্তার ওপাশে আরও তিনজন বৌ জলের কলসি নিয়ে দাঁতে শাড়ি চেপে উত্তেজনায় থরথর। ন্যাড়া-ন্যাড়া জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ওটা তখন নেমে গেছে নালির ভিতর। আর নারাণের পিঠে মুখ রেখে তখন কেঁদে উঠেছে পদ্ম। এই

কান্না যেন ডুবন্ত বিকেলের চাইতেও গভীর এবং করুণ। যেন দুরন্ত অভিমান আর নালিশ কান্না হয়ে নেমে আসছে পদ্মর চোখ দিয়ে। নারাণ অস্ফুটে বলে, 'কাঁদিস ক্যানে, অ্যাই পদ্দ কাঁদিস ক্যানে-।'

॥ ৪ ॥

ভজনলালের গদিঘরে হরেক দেব-দেবতার ছবি। সনাতনের পিছনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে নারাণ। সব দেব-দেবীকে নারাণ চিনতেও পারেনা। গদিঘরের যেখানটায় কাঠের বাক্স, পিছনে লোহার সিন্দুক, বসবার জায়গায় পেটমোটা গোল বালিশ সেই জায়গাটাতেই বোধহয় ভজনলাল বসেন। তাঁর মাথার ওপরে বীর হনুমানের ছবি। হাতের তালুতে পাহাড় নিয়ে শূন্যে উড়ে চলেছে। চড়কের মেলায় এমন ছবি আগেও দেখেছে নারাণ। সনাতনের পিছন থেকে ফিসফিস করে নারাণ বলল, 'কখন আসবে গো ?'

সনাতন দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল। কাঠিটা দাঁত থেকে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'এখনই এসে যাবেন। তুই চুপ-চাপ থাক। নিজে থেকে আগবাড়িয়ে কিছু বলবি নে। যা বলার আমি বলব।'

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভজনলাল এলেন। সঙ্গে আরও দু'জন লোক। তবে ওই তিনজনের মধ্যে কে যে ভজনলাল সেটা না বলে দিলেও চেনা যায়। নারাণ জানে, বড়লোকদের চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে যা দেখে বোঝা যায় এই লোকটা অন্যরকম। সনাতন চাপা গলায় বলল, 'স্যার এসে গেছেন।' ভজনলাল গদিতে বসলেন। পরনে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি, কপালে লালচন্দনের ফোঁটা, পাঞ্জাবির ভিতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে ফর্সা হাতের বাজুতে সোনার তাবিজ, দেখতে চৌকো মতন। সোনাই হবে, বড় লোকরা কি আর গিল্টি করা গয়না পরে। গলায় সোনার চেন। হাতে একটা পান পরাগের কৌটো ছিল, তা থেকে দু'চামচে পানপরাগ মুখে ফেলে দিয়ে উনি বললেন, 'বোসুন, সবাই বোসুন।'

ভজনলাল গদিতে এসে বসতেই এক-এক করে নানা রকমের লোক আসতে লাগল। তাদের সঙ্গে ব্যবসা-পত্তরের কথাবার্তা, কুশল আদান-প্রদান, কারও কারও সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে দশ-বিশ মিনিট কথাবার্তা—এইসব করতে করতেই দুপুর হয়ে গেল। দুপুর বেলা নিজের বাড়িতে খেতে যান ভজনলাল। গদিঘরের পিছনেই নিজের দোতলা বাড়ি। নারাণের মনে হল তারা যে বসে আছে সেটা যেন ভজনলাল দেখতেই পাননি কিংবা পেলেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। খেতে যাবার আগে ঘর যখন ফাঁকা হয়ে গেল তখন ভজনলাল সনাতনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বোলো সনাতনবাবু! খবর কী ?'

সনাতন বসা অবস্থা থেকেই একটু এগিয়ে এল ঘষড়ে ঘষড়ে। তারপর বলল, 'এই ছেলেডার নাম নারাণ। আমার ছোটভাইয়ের মতো। ওরে আপনার কাছে নে এলাম। খেতের কাজ তো ভোগে গেছে, তাই বেচারার বড় কষ্ট, যদি ওর তরে একটা কিছু ব্যবস্থা ভাবেন।'

ভজনলাল চোখ তুলে নারাণের দিকে তাকালেন। ফর্সা গোলগাল মুখ ভজনলালের। গালের মাংস বেশ থলথলে, তুলনায় চোখ দুটো ছোট। সেই ছোট-ছোট এক জোড়া চোখ দিয়ে তিনি নারাণকে দেখে চলেছেন। নারাণের অস্বস্তি হচ্ছিল। সেদিন বিকেল

BanglaBook.org

ডোবা আবছা আলোয় বাঁশবাগানের কাছে আগাছার জঙ্গল থেকে ফণা তুলে যে তার দিকে তাকিয়েছিল তাকে দেখে শরীরে শিরশিরে উত্তেজনা হলেও এমন অস্বস্তি হয়নি। নারাণ চোখ নামিয়ে নিতেই ভজনলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরো নাম কী ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'নারায়ণচন্দ্র দাস।'

ভজনলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সাপ ধরার কাজ করতে চাও ?'

নারাণ বলল, 'এখনও ধরতে পারিনি। তবে ওই কলকাতা থেকে আসা বাবুরা কয়েছেন বিষওলা জ্যান্ত সাপ ধরে দিতে পারলে নগদ পঞ্চাশ টাকা। তাই ভাবছিলুম দু'তিনখানা ধরার চেষ্টা করি।'

ভজনলাল বললেন, 'ওরা আসলে বোম্বাইয়ের লোক। সাপের বিষ থেকে অনেক ওষুধ হয় তো, তাই বিষওলা সাপ খুঁজছে। এদিকে তো ও সব জিনিস বিস্তর আছে।'

নারাণ বলল, 'তা স্যার আছে। তবে কিনা খালি হাতে ধরা শক্ত। দু'একখানা যন্ত্রপাতি পেলে ধরে ফেলতে পারি।'

ভজনলাল এবার হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার তো সাপের বিষের কোন কারবার নেই। ওসব নিয়ে আমি কী করব। তাছাড়া মা নাগমাতা। মানে মনসামাকে আমি খুব মানি।'

সনাতন বলল, 'ওই সাপ-টাপের কথা ছাড়। অর জন্যি একটা কামের ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয়।'

ভজনলাল বললেন, 'মুখ থেকে কথা খসালেই কি কাম হয় নাকি ! ওকে দিয়ে কোন্ কাজ হবে সেটা ভেবে দেখতে হবে তো। তা তোমার বাড়ি কি কদমখন্ডীতে ?'

নারাণ মাথা নাড়ল। সনাতন বলল, 'আপনারে বলেছিলুম না, বাপের ভিটে চৌধুরীবাবুদের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। বিঘে কয়েক ধান জমি ছেল, তাও চৌধুরীবাবুদের কাছে গেছে।'

ভজনলাল ক্ষোভের গলায় বললেন, 'এসব জিনিস তো চলতো স্বাধীনতার আগে, জমিদারি আমলে। মহাত্মাজি, নেহেরুজি, সুভাষ বসু এঁরা যে এত কষ্ট করে দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেলেন, তাতে কী লাভ হল ? এখনও মহাজন আর জোতদারদের কাছে জমি বাঁধা দিতে হবে ? না-না এ বহুত বুরা বাত্, শরম কা বাত। বিহারের গ্রামেও এসব জিনিস চলে। ছোনার বাংলা আমি তুমায় ভালবাসি, রবিঠাকুরের কথাটার মানে বদলে যাচ্ছে। দেশের জওয়ানরা ভেড়ুয়া বনে যাচ্ছে। গ্রামের ডেভালপমেন্টের জন্য, চাষীদের সুবিধার জন্য ইন্দিরাজি কত কিছু স্কিম করেছেন, মি: জ্যোতি বসুও গ্রামবাংলার উন্নতির জন্য মদত দিচ্ছেন, প্ল্যান বানাচ্ছেন তবুও তোমাদের হাল ফিরছে না কেন ?'

সনাতন আর নারাণ চুপ করে থাকে। এসব কথার কোন জবাব তাদের জানা নেই। বেঁচে থাকার জন্যে তাদের যে কষ্ট সেই কষ্টটাই তাদের কাছে একমাত্র সত্য। অন্য যা কিছু শোনা যায় সেটা কখনও সত্য হয়ে তাদের জীবনে আসেনি।

ভজনলাল বললেন, 'রুরাল ডেভালপমেন্টের জন্য সেন্ট্রাল আর স্টেট মিলে কোটি-কোটি টাকা খরচ করছে। বাংলার বহু গ্রামে মাইলের পর মাইল পাকা রাস্তা, ভাল ইরিগেশন ব্যবস্থা, বিজলি বাতি এসব হয়ে গেছে। তোমাদের কদমখণ্ডী আর তার আশপাশের কয়েকটা গ্রামে কেন হয়নি ? টাকা তাহলে কোথায় যাচ্ছে ?'

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব জানা নেই তাদের। এমন প্রশ্ন কাকে করবে ? দুগ্গাদাকে ? গোকুল মাস্টার বা কাদের মিঞাকে ?ওরা ভজনলালের মুখের দিকে তাকায়। তিনিও

BanglaBook.org

তাদের দিকেই তাকিয়ে। জরিপ করার দৃষ্টিতে উনি দেখছেন নারাণকে। দেখতে দেখতেই উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সনাতন আর নারাণও উঠে দাঁড়াল। উনি বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যাবার আগে বললেন, 'কলকাতাতেও দেখেছি এখানেও দেখতে পাচ্ছি ছেলেছোকরারা বড্ড বেশি পলিটিক্স করে। সবাই যদি নেতা হবে, মন্ত্রী হবে তবে দেশের জনগণ কারা হবে। কাম-কাজের ধান্দা কে করবে ? এই যে তোমাদের গাঁগুলা শুখা যাচ্ছে, খেতের কাম বনধ, তার মানে ফসলও বনধ। এই যে ক্ষতি হচ্ছে এটা ঠিক হতে চার-পাঁচ বছর লেগে যাবে। এখানকার বড় চাষীরা বিলকান্দা থেকে জল নিয়ে নিজেদের জমি একটু-আধটু চাষ করছে। কিন্তু তাতে কি গোটা গ্রাম বাঁচবে ? এইবার পেটে টান পড়বে আর যে যার জমি টাকা নিয়ে ওইসব বাবুদের বাঁধা দেবে। এটা কি দেশকে ভালবাসা ? এইসব করলে কি ছোনার বাংলা বাঁচবে ?'

সনাতন যেন নারাণের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'আমরা কী করতে পারি স্যার। আমরা গরিব লোক। যে যা বোঝায় তাই বুঝি।'

ভজনলাল বললেন, 'ক্রিয়েট করা বোঝ ? মানে নিজেরা তৈরি করা। এদেশে যত দুর্ভিক্ষ হয়েছে সবই মানুষরা তৈরি করেছে নিজেদের স্বার্থে। তোমাদের এই খরাও তৈরি করা। আমি ভিনদেশী হলেও বাংলাকে ভালবাসি। তোমাদের গাঁয়ের সব খবর রাখি। বিলকান্দার বিলে ঘোষাল, চৌধুরী আর কাদের মিঞারা মিলে লক গেট বসালো। গাঁয়ের খাল আর ডোবাগুলো পরিষ্কার করল না। এসব তো ক্রিয়েটেড, মানে ইচ্ছে করে করা।'

সনাতন বলল, 'তাতে তো তেনাদেরও ক্ষতি। তেনারাওতো গাঁয়ের লোক।'

ভজনলাল যেন সনাতনের অজ্ঞতায় মজা পেয়েছেন। তাই হাসতে হাসতে বললেন, 'দু' পাঁচ সালের ক্ষেতি সইবার ক্ষমতা তেনাদের আছে, কিন্তু তোমাদের নেই। হিসেব করে দেখেছো, এক-একটা বিপদে তেনাদের কাছে কত চাষীর জমি, বাস্তুভিটে বাঁধা পড়ে ? গেল সনে কত বাঁধা পড়েছে ?'

ভজনলাল ঘরের দেব-দেবীর ফটোর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। যেতে যেতে বললেন, 'সনাতন তিনটে নাগাদ নারাণকে নিয়ে এসো।'

নারাণ ঘরে ফিরে এল সন্ধেবেলা। পদ্ম তখন বারান্দায় উবু হয়ে বসে কুপি জ্বালাচ্ছে। কামের ধান্দায় সনাতনের সঙ্গে সদরহাটি গেছে এর বেশি পদ্ম আর কিছু জানে না। নারাণকে ফিরতে দেখে পদ্ম মুখ তুলে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হল ?'

নারাণ ধুলোমাখা পা নিয়ে দাওয়ায় উঠল না। বলল, 'দাঁড়া, আগে পা দুটো ধুয়ে আসি।' পা ধুয়ে এসে বারান্দায় বসে নারাণ বলল, 'ভজনলাল মানুষটা ভাল। গরিবের পেটের খিদে বোঝেন। কাজ শুরুর আগেই আমাকে একশো টাকা দিয়ে বললেন, আগে নিজের ঘর সামলাও। পেটে খিদে থাকলে কোন কাজে মন বসে না। তখন নানা ধান্দায় কেবল এদিক-ওদিক মন চলে যায়।'

পদ্ম জিজ্ঞেস করল 'কাজটা কী ? আড়তে বসতে হবে ?'

নারাণ হাসতে হাসতে বলল, 'না-না সে সব কিছু নয়। তেনাদের জন্যে নানা খবর আনতে হবে। গাঁয়ের লোকের জন্যে তেনারা হাসপাতাল করে দেবেন, ইস্কুল বানাবেন, গাঁয়ের ভোল পাল্টে দেবেন। তাই কিছু জমিটমি কিনবেন। কেউ যদি বেচে বা বেচতে চায়, তাহলে যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে। পলাশডাঙার দিকে তো দেদার জমি কিনেছেন পাথরভাঙার কল করবেন বলে।'

পদ্ম পুরো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। তার মনে হল সোয়ামীর কিছু

BanglaBook.org

রোজগারের ব্যবস্থা হলেই সে খুশি। এরপর বাচ্চা হওয়ার খরচ আছে, তার জন্যেও তো টাকা লাগবে।'

নারাণ মনে মনে ভাবল অন্য কথা। ভজনলাল বলেছেন, তোমার ভিটে আমি টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে দেব। তুমি আমার কাছ থেকে টাকা পেয়ে পেয়ে আমাকে শোধ করবে। সনাতনের ভিটেও এইভাবে ঘোষালদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন ভজনলাল। করিম আর মুন্নিদের জমিও পাইয়ে দিয়েছেন বনওয়ারীলাল। মুন্নিরা বলে, 'তেনারা হলেন গিয়ে দেবতা। দু' হাত ভরে কাম দিচ্ছেন আর ভিটের দেনাও শুধে দিচ্ছেন। এমন মানুষ ক'জন হয় গো।'

মংলুরাও দেবতা মানে তেনাদের। ঘরের টালি থেকে পেটে হাঁড়িয়া সবই দিচ্ছেন তেনারা। সদরহাটিতে গিয়ে তেনাদের আড়তে কাম করা আর বাঘমারির জঙ্গলে কাঠ কাটা এই কামে বন্ধ ইঁটভাটার কামিনদের জুড়ে দিয়েছেন ভজন স্যার আর বনওয়ারী স্যার। দুর্গাদা, এটা সম্ভব বয়েছে শুধু তাঁরই অনুরোধে। সদরহাটির দুই স্যারকে খুবই মান্য করেন দুর্গা দা আর বিপিন গড়াই। মংলুরা নতুন কাম কাজ পেয়ে দুর্গাদাদের দলে থাকলেই দুগ্গাদা খুশি।

মনে মনে খুশি থাকেন ভজনলাল আর বনওয়ারীলালও। দাবার ছক সাজিয়ে তাঁরা গল্পে মাতেন। হাফ সোডা আর হাফ জলে বিদেশী মদ ঢেলে দু'জনে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে বলেন, 'চিয়ার্স।'

ভজনলাল বলেন, 'থানা ঘেরাও কর্মসূচীতে দুর্গাবাবুদের মোট খরচ যত ব্যাটারা তার চাইতে বেশি নিয়েছে। আমি জেনে বুঝেই দিয়েছি। ওরা তো আর এমনি চাইতে পারে না, ঘুরিয়ে জনগণের নাম করে চায়।' বনওয়ারীলাল বললেন, 'কদমখন্ডীর গোকুল মাস্টার, ধলাডাঙার পরেশ মন্ডল আর পলাশডাঙার অহীন ঘোষের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়ে গেছে। লেনদেনের ব্যাপারে আমাদের শর্ত মেনে নিয়েছে।' ভজনলাল বললেন, 'দুর্গাবাবু আর সদরহাটির নেতাদের সঙ্গে আমার কথা শেষ। পার্টির টাকা আলাদা পাবে, নিজেদের হিস্যা আলাদা।'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'ঘোষালরা যোগাযোগ করেছিল। আমি বলেছি এখানেই যখন থাকতে হবে তখন এই অঞ্চলটার ডেভালপমেন্ট দরকার। ইনডাসট্রিয়াল গ্রোথ না হলে গ্রাম বাঁচবে না। বৃষ্টির ওপর ভরসা করে এখনকার দিনে এগ্রিকালচার রেভেন্যিউশন করা সম্ভব নয়।'

ভজনলাল গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'আগামী রবিবার একটা গেট টুগেদার করা যাক। ঘোষাল, চৌধুরী, বিশ্বাস মানে এখানকার যে ক'জন আছেন, যাঁরা নিজেদের আপনা ঘরে শের মনে করেন তাঁদের ইনভাইট করা হোক। সঙ্গে দুর্গাবাবু আর গোকুল মাস্টাররাও থাকুন। থানার ওসি এবং এস ডি ও সাহেব থাকবেন। শুধু একটা অকেশন খুঁজে বার করতে হবে।'

ভজনলাল গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ভজনলাল আর বনওয়ারীলাল যাঁদের নিমন্ত্রণ করতে চান তাঁদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে নিজে নিমন্ত্রণ করে এলেন। দুর্গাদা, বিপিন গড়াই, কাদের মিঞা, গোকুল মাস্টার, পরেশ মন্ডল আর অহীন ঘোষ কাউকে বাদ রাখলেন না। শুধু কদমখন্ডীর চৌধুরীমশাই মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'আমার তো বয়স হয়েছে। আসছে বছর সত্তরে পা দেব। এখন আর আমার পক্ষে অতদূরে গিয়ে...'

BanglaBook.org

ভজনলাল হাত জোড় করে বললেন, 'আপনিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। আপনি পিতৃতুল্য। আপনি না গেলে চলবে কেমন করে। আর সত্তর বছরটা এখনকার দিনে কোন বয়স নাকি! আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গলের সি. এম-কে দেখুন? কে বলবে ওনার বয়স সাতের কোঠায়। এখনও দিনে ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করেন।' চৌধুরী মশাই হাসতে হাসতে বললেম, 'ওনারা পারেন। আমি তো অম্বলের রোগী। কোথাও বিশেষ যাই-টাই না।' ভজনলাল চৌধুরীমশাইয়ের হাত দুটি ধরে বললেন, 'আমাদের পথ দেখাবার জন্যও তো একজন কাউকে দরকার। আমার ছেলের জন্মদিনটা বড় কথা নয়, বড় কথা আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, আমার ছেলে, আমার পরিবার সবাই আপনার আর্শীবাদ চাইছে।'

অতএব, চৌধুরীমশাইও গেলেন। ভজনলালের হল ঘরে চার-পাঁচটা গ্রামের সব কটা মাথা হাজির। বনওয়ারীলালই শুধু জানেন, আজকের দিনটা ভজনের ছেলে সুন্দরলালের জন্মদিন নয়। জন্মদিন হচ্ছে আগামী পরশু। কিন্তু বুধবারের চাইতে রবিবারে লোকজন পাওয়ার সুবিধে। বিশেষ করে এস ডি ও সাহেব, দারোগাবাবু আর দুর্গাবাবুরা রবিবারটাই চাইছিলেন। ভজনলাল জনে জনে হাত জোড় করে বলে এসেছিলেন, কেউ যেন কোন উপহার না আনেন। কেননা, তাদের বংশের রীতি-রেওয়াজ অনুপাতে সন্তানের জন্মদিনে কিছু নিলে অমঙ্গল হয়। তবুও অনেকে ফুল-টুল এনেছেন। কেউ কেউ মিষ্টি।

হলঘরে মোটা গালিচা পাতা। সবার হাতে ঠান্ডা সরবতের গ্লাশ। শুধু চৌধুরীমশাই সরবত নিলেন না। ভজনলাল দৌড়ে এলেন। চৌধুরীবাবু বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না। আমার শরীরের রীতি-রেওয়াজ হল একবারের বেশি দু'বার সরবত খেতে পারি না, শরীর নেয় না। আমি তো খেয়েই বেরিয়েছি।'

কথা শেষ করে রুপোর কৌটো খুলে ছ্যাঁচা পান মুখে দিলেন। জর্দার সুগন্ধটা ভজনলালের নাকে গেল। সরবত আর লাড্ডু খাওয়ার পালা যখন চলছে তখন হঠাৎ দুর্গাদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। যদি আপনারা অনুমতি করেন তাহলে বলতে পারি।'

এমন কথায় কে আর আপত্তি করে। শুধু গোকুল মাস্টার একবার পলাশডাঙার অহীন ঘোষের দিকে তাকালেন। দুর্গাবাবু বলতে লাগলেন, 'যে কোন একটা উপলক্ষে আজ পাঁচখানা গ্রামের যাঁরা মাথা তাঁরা সব একত্র হয়েছেন। এমন জিনিস, এমন সমাবেশ বড় একটা হয় না। তদুপরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এস.ডি.ও সাহেব, দারোগা সাহেব। অতএব...'

দুর্গাবাবু থেমে গেলেন। চৌধুরী মশাই বললেন, শুধু আমাদের নাম করছো কেন। তোমরাও তো রয়েছো। তুমি, বিপিন, ওদিকে গোকুল, অহীন। তোমরা সব নেতা। তোমরা চালাও বলেই তো চলি।'

চৌধুরীমশাই যেন মজার কথা বলেছেন এমন ভাব করে দুর্গাবাবু আর গোকুলমাস্টাররা হেসে উঠলেন। দুর্গাবাবু বললেন, 'আমি বলছিলাম, আপনারা সবাই রয়েছেন। আমাদের গাঁগুলোর যা অবস্থা তা নিয়ে যদি একটু নিজেরা কথাবার্তা বলি।'

ঘোষালবাবু বললেন, 'এয়েচি জন্মদিনের নেমতন্নে, এখানেও আবার...'

ভজনলাল হাতজোড় করে বলে উঠলেন, 'আপনাদের মতো এই গ্রামও আমার গ্রাম। ছেলের জন্মদিনটা বড় কথা নয়। এই উপলক্ষে এতগুলো মহান মানুষের পায়ের ধুলো আমার বাড়িতে পড়েছে এতেই আমি ধন্য। আপনারা যদি গ্রামের সমস্যা নিয়ে এখানে

BanglaBook.org

আলোচনা করতে চান, গাঁয়ের জন্য কোন কল্যাণকর কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে আমরাও আপনাদের সাথ দেব। গাঁয়ের জন্য যা হুকুম করবেন তাই করতে আমি এবং বনওয়ারীলাল রাজি। আপনারা আলোচনা চালাতে পারেন।'

অতএব, আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ দুষলেন সরকারকে, কেউ কেউ দুষলেন অদৃষ্টকে। বনওয়ারীলাল বললেন, 'দেখুন আমি রাজস্থানের লোক। মরুভূমির দেশ। কিন্তু ওখানেও ফসল ফলছে। পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব হয়ে গেছে। পঞ্জাবের মাটি বাংলার চাইতে অনেক কঠিন। এমনকি মরুভূমিতেও এখন আবাদ চলছে। তবে কেন এখানে, এই বাংলায় শুধু বৃষ্টির ওপর ভরসা করে আমাদের জীবন বাঁচাতে হবে?'

ভজনলাল বললেন, 'দেশের উন্নতির জন্য ইনডাসট্রিয়াল গ্রোথ চাই। সঙ্গে সঙ্গে চাই কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিল্প আর কৃষির ভূমিকা সবচেয়ে বড়। এ ব্যাপারে ছোট-ছোট স্বার্থ ত্যাগ করে বড় স্বার্থের জন্য আমাদের এককাট্টা হতে হবে। আমিও এই গ্রামের লোক। গ্রামের উন্নতির জন্য আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি। বনওয়ারীলালও আছে।' বনওয়ারীলাল বললেন, 'মরুভূমিতে যদি চাষ হতে পারে, শুখা রাজস্থান যদি সবুজ হতে পারে, তবু সবুজ বাংলাকে আমরা শুখা হতে দেব কেন? কেন বৃষ্টি না হলে চার-পাঁচটা গ্রাম শুকিয়ে মরবে?'

সকলেই ভজনলাল আর বনওয়ারীলালের কথার তারিফ করলেন। গ্রাম বাঁচাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল গ্রামরক্ষা কমিটি। রাতের খাওয়া হয়ে যাবার পর ওঁদের গাড়ি সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দিল। শুধু চৌধুরীমশাই বললেন, 'এসেছি যখন, তখন শুধু একটা মিষ্টি খাব। এর বেশি কিছু খেতে পারব না।'

এস ডি ও সাহেব আর দারোগাবাবু গেলেন সবার পর। তখন আকাশে রাতের চাঁদ উঠে গেছে। বিলকান্দার দিক থেকে শনশন করে হাওয়া বইছে। সদরহাটির বাজার থেকে ভেসে আসছে নামগানের সুর।

বনওয়ারীলাল আর ভজনলালরা যে যার বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। কদমখন্ডীর শুকনো গ্রামে চাঁদের ছায়া পড়ল। নারাণ দাওয়ায় বসে দেখল জোছনায় তার ছোট্ট উঠোন ভেসে যাচ্ছে। খেজুরপাতার চাটাইতে শুয়ে আছে পদ্ম। তার খোলা পিঠে খেলা করছে চাঁদের আলো। শরীরটা বেশ ভরা। বুক দুটো টান-টান। পেটে বাচ্চা এলে শরীর কি এইরকম হয়ে যায় নাকি? নারাণ কানের কাছে মুখ এনে ডাকল, 'পদ্দ, অ্যাই পদ্দ, ঘুমোলি?'

ঘুমের আবেশে পদ্ম জবাব দেয়, 'হু।'

নারাণ ঝুঁকে পড়ে। পদ্মর বুকের আঁচল সরিয়ে দিয়ে মুখ রাখে। পদ্মর একটা হাত উঠে আসে তার কাঁধের উপর। নারাণ পদ্মর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, 'পদ্দ, অ্যাই পদ্দ।'

পদ্ম জবাব দেয় না। তার শরীরে এখন বান আসছে। সে হাত দিয়ে নারাণকে আরও কাছে টানে।

তার মনে পড়ে যেতে থাকে চার বছর আগের কথা। সেদিনও ছিল এমনই পুর্ণিমের রাত।

গোকুলপুরে তার বে হল। মেয়ের বাপ মরেছে ওলাওঠায়। বিধবা মায়ের একটিই মেয়ে। মামাদের সংসারে থাকে। দুই মামার এক মামা কাজ করে মিষ্টির দোকানে, অন্যজন চায়ের দোকান দিয়েছে রাস্তার পাশে। জোত-জমি যা ছিল সে সব দেনার দায়ে

BanglaBook.org

মহাজনের উদরে গেছে অনেক বছর আগে। এমন মেয়ের কাছে নারাণ তো সুপাত্র। বিয়ে করে বৌ নিয়ে নারাণ কিছুটা পথ এল বাসে আর বাকিটা গরুর গাড়িতে। মধ্য আষাঢ়ের বর্ষা তখন ঝমঝমিয়ে রেখেছে গোটা গাঁ গুলোকে। পলাশডাঙার সীমানা পেরুতেই কড়-কড় শব্দে বাজ পড়ল। বিকট শব্দে নতুন বউ তো মূর্ছা যায়। নারাণ অভয় দেবার ভঙ্গি করে বলল, 'ভয় পাসনে। আষাঢ় মাসে এমনই হয়।'

পদ্ম কাজল পরা চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। সে চোখে তখন শুধুই ভয়। মেয়েটার চোখ থেকে যেন ভয় সরে না। বাড়িতে এসে রাতের বেলা নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'তোর এত ভয় কিসের ?' পদ্ম উত্তর দেয় না, শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে। ফুলশয্যের দিন বৌকে সোহাগ করতে গিয়ে টের পায় মেয়েটা যেন কেমন। সোহাগ করলে ভিজে ন্যাতার পুঁটলির মতো জড়সড় হয়ে সোহাগ নেয় কিন্তু সোহাগ করতে জানে না। নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'তুই এমন ধারা কেন রে ? খালি ভয়ে-ভয়ে থাকিস ? তোর কিসের এত ভয় ?'

এবার পদ্ম জবাব দেয়। সে বলে, 'শুনেছি সোয়ামীরা খেতে-পরতে দেয়। রেতের বেলায় বিছানায় সোহাগ করে আর রেগে গেলে চ্যালা কাঠ দিয়ে পিটোয়, আগুনের ছ্যাঁকা দেয়। তুমিও তাই করবে না তো ?'

নারাণ হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে বলে, 'কে তোরে এসব কথা শিখিয়েছে। তোরে পেটাই করবো ক্যানে ? তুই না আমার বৌ।'

পদ্ম বলে, 'পুরুষরা তো বৌকেই পেটাই করে। আমার ছোটমামা তাই করত। আমি অনেকরে জানি তারা তাড়ি খেয়ে ভর দুপুরে এসে বৌকে মারতো। তুমি কি তাড়ি খাও ?'

নারাণ বড় সমস্যায় পড়ে গেল। নতুন বৌয়ের কাছে মিথ্যে বলা কি ঠিক হবে ? সারাজীবনের সম্পর্ক ! তারে মিথ্যে বলে লাভ কি ! তাই সে বলে, 'মওকা পেলে একটু-আধটু খাই, কিন্তু খেয়ে কখনও বৌ পেটাইনি।'

পদ্মর দু' চোখে অভিমান আর অভিযোগ ফুটে ওঠে। সে বলে, 'কেমন করে পেটাবে। অ্যাদ্দিন কি আমি ছিলুম। আমি তো সবে এলুম। এবার তোমার পেটাবার ইচ্ছে হবে।'

নারাণ পদ্মকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'সব মানুষই কি বৌ পেটায় নাকি রে ! আমি কি তেমন মানুষ ? তুই ছাড়া আমার কে আছে বল !'

ছলছল চোখে পদ্ম বলে, 'আমারই বা কে আছে। এক বুড়ি মা, কদিনই বা বাঁচবে।'

নারাণ পদ্মর ভেজা চোখের দিকে তাকায়। তার মনে হয় দুনিয়ার সব দুঃখ যেন পদ্মর চোখের তারায় ভিড় করে আসছে। সে নিজের মুখটা পদ্মর কাছে নিয়ে যায়। আবেগ জড়ানো গলায় অস্ফুটে বলে, 'পদ্ম, তোর ভয় নাই, আমি আছি। আমি থাকতে তোর কোন কষ্ট হবে না। তুই আমার সব। তোরে ছাড়া আমার ভুবন অন্ধকার।'

পদ্ম চোখ বুজে ফেলে। সে টের পায় তার সোয়ামীর মুখখান তার মুখের বড় নিকটে এসে গেছে। তার ঠোঁট দুইখানিতে আরেক জোড়া ঠোঁটের কামড় পড়ে। শরীরে তখন কী যে হয় ! যেন গহীন গাঙে তুফান ওঠে। সেই তুফানে তার শরীরখান পাতার মতন ভাসতে থাকে। কেমন একখান অবুঝ যন্ত্রণা, অথচ সেই যন্ত্রণার মইধ্যে যেন জাদু আছে। এই যে শরীরখান জ্বলতে থাকে, এই জ্বলুনির মইধ্যে বুঝি নেশা। নেশা না থাইকলে কেন মনে হবে, থাক, থাক, এই জ্বলুনি থাক। তেমন-তেমন দহন আছে

যাতে অঙ্গ পোড়াতে বড় ভাল লাগে। সে চোখ বুজে শুয়ে থাকে আর তার সোয়ামী তার শরীরখানারে ঘিরে সোহাগ করতে করতে ফ্যাস ফ্যাস গলায় ডাকে 'পদ্দ, আমার পদ্দ।'

পদ্ম চোখ মেলে তার সোয়ামীকে দেখে। উঠোন ভরে আছে জোছনার আলোতে। সেই আলোয় ধোওয়া গ্রামখানের চেহারা বড় সুন্দর। পদ্ম আস্তে আস্তে আবার চোখ বুজে ফেলে। এ সময় চোখ মেলে চাইতে পারে না সে। তার ভারী লজ্জা করে।

নারাণ চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে বলে, 'ভজনলাল স্যার আমারে কী বলেছে জানিস ?'

পদ্ম বলে, 'না বললে ক্যামনে জানব ?'

নারাণ এবার উঠে বসে। জোছনার আলোতে পদ্মর মুখ দিব্যি দেখা যাচ্ছে। পদ্ম তার বুকে আঁচল জড়িয়ে নিতে নিতে নারাণের দিকে তাকায়। নারাণ বলে, 'চৌধুরীবাবুর কাছ থেকে ভিটে ছাড়িয়ে নিতে বলেছে। সুদে-আসলে যা-ই হয়ে থাকুক, টাকা উনি দিয়ে দেবেন। আমি কাজকম্ম করে করে ধার শুধবো।'

খবরটা এমনই যে, পদ্মও উঠে বসে। তার দুই চোখ খুশিতে চকচকিয়ে ওঠে। সে বলে, 'সত্যি ?'

নারাণ এবার বেশ মৌজ করে একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলে, 'সত্যি নয়তো কি মিথ্যে ! দেখ না, ইঁটভাটায় পেরেক কল আর কাঠ চেরাইয়ের কল বসে গেলে গেরামের কত লোকের ভাতের কষ্ট ঘুচে যাবে। অন্যের জমিতে জনমজুরি করার চাইতে কলে কাম করা অনেক ভাল। অনেক সুবিধে।'

পদ্মর দু' চোখে এখন স্বপ্ন ভাসতে থাকে। যেমন করে বটের ঝুরি নেমে এসে মাটিতে মাথা গোঁজে তেমন করেই যেন তার স্বপ্নগুলো ডালপালা মেলে নেমে আসে এই জোছনা মাখা মাটির উঠোনে। সে দেখতে পায় কোমরে ঘুনসি পরে টলোমলো পায়ে একটা ছেলে সারা গায়ে বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের মাটি মেখে দস্যিপনা করছে। দাওয়া থেকে তাই দেখছে পদ্ম। ছেলেটার বাপ গেছে ধলাডাঙার পেরেক কলে। একটু পরেই হপ্তার টাকা নিয়ে সাইকেল চেপে বাপ এসে দাঁড়াবে এই উঠোনে। ছেলেরে কোলে তুলে নিয়ে বসিয়ে দেবে সাইকেলের সিটে। তারপর তাকে নিয়ে উঠোনময় ঘোরাঘুরি।

পদ্ম স্বপ্ন দেখা মানুষের মতো থরথর গলায় বলে, 'তুমি সব্বার আগে ভিটেটা ছাড়িয়ে নাও। ওটা যেন গলার কাঁটা হয়ে দিন-রাত বিঁধছে। সেদিন ওদের সরকার মশাই কলে জল নেওয়ার সময় আমায় বললেন, তোর সোয়ামীরে কাম-কাজের ব্যবস্থা করতে বল। এরপর তো আর ভিটে ছাড়াতে পারবে না। শুনে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।'

নারাণ বিড়িতে টান দিয়ে বলে, 'একটা হপ্তা সবুর কর। ভিটের কাগজ তোর আঁচলে এসে যাবে। স্যারের দেওয়া কাজগুলো আগে করে দি।'

সাত সকালেই সনাতনের ডাকে ঘুম ভাঙল নারাণের। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠোনে নেমে এসে বলল, 'কী ব্যাপার ?'

সনাতন মাথাটা নারাণের মুখের কাছে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'চটপট মুখ ধুয়ে নে। কাজের খবর আছে।'

নারাণ মুখ ধুয়েই সনাতনের সঙ্গে বেরিয়ে এল। আসতে আসতে বলল, 'গফুরের সঙ্গে কালকে দেখা হল। গফুরকে বললুম, বড় মসজিদের কাছে যে তোদের হাজা-মজা ডোবা

BanglaBook.org

আর কাঠা দশেক জমি আছে তা ওই জমিতে তো আর ফসল ফলবে না। উল্টে কবে দেখবি ইঁদুরা বেদখল করে নিয়েছে। তার চাইতে আকালের বাজারে মোটা দামে বেচে দে। টাকা দিয়ে না হয় ধান জমি কিনে রাখ, দোকানটার পিছনে লাগা, নয়তো পোস্ট অফিসে রাখ, সুদে সুদে বেড়েই চলবে।'

নারাণ বলল, 'তা গফুর কী বললে ?'

সনাতন বলল, 'এ কি হট করে রাজি হওয়ার ব্যাপার। এটা বোঝাতে হবে। বোকাটা তো বুঝতে পারছে না, শহর-গাঁয়ে কত জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। জমি ফেলে রাখলেই অন্যদের নজর পড়ে।'

সনাতনের কথাটা গোড়ার দিকে গফুরদের খুব একটা ভাবায়নি। ভাবনা এবং ভয়টা এল কাদের চাচার সঙ্গে কথা বলার পর। কাদের চাচা বলল, 'সনাতনের খবরটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ভিন গাঁয়ের লোকদের মুখে এমন ধারা খবরই শুনি। ও দিকে আবার বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশিরা আসতে লেগেছে। তারা তো এসেই শুকনো ডাঙা পেলে তাতে ত্রিপল বা হোগলার ছাউনি ফেলে বসে যাচ্ছে। তাদের ওঠাতে হলে থানা-পুলিশ না হয় কোর্ট-কাছারি করতে হয়। এত সব হ্যাপা কি সাধারণ গরিব-গুর্বোরা পারে !'

গফুর প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে, 'তাই বলে আমার বাপ-চাচার জমি দখল করে নেবে ? দেশে আইন নেই ?'

সনাতন বলল, 'আইন থাকবে না কেন, আছে। কিন্তু আইনের সুবিধে আদায় করা আমাদের কম্মো নয়।'

গফুর একটু গুম হয়ে বসে থেকে বলে, 'তাহলে দুগ্গাদাদার কাছে যাব। তেনারা থাকতে এমনটি হবে না।'

খালেদ চাচা খুক খুক করে হেসে উঠে বলল, 'আইনের বিচার চাইতে যাবি দুগ্গাবাবুদের কাছে। ইঁটভাটাটা নিয়ে কি নোংরামিটাই না করল। কামিনগুলোকে পথে বসাল।'

গফুর বলল, 'তবু তেনারা ভাল। তেনারা আছেন বলে গাঁয়ে থাকতে পারছি।'

খালেদ চাচা দু'হাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'ভুল, অতি বড় ভুল'। তেনাদের পীরিত ভোটের জন্যি। আজ যদি তোদের চাইতে বেশি ভোটের সন্ধান অন্যদের কাছে পায় তাহলে দেখবি তেনাদের পীরিত সেই দিকে ঢলে পড়েছে।'

গফুর বলল, 'সে তো সবাই। ভোট এলে সবাই বাড়ি বয়ে এসে খোঁজ করে। অন্য সময় ফিরেও তাকায় না। এত যে দুঃখকষ্ট যায়, এই যে গাঁখান শুকাতে লেগেছে তা কোন মন্ত্রীরে আসতে দেখলে ? ওই এম.এল.এ নাকি বলে, সে খ্যাটাও বড় জোর সদরহাটি, তারপর আর ইদিকপানে আসতে তার পা সরে না।'

গফুর গজগজ করতে করতে উঠে যায়। নারাণকে ডেকে নিয়ে বলে, এ ক্যামন গেরো বলদিকিন। শালা নিজের বাপ-চাচার জমি অন্যরা দখল করে নেবে ? তাহলে তো আমার দোকানটাও একদিন কেড়ে নিতে পারে।'

নারাণের খুব খারাপ লাগে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না সনাতনের খবরটা কতখানি সত্যি। তাই সে সনাতনকেই জিজ্ঞেস করে, 'এমন ঘটনা কি এই গাঁয়ে ঘটেছে ?'

সনাতন বলে, 'এই গাঁয়ে না ঘটলেও অন্য গাঁয়ে ঘটছে। এখানে যদি ঘটে তাই আগ বাড়িয়ে সাবধান করছিলাম।'

সেই দিনই গফুর আর নারাণ গেল বিপিন গড়াইয়ের বাড়িতে। তিনি পুকুরের ধারে

BanglaBook.org

বসে দাঁত মাজছিলেন। সব শুনে বললেন, 'পতিত জমি দখলের ব্যাপারটা হয়, ওসব ঘটনা ঘটে। তবে এ গাঁয়ে তেমন অবস্থা নেই। এখানে ঘটবে না। ওই বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে যারা চলে আসে তারা হল গিয়ে বাস্তুহারা, রেফিউজি। ওরাই ওসব করে। তা সরকার তো বন্দুক চালিয়ে তাদের উৎখাত করতে পারে না। তখন একটা আপোষ রফা খোঁজে। ওসব জিনিস এ গাঁয়ে হবে না।'

বিপিন গড়াইয়ের কথায় গফুর আশ্বস্ত হয়। নারাণের সঙ্গে ফিরে আসতে আসতে বলে, সনাতনদা একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। যেন দেশটা রাতারাতি মগের মুলুক হয়ে গেছে। আমাদের জমি দখলের আগে তো চৌধুরীবাবুদের জমি দখল হবে। এ গাঁয়ের অর্ধেক জমিই তো তেনাদের। ওই রাধাগোবিন্দের নামেই তো দেদার ধানজমি, পুকুর, বাগান।'

সনাতন যে মিথ্যে বলেনি সেটা প্রমাণ করতে গফুরকে নিয়ে সনাতন এল সদরহাটিতে। ভজনলালের গদিতে তখন গুরুচরণ মজুমদার বসে বসে হিসেবের খাতা দেখছিলেন। অন্যদিকে একটা ছেলে টাইপ মেশিনে খটখট করে মেশিন চালিয়ে কাজ করছে। সনাতন একথা-সেকথার পর বলল, 'স্যার, এর নাম গফুর। ও বিশ্বাসই করতে চায় না যে গাঁয়ে গঞ্জেও পতিত জমি দখল হয়ে যাচ্ছে।'

গুরুচরণ গফুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে বড্ড সরল। তবে সনাতন মিথ্যে বলেনি। বীরপাড়া তো সদরহাটি থেকে মোটে কুড়ি কিলোমিটার। তা সেই বীরপাড়াতেই বিশ বিঘে জমি বেদখল হয়ে গেল। সব রেফিউজিরা এসে বসে গেছে। ওরা তো পঙ্গপালের ঝাঁক। কলকাতা আর তার আশে-পাশে যত কলোনি তৈরি হয়েছে তার অনেকগুলোই তো জবরদখল।'

গফুর বলল, 'তবে আমাদের তো মোটে দশকাঠা চার ছটাক জমি। সঙ্গে একটা হাজা-মজা ডোবা।'

গুরুচরণ বললেন, 'ডোবাও এখন জমি। তা দুইয়ে যোগ করলে কত হবে? বিশকাঠা কী বল?'

গফুর কথা বলল না। গুরুচরণ পান খেলেন। পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'জমিটা কোথায়?'

গফুর উত্তর দিল, 'কদমখণ্ডীতে।'

গুরুচরণ বললেন, 'সে তো জানি। দাগ নম্বর জানো?'

অতসব কথা গফুরের মনে পড়ল না। সে শুধু বলল, 'বড় মসজিদের কাছে।'

গুরুচরণ বললেন, 'হু।'

ওরা যখন উঠতে যাচ্ছে তখন ভজনলাল এলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল। ভজনলাল সনাতনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী খবর? সব ভাল তো?'

তারপর গফুরের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'এ কে?'

সনাতন তখন গফুরের সমস্যাটা জানাল। ভজনলাল সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। কৌটো খুলে মুখে পান পরাগ ঢাললেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এ সব ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। এই গাঁয়ে মানুষরা চাষীদের বিপদে টাকা ধার দেয় জমি, ভিটে এসব নিয়ে। মাসে মাসে সুদ বেড়ে যায় আর জমি, ভিটে সব চলে যায় মহাজনের কাছে। গাঁয়ের বড়লোকরা গাঁয়েরই গরিবদের ঠকাচ্ছে। এ সব করলে গাঁয়ের উন্নতি হবে?'

BanglaBook.org

ভজনলাল একটু থেমে গফুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কদমখণ্ডী, ধলাডাঙা, পলাশডাঙা, বিলকান্দা আর সদরহাটি ধরলে যত লোক হয় তার মধ্যে মুসলমান কত আছে জানো ?'

গফুর বলল, 'আজ্ঞে না।'

ভজললাল বললেন, 'ফরটি সেভেনের আগে ছিল সিকটি পার্সেন্ট, ফিফটির পর হল ফরটি এইট পার্সেন্ট, সিকসটি ফোর আর সেভেনটি টুর পর কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে থারটি ফাইভ পার্সেন্ট আর ভোটার হল থারটি টু পার্সেন্ট। এখন তুমি গফুর ভাই ভেবে বলো তো, দিনের পর দিন মুসলমান কমছে কেন ?'

গফুর এ কথার কী জবাব দেবে। এত হিসেব-নিকেশ তার মাথায় ঢোকে না। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ভজনলাল বলেন, 'উত্তরটা তোমাদের জানা নেই। ইন্ডিয়ার সংবিধানে, সংবিধান বোঝ ?'

গফুর বোকার মতো সনাতনের দিকে তাকায়।

সনাতন বলে, 'সংবিধান বুঝিস না। মানে ওই সংবিধান। সে একটা দারুণ ব্যাপার। স্যার সব বুঝিয়ে দেবেন।'

কথা শেষ করে সনাতন স্যারের দিকে তাকায়। সে নিজে লোকের মুখে, বিশেষ করে সদরহাটির লোকের মুখে 'সংবিধান' শব্দটা শুনেছে। প্রথম দিকে ভাবতো কোন জবর সং টং হবে। পরে বুঝেছে, না, সে সব নয়। তবে জিনিসটা যে কী তা সে জানে না।

স্যার বোঝাবার পরও সে যে খুব একটা বুঝল তেমন নয়। শুধু জানা রইল উনি ঠাকুর-দেবতা বা কোন ধর্মস্থান নন, ও একখানা বই। ওতে দেশের সব বিধি-বিধান থাকে। দেশের মানুষের কার কেমন অধিকার সে সব বলা থাকে। ওটিকে অবহেলা করা চলে না। সব্বাইরে মান্যি করতে হয় ওইখানারে। তা বইখানা যে কেমন সে কখনও দেখেনি। তার বাপও দেখেনি। এ যেন বামুনদের বেদের মতো। পড়তে পাবে না, ছুঁতে পাবে না, দেখতেও দেবে না, শুধু বইখানা দেখিয়ে বামুনরা ছোট জাতের মানুষগুলানরে তড়পাবে।

কিন্তু গফুরের মাথায় সংবিধান নিয়ে কোন চিন্তা আপাতত খেলা করছে না। গুরুচরণবাবু আর ভজনলাল স্যার খুবই সজ্জন লোক। বড় খোলামেলা কথা বলেন। তার কথার মধ্যেই বুঝি একটা তীর লুকানো ছিল, সেই তীরটা আচমকা বিঁধে গেছে তার বুকের মধ্যে। বাড়ি ফিরেও সে আনমনা হয়ে রইল। সেই তীরটা তাকে খোঁচাচ্ছে। রাত্রে খেতে বসে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ও দেশের হিঁদুদের মতো এ দেশ থেকেও মোচলমানরা ভিটে ছেড়ে ও দেশে গেছে ?'

রুটির টুকরো মুখে তুলে নিয়ে গফুরের বাবা রহমত উত্তর দেন, 'ম্যালা গেছে। বিহার আর পঞ্জাব থেকে নাকি বেশি গেছে। কলকাতা থেকেও গেছে।'

গফুর জানতে চায়, 'আমার এই গেরাম থেকে ?'

রহমত রুটি চিবুতে চিবুতে যেন কিছু একটা মর্ম করতে চাইছেন তেমন ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, তা পেরায় বিশ-পঁচিশ ঘর গেছে। না গেলেও চলতো, তবুও গেল।'

গফুর আবার জিজ্ঞেস করে, 'আমরা যাইনি কেন ?'

এবার রহমত হেসে ফেলেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'কোন দুঃখে যাব। এটা তো আমার বাপ-চোদ্দ পুরুষের ভিটে। আমরা তো এ দেশেরই লোক। বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে ছেড়ে কেউ যায় ?'

BanglaBook.org

গফুরের আজ অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। যা সে দেখেনি, যা সে বোঝে না তেমন সব জিনিস সে শুনতে চায়, বুঝতে চায়। সে বলে, 'ও দেশ থেকেও তো হিন্দুরা বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে ছেড়ে চলে এসেছিল। ওরা কেন এল ?'

রহমত ছেলের মুখের দিকে তাকান। হ্যারিকেনের আলোয় মুখটা খুব স্পষ্ট নয়। তবুও ছেলের দুই চোখে যে জিজ্ঞাসা জেগে আছে সেটা রহমত বুঝতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ এসব কথা জানতে চাইছে কেন ? এসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে গফুরের কী লাভ। যে দুঃসময় গেছে তাকে ভুলে থাকলেই তো শান্তি।

রহমত ঘরের বাইরে এলেন। কলাবাগানের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। বাঁশ বাগানের ভিতর থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। রহমত উঠোনের ওপর পাতা কাঠের চৌকিতে বসে বিড়ি ধরালেন। তাঁর মনে পড়ল, যারা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে ও দেশে পালিয়ে গেছে তারা ওখানে কেমন আছে তা তিনি জানেন না। জানবার বিশেষ উপায়ও নেই। জলের দরে জমিগুলো তখন কিনে নিয়েছেন চৌধুরী, ঘোষাল আর বিশ্বাসবাবুরা। অনেকেই পুরো টাকা না নিয়েই কাগজে সই করে কাঁদতে-কাঁদতে ভিটে ছেড়ে গেছে চিরজন্মের মতো। রহমত আর তার বাবাও তো যাবার জন্য একরাত্রে মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যাতেই সদরহাটির হাট পুড়িয়ে দেওয়া হল। বেছে-বেছে পোড়ানো হল পলাশডাঙার মুসলমানদের বাড়িগুলো। দু'ক্রোশ দূরে যেদিন মুসলমানদের বাড়ি জ্বলতে লাগল সেদিনই বাবা বললেন, 'রহমত, বিপদ এবার দেউড়ি অব্দি এসে গেছে। এখানে আসতে আর দেরি করবে না। খুনোখুনি করে থাকা যায় না। তার চেয়ে...'

বাবার গলা কান্নায় বুজে এসেছিল। ভিটের দক্ষিণে কলবাগান আর উত্তরে নিজেদের ভিটের সীমানার ধারেই জাফরি করা বাঁশের বেড়া। ওই জমিতে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার কবর। রোজ সন্ধেয় ওখানে আলো দেখাতেন আব্বাজান। তিনি ছলছল চোখে ওই দিকে তাকালেন। আস্তে-আস্তে উঠে গিয়ে কবরের পাশে বসলেন। রহমত ঝাপসা চোখে বিশেষ কিছু দেখতে পেলেন না, শুধু শুনতে পেলেন তাঁর বাবা কবরের ওপর মাথা নুইয়ে কাঁদছেন। আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকা গ্রামখানাতে সেদিন চিৎকার করে কাঁদবারও সাহস ছিল না। তবুও রহমতের মনে হয়েছিল, তাঁর বাবার ওই শব্দহীন কান্নাতেও যেন তার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠছে।

তবুও কদমখণ্ডী ছাড়তে হয়নি তাদের। যেতে রাজি হলে তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়ে ভিটে-মাটি কিনে নেবার লোক ছিল। তারা খবরও পাঠিয়েছিল, 'থাকতে পারবে না। খুন হয়ে যাবে। তার চাইতে বেচেবুচে দিয়ে এই বেলা কেটে পড়ো। আমরাই না হয় বর্ডার পার করে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছি।'

আছেন-আছেন, সেই সুহৃদরা, তেনাদের ছেলে-নাতিপুতি সকলেই এখনও এদিককার গাঁয়ে-গাঁয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। অভয় দিয়েছিলেন দুর্গাবাবুর বাবা, গোকুল মাস্টারের দাদা, আর চৌধুরীবাবু। তেনারা বলেছিলেন, 'আলি, তোমরা থাকো। সবাই চলে গেলে গাঁ যে শূন্য হয়ে যাবে। আমরা থাকতে কিচ্ছুটি হবে না।'

কিন্তু কিছু হওয়ার চাইতে কিছু হবে এই আতঙ্কটাও কম কষ্টের নয়। সেই কষ্ট বুকে নিয়ে দিন আর রাত কেটে গেছে রহমতের। সেই সব দিন-রাত্রির হিসেব গফুর জানে না। ওকে জানিয়ে কী লাভ ! কিন্তু গফুর কি সেই সব কথা জানতে চাইছে ? কিন্তু কেন ?

খাওয়া শেষ করে একটু বাদে গফুরও এসে বসল বাবার পাশে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ

BanglaBook.org

থেকে বলল, 'সদরহাটির ভজনলাল স্যাররাও বললেন গাঁয়ে-গঞ্জে পতিত জমি বেদখল হচ্ছে। বীরপাড়াতেও নাকি হয়েছে।'

রহমত ছেলের মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্ধকার কলাবাগানের দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'খোদার যা মর্জি তাই হবে। আগে থেকে অত ভেবে কী করব।'

রহমতের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তিনি গফুরের দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন ঘরের দিকে। বাইরে রাত বাড়তে লাগল। গফুরের মনটা বড় এলোমেলো হয়ে আছে। ভজনলালের গদিতে গিয়ে তার চিন্তাটা আরও বেড়ে গেছে। গুরুচরণবাবু লোকটা দেখতে শুনতে ভাল। অনেক বিষয়ে জ্ঞান-গম্যিও আছে। তিনিই বললেন, 'তোমরা, মানে মুসলমানরা এখানে সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘুদের সব সময়ই মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হয়। যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরা যদি দেখেন সংখ্যালঘুদের বড্ড খাতির যত্ন করা হচ্ছে তা হলে তাঁরা খেপে যান। এ সব দেশেরই রীতি। আমেরিকাতেও কালোতে-সাদাতে এই দ্বন্দ্ব চলছে। কালোদের খাতির করলেই সাদারা ভাবেন ওদের যেন মাথায় তোলা হচ্ছে। এখানেও তাই।'

গফুর মিনমিন করে বলেছিল, 'আজ্ঞে আমরাও তো এই দ্যাশের লোক।'

গুরুচরণের যুক্তি ছিল, 'তা মানছি। তবে ও দেশের থেকে তাড়া খেয়ে, তোমাদের জাত ভাইদের হাতে মার খেয়ে রেল স্টেশনে আর ফুটপাথে এসে যারা আশ্রয় নিল, সেই তাড়া খাওয়া বাঙালগুলোর কাছে তোমরা তো স্রেফ মুসলমান, স্রেফ শত্রু। তাঁরা বলবে, তোমরা তোমাদের দেশে যাও, এদেশটা তো আমাদের, হিন্দুদের। এই নিয়েই তো ঝুট-ঝামেলা।'

গফুর জানে না, বাঙালরা ঠিক এই রকমটাই ভাবে কি না। কদমখণ্ডী অথবা ধলাডাঙায় তেমন বাঙাল কেউ নেই। পলাশডাঙায়, দু'দশ ঘর আছে। বিলকান্দাতেও ওই রকম। তবে সদরহাটিতে বিস্তর আছে। ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালি, ময়মনসিং থেকে অনেক বাঙাল এসে ওখানে বাড়ি করেছে। কিন্তু ওদের দেখে গফুর কিছু বুঝতে পারে না। তবে নারাণের মুখে শুনেছে একবার কলকাতার মহামেডান ক্লাব ফুটবল খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছিল। সেই আনন্দে সদরহাটির মুসলমান ছেলেরা তাদের দোকানে পটকা ফাটিয়েছিল আর রাস্তায় মহামেডানের পতাকা টাঙিয়েছিল বলে সদরহাটির বাঙাল ছেলেরা পতাকা টেনে নামিয়ে দিয়েছিল। দল বেঁধে এসে মারধোরও করেছিল। কিন্তু এমনটা কেন হবে? ইস্টবেঙ্গল অথবা মোহনবাগান জিতলে তো সদরহাটির রাস্তায় লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন পতাকা ঝোলে। মহামেডানের বেলায় দোষ হবে কেন?

গফুরের মধ্যে এ নিয়ে তেমন কোন ক্ষোভ কোনদিন ছিল না। কিন্তু আজ ভাবতে গিয়ে ওই সব তুচ্ছ ঘটনাগুলো তার বুকের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করছে। তার বাবা এ সব নিয়ে ভাবে না। জমি দখলের ব্যাপারটা আমলই দিতে চায় না। কিন্তু গফুর নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সে সকালে ঘুম থেকে উঠে কাদের চাচার কাছে যাবার কথা ভাবে। কিন্তু যেতে হয় না। দোকানে বসেই দেখতে পায় সাইকেল চালিয়ে কাদের চাচা যাচ্ছেন ধলাডাঙার দিকে। গফুর তাকে ডাকে।

কাদের চাচা সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা হাতে করে ঠেলতে ঠেলতে গফুরের দোকানে আসে। গফুরের দোকানের পাশেই মাদারের চায়ের দোকান।

গফুর বলে, 'চাচা, চা খেয়ে যাও। তা সাত সকালে চললে কোথায়?'

কাদের চাচা বলেন, 'যাব ধলাডাঙার সাঁওতাল বস্তিতে। দুগ্গাবাবুরা তো ওদের পথে বসাল। পেটের ধান্দায় বাঘমারির জঙ্গলে গিয়ে ইচ্ছে মতন কাঠ কাটছে আর হাটে বেচছে। বাঘমারির জঙ্গল লিজ নিয়েছেন ওই ভজনলাল আর বনওয়ারীলাল। তা তাঁরা এসব সহ্য করবেন কেন ? তাঁরা থানায় জানিয়েছেন। তাই নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল।'

গফুর কেমন করে কথাটা পাড়বে তাই ভাবতে ভাবতে মাদার আলি চা দিয়ে গেল। কাদের চাচা চায়ের গ্লাসে চুমুক দেওয়ার পর গফুর বলল, 'একখান কথা শুধাবো ?'

কাদের চাচা মুখ না তুলেই বললেন, 'বলে ফ্যাল।'

গফুর বলে, 'সদরহাটিতে গিয়েও শুনলাম, বীরপাড়াতে নাকি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এ গাঁয়ে...'

কাদের চাচা মুখ তুলে গফুরের দিকে তাকালেন। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোর বড্ড আগ বাড়ানো ভাবনা। চালের বাতায় আগুন লাগবে বলে এখনই জল ছিটোবি। ও সব জিনিস এ গাঁয়ে হতে দেরি আছে। তাছাড়া বড় মসজিদের ধারে তোদের ওই জমি তো যতদূর জানি ওয়াকফনামা করা আছে। ও তো কেউ দখল করতে পারবে না।

কাদের চাচা চলে যাবার পর গফুরের মনে হল কাদের চাচা আবার একটা নয়া ফ্যাকড়া বাধিয়ে দিয়ে গেল। এ সব কথা তো সে কখনও শোনেনি। মন খারাপ করে ঝিম মেরে বসেছিল গফুর। নারাণ এল হাঁফাতে-হাঁফাতে। ওর চোখ-মুখে প্রবল উত্তেজনা। নারাণ বলল, 'সাঁওতাল পাড়ায় গণ্ডগোল বেধে গেছে। তীর আর টাঙ্গি নিয়ে দুগ্গাদাদের তাড়া করেছে। পুলিশের দুই সেপাই টাঙ্গি দেখে ভেগে গেছে।'

গফুর বলল, 'একটু আগে তো কাদের চাচা ওই দিকে গেল, ওই সাঁওতাল বস্তিতে।'

নারাণ উত্তেজনায় কাঁপছিল। তেমনভাবেই বলল, 'তাহলে আর রক্ষে নেই। মংলুর বৌকে নাকি কাল দুপুরে বাঘমারির জঙ্গলে কারা টানাটানি করেছে। বদ মতলবে জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরে পরনের শাড়ি টেনে খুলে নিয়েছে। মংলু আর বস্তির লোকেরা ছিল অন্য ধারে। চিৎকার শুনে গিয়ে দেখে ছেলেদুটো ওর গতরে হাতি-পাতি করছে। ছেলে দুটো তো পালিয়েছে, মংলুর বৌ সদরহাটির হাসপাতালে। জানা গেছে ওই ছেলে দুটো নাকি মোচলমান। ব্যস, ওরা সকাল থেকেই টাঙ্গি আর তীর-ধনুক নিয়ে গাঁয়ের দিকে আসছিল। তখনই দুগ্গাদা গিয়ে পড়ায় তাঁকেই তাড়া করেছে।'

একদমে কথাগুলো বলে নারাণ হাঁফাচ্ছিল। গফুরের কপাল কুঁচকে যেতে লাগল। এ গাঁয়ে এমন মোচলমান ছেলে কে আছে যে ওইরকম কুকাজ করতে পারে ? মংলু বা তার লোকেরা কি ছেলে দুটোকে চিনতে পেরেছে ? না চিনতে পারলে কেমন করে জানবে ওরা হিঁদু না মোচলমান ? আর যদি চিনেই থাকে তাহলে নাম বলতে পারছে না কেন ?

সাঁওতাল পাড়ার খবরটা চাপা রইল না। সেই খবরের সঙ্গে উত্তেজনাও ছড়াতে লাগল গাঁয়ের মধ্যে। দুগ্গাদা এলেন দুপুরবেলা। বললেন, 'এখন ওদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। ওরা মারমুখী হয়ে আছে। অবস্থা আয়ত্তে এলে মংলুদের সঙ্গে বসতে হবে। বোঝাতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে অপরাধীদের। আমি পুলিশ পিকেট বসাবার কথা জানিয়েছি। যতক্ষণ পুলিশের বড় দল না আসছে ততক্ষণ সবাই এককাট্টা হয়ে থাকবে।'

এরপর থেকেই যেন হুড়মুড় করে ঘটনাগুলো ঘটে যেতে লাগল। সাগরের ঢেউ যেমন করে একের পর এক আছড়ে এসে তীরে পড়ে, তেমন করেই এক-একটা ঘটনার সংবাদ আছড়ে এসে পড়তে লাগল কদমখণ্ডীর বুকে। বিকেলের আগেই ধলাডাঙার

BanglaBook.org

মুসলমান পাড়ায় টাঙ্গি নিয়ে ধেয়ে গেল ওরা। সঙ্গে তীর-ধনুক আর মশাল। ঘণ্টাখানেকের তাণ্ডবে মোল্লাপাড়ার দশ-পনেরোটো ঘর পুড়ে ছাই। টাঙ্গির ঘায়ে মারা পরল হাফিজুল আর মসজিদের লতিফ। লতিফুদ্দিন রোজ মসজিদে আজান দিত। দু'জনেই সত্তর পেরুনো বুড়ো। এই দুঃসংবাদ যখন ঝড়ের মতো কদমখণ্ডী ছাড়িয়ে পলাশডাঙা, বিলকান্দা আর ডাঙাডিঙ্গলেতে পৌঁছল তখন মংলুদের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুন্নাদা আর বিপিন গড়াইয়ের বাড়িতে। তীর লেগেছে কাদের মিঞা আর গোকুল মাস্টারেরও। কদমখণ্ডীর বাতাসে তখন ভয় আর আর্তঙ্ক বাজপাখির মতো ডানা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাঁয়ের পথঘাট শুনশান। শুধু জায়গায়-জায়গায় জটলা আর ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে পরস্পরের কথা শোনা। কেউ-কেউ খবর আনে, আজ রেতের বেলা ওরা টাঙ্গি নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে মোচলমানদের বাড়িতে। কেউ কেউ বলে, সদরহাটির হাসপাতালে মংলুর বৌ মারা গেছে। মংলুদের আর রোখা যাবে না। বুনো মোষের মতো ওরা সন্ধেবেলাতেই ধেয়ে আসবে কদমখণ্ডীতে।

দু'চারজন পরামর্শ দেয়, 'হাত গুটিয়ে বসে থাকলে দল বেঁধে মরতে হবে। তার চাইতে আমরাও সড়কি, বল্লম, শাবল যার যা আছে তাই নিয়ে তৈরি থাকি। খালি হাতে জান দেব না।'

গফুর ফিসফিস করে নারাণকে বলে, 'তোর ঘরে অস্ত্র আছে?'

নারাণ শুকনো মুখে বলে, 'একখানা বেতের লাঠি, যেটায় ভর দিয়ে মা চলত। এ ছাড়া তো কিছু নেই।'

নারাণ এমন ভাবে বলল, যেন ঘরে অস্ত্র না থাকাটা খুব অন্যায়। গফুর বলল, 'আমার আছে। তুই আমার সঙ্গে আয়।'

তখন বিকেল-মরা আলোয় কদমখণ্ডী গুম মেরে আছে। আর একটু পরেই ছমছমে রাত নামবে। এইরাতে আবার কী অঘটন ঘটবে কেউ জানে না। নারাণ গফুরের সঙ্গে ওদের বাড়িতে এল। এখনই দরজা জানালা সব বন্ধ। গফুর বাইরে থেকে নিজের নাম বলে দরজায় টোকা দিল। দরজা খোলার আগে জানালা খুলে গফুরের মা দেখে নিল সত্যিই গফুর কি না।

ওরা ঘরে ঢুকতেই গফুরের মা দরজা বন্ধ করে দিল। নারাণ টের পেল গফুরদের বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেছে। সবার মুখেই আতঙ্কের ছায়া কাঁপছে। গফুরের মা বললেন, 'নারাণ তোর বৌয়ের পেটে বাচ্চা এসেছে। তুই বাড়িখানায় বৌরে নে একা থাকিস, তোর তরে বড় ভয় হয়।'

নারাণ শুধু মাথা নাড়ল। পাশের ঘর থেকে গফুরের বাবা বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোর চাচি হক কথা কয়েছে। তুই বরং এই সময় বৌরে নে আমার বাড়িতে এসে থাক। আমার দু'খানা ঘর তো খালিই আছে। হাঙ্গামা মিটলে চলে যাবি।

নারাণ উত্তর দেবার আগে ভাবছিল। গফুর বলল, 'তুই তাই কর। বৌরে নে চলে আয়। আজের রাতখান বড় কঠিন।'

গফুরের মা বললেন, 'নারাণ, ভাবাভাবি করিস নে। সন্ধে নামলে পোয়াতী বৌ নে রাস্তায় বেরুতে নেই। তুই পদ্দরে নে আয়।'

সন্ধ্যা নামার আগে পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে নারাণ এসে পৌঁছল গফুরের বাড়িতে। গফুরদের কলাবাগানে তখন ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে কদমখণ্ডীর গ্রামটাকে। নির্মেঘ আকাশে অল্প কয়েকটা তারা। সদর রাস্তা দিয়ে মোটর

BanglaBook.org

গাড়ি চলার আওয়াজ। একতলা বাড়ির ছাদে উঠে গফুর আর নারাণ দেখল পর-পর দুটো জিপ গাড়ি বোঝাই হয়ে পুলিশ যাচ্ছে ধলাডাঙার দিকে। জিপ গাড়ি দুটোর পিছনে একখান মোটরগাড়ি। গফুর ফিসফিসিয়ে বলল, 'সাঁওতাল পল্লীতে পুলিশ যাচ্ছে।'

নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'মোটর গাড়িতে কে যায়?'

গফুর উত্তর দেয়, 'ঠাহর করা গেল না। মনে হয় সদরের কোন পুলিশকর্তা।'

ওরা চুপ করে ধলাডাঙার দিকে তাকিয়ে রইল। বাতাসে ভেসে আসতে লাগল ধুলোর গন্ধ।

॥ ৫ ॥

দিন তিনেক থমথমে ভাবটা রইল তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল ধলাডাঙা আর কদমখণ্ডী। পাঁচদিনের পর সাঁওতাল পল্লী থেকে পুলিশ পিকেট তুলে নেওয়া হল। মংলুর বৌ অবশ্য মরেনি। ওই পাঁচ দিনের মাথায় সদরহাটির হাসপাতাল থেকে সে নাকি ফিরে এসেছে তার সোয়ামীর ঘরে কিন্তু মোল্লাপাড়ার দুই বৃদ্ধ হাফিজুল আর লতিফের মৃত্যুটা সহজে ভুলতে পারছে না ধলাডাঙার মানুষরা। পুলিশ পাহারায় মোল্লাপাড়ার মানুষরা মিছিল করে গিয়ে ওঁদের গোর দিয়ে এসেছে। এই শোক সহজে ভোলবার নয়। বাইরের গণ্ডগোল থেমে এলেও ভিতরের ক্ষতটা শুকোয়নি, এত সহজে শুকোবার নয়। মোল্লাপাড়ার মানুষরা এখনও দুই চোখে রাগ আর ঘৃণা নিয়ে সাঁওতাল পল্লীর দিকে তাকায়।

সাঁওতালপল্লীর মংলুরা সেটা টের পায়। ওদের কাছে খবর আছে, তাড়া খেয়ে ছেলে দুটো বাঘমারির জঙ্গল থেকে ওই মোল্লাপাড়ার দিকেই গিয়েছিল। জাতভাই বলে কেউ ওদের আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে না রাখলে ওরা অত সহজে গ্রাম থেকে বেপাত্তা হতে পারত না। পুলিশের কাছে মংলুর বৌ বরখে যে বর্ণনা দিয়েছে এবং মংলুরা যা শুনেছে ঠিক তেমন দেখতে দুটো ছেলেকে নাকি মোল্লাপাড়ায় দেখা গেছে। ওদের খুঁজতেই মংলুরা দল বেঁধে হানা দিয়েছিল মোল্লাপাড়ায়। ওরা যদি বাধা না দিত, ওদের পাড়ার ভিতর থেকে যদি বল্লম আর ভোজালি নিয়ে ছেলেরা ধেয়ে না আসতো তাহলে এমন ঘটনা ঘটতো না। ওই দুই বুড়ো হাফিজুল আর লতিফকে মংলুরা কেন মারতে যাবে? ঝড়ের মুখে পাখির বাসাও উড়ে যায়। তেমনই ঘটেছে।

মংলু আফসোসের গলায় বলে, 'মাথাটা ইমন গরম হই গেল যে, হাতের টাঙ্গি পড়ল গিয়ে ওই ভাল মাইনস্যের উপর। উয়াদের কী কাম ছিল আমাদের সামানা করার। ঘরের বৌটার ইজ্জত নিলে কুন শালা মরদের মাথাটো ঠিক থাকে। তুরা যদি ওই কুত্তা দুইটারে না লুকায়ে রাখবি তাইলে তুরা মোদের বাধা দিলি কেনে?'

মোল্লাপাড়ার মানুষরাও বুঝতে পারে না, বরখের ইজ্জত নেবার দায়টা ওরা কেন মুসলমানদের ওপর চাপালো। এর কি কোন ভিত্তি আছে? লুঙি আর গেঞ্জি কি শুধু মুসলমানরাই পরে। মংলুদের তাড়া খেয়ে জঙ্গল থেকে ওই বদমাইস দুটো কোন দিকে ছুট মেরেছে সে কথা মোল্লাপাড়ার লোকেরা জানে না। যদি সত্যিই ওরা দেখতো, জানতে পারত তাহলে লোকদুটোকে কি ওরা ছেড়ে দিত? মংলুরা আসবার অনেক আগেই ওরা তাদের পিঠমোড়া বাঁধ দিয়ে পেটাতে পেটাতে নিয়ে যেত সাঁওতাল পল্লীতে। কিন্তু মংলুরা এসব কথা বিবেচনা করল না। বৌটাকে সদর হাসপাতালে

BanglaBook.org

পাঠিয়ে দেবার পরই দল বেঁধে ধেয়ে এল মোল্লাপাড়ার দিকে। ওদের ওই মূর্তি দেখে মোল্লাপাড়া তখন ভয়ে কাঁপছে। দরজায়-দরজায় খিল দিয়ে ঘরের ভিতরের মানুষগুলি তখন আহত বিস্ময়ে আল্লাকে ডেকে যাচ্ছে। মোল্লাপাড়ার রশিদ জামতলায় বসে সেদিনের কথাটা ভাবতে ভাবতে তার কেবলই মনে হয়, সেদিন এই পাড়ার কোন্ ছেলেরা বল্লম আর ভোজালি নিয়ে মংলুদের দিকে ধেয়ে গিয়েছিল ? কে গণেশ ওঁরাওয়ের কাঁধে ভোজালি বসিয়ে দিয়েছিল ? কোন্ ছেলেরা বোমা ছুঁড়েছিল ওদের দিকে ? এ পাড়ায় দু'-দশখান বল্লম বা ভোজালি থাকতে পারে, কিন্তু বোমা তো কারুর কাছে থাকবার কথা নয়। মংলুরা যখন লুণ্ঠিপরা ওই দুটো বদমাইসকে আর খুঁজে পায়নি, মোল্লাপাড়ার মানুষরাও সেই ছেলেগুলোকে তখন খুঁজে পাচ্ছে না যারা বল্লম আর ভোজালি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল, যে ছেলেটি মসজিদের ভিতর থেকে বোমা ছুঁড়েছিল। মংলুরা বোমা পরার পর মসজিদের দিকে ধেয়ে না এলে হাফিজুল আর লতিফের প্রাণ যেত না।

রশিদ জামতলায় বসে ঘামতে থাকে অথচ এই সব প্রশ্নের কোন জবাব পায় না। শুধু প্রশ্নগুলো তার বুকের মধ্যে খোঁচা মারে। সে উদাস চোখে একবার মসজিদের দিকে তাকায়। তার মনে হয়, এই দুপুর ফুরিয়ে গেলেই লতিফ চাচা বদনার জলে হাত-মুখ ধুয়ে মাথায় টুপি পরে মসজিদে গিয়ে সন্ধ্যার আজান দেবে। সাতকুলে এখন আর লতিফ চাচার কেউ নেই। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় কলকাতার কলুটোলাতে তার ভাইকে কেটেছে হিন্দুরা। বৌ আর ছেলেটা মরে গেল একরাত্তিরের ওলাওঠায়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে একটু শান্তির জন্য এই গাঁয়ে আসা। অথচ মানুষের হিংসার হাত থেকে এখানেও তার রেহাই জুটল না।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে রশিদের। এখনও তার মনে হয়, সকালে এবং সন্ধ্যায় অন্য কেউ নয়, ওই লতিফ চাচাই যেন তার বুকের মধ্যে বসে আজান দিয়ে যাচ্ছে।

সাঁওতাল পল্লীতে মংলুর আশি বছরের মা মাথার উকুন এনে নখের ওপর রেখে টিপ টিপ করে মারতে মারতে বলে, 'তুরা কিমন মরদ ! মসজিদের বুড়াটারে টাঙি দিয়ে মারলি। উ তুয়াদের শত্রু ছিল ? শত্রু তো পলায়ে গেল, উয়ারে ধরতে লারলি। মরদ ছিল মংলুর বাপ। ইখানে বসে হাড়িয়া খাচ্ছিল। তখনও সাঁঝ হয়নি। খবর আসলো, ওই আফজলের গরুটারে বাঘে টেইনেছে। কী বলব, তুরা মানতে লারবি, এক প্যাট হাড়িয়া খেইয়ে, কুমরে গামছাটো কষে বেঁধে টাঙ্গি নিয়ে সুজা ওই বাঘমারির জঙ্গলে। আমরা তো ছুইটে গিয়ে জঙ্গলের এপারে দাঁড়ালাম। আমার মরদ তখন জঙ্গলের ভিতরে। ফিরে আসলো বাঘটোরে লিয়ে। টাঙ্গিতে উয়ার মাথা তখন দুই ফাঁক। মংলুর বাপরে বিশ দিন হাসপাতালে চিকিৎসা হল। আর ইখন তুরা টাঙ্গি চালালি ওই বুড়াটোর মাথায়।'

মংলু তার মা'র কথা শোনে কিন্তু জবাব দিতে পারে না। সে একবার বৌ বরখের দিকে তাকায়, আবার চোখ তুলে দেখে মসজিদটাকে। সন্ধ্যার আজান দেওয়ার সময় সেই শব্দের ধ্বনি তার বুকের মধ্যে টাঙ্গির কোপ মারতে থাকে। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে সে যেন নিজের কাছেই নিজেকে লুকোতে চায়।

ধলাডাঙার মাঠে আস্তে আস্তে দিন ফুরোয়। বিষণ্ণ বিকেল জেগে ওঠে। ধুলো মাখা গাছের পাতায় একটু একটু হাওয়া লাগে। গাছ-গাছালির মাথা থেকে, বাঁশবনের ভিতর থেকে তরল অন্ধকার ছড়িয়ে যেতে থাকে ধলাডাঙার মাঠে।

সদরহাটিতে সন্ধ্যা নামে আরও একটু পরে। এখানকার সন্ধ্যায় ধলাডাঙা বা

BanglaBook.org

কদমখণ্ডীর মতো বিষণ্ণতা নেই। এখানে সন্ধ্যা আসে চপলা নারীর মতো দু'পায়ে ঘুঙুর বাজিয়ে। দোকানে দোকানে বিজলি বাতি জ্বলে ওঠে, ক্যাসেটে হিন্দি গান বাজে, রোল কর্নারের দোকানে ভিড় বাড়ে, সিনেমা হলের সামনে ছোকরারা দেওয়ালের ছবি দেখে, কেউ কেউ শিস দেয়। যেন দিনের চাইতে রাতের আড়ম্বর আর আদিখ্যেতা বেশি।

বনওয়ারীলালের বসবার ঘরে বসে দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে দেখতে কাদের মিঞা ভাবেন, ভিন্ন দেশ থেকে এসে এরা দুজন সদরহাটিকে যেন কলকাতা বানিয়ে ফেলেছে। এদিকে পাঁচ-সাতটা গ্রামের কাছে সদরহাটি একটা বড় গঞ্জ। তবুও এই ক'বছরে গঞ্জের চেহারায় জৌলুস এনেছেন এঁরাই।

একটু পরেই বনওয়ালীলাল এসে গেলেন। নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'ভজনভাই আসছেন। আপনার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই বলে আপনাকে ডেকে কষ্ট দিলাম।'

কাদের মিঞা বললেন, 'না-না, কষ্ট কী! সদরহাটিতে তো প্রায়ই আমাকে আসতে হয়।'

কাদের মিঞা কথা শেষ করবার আগেই বড় প্লেটে খান চারেক লাড্ডু নিয়ে একজন লোক এল। প্লেটটা কাদের মিঞার সামনে রেখে লোকটা চলে যেতেই বনওয়ারীলাল বললেন, 'বেনারসের লাড্ডু। আজই কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছে।'

লাড্ডু খাওয়া শেষ হবার পর বনওয়ারীলাল বললেন, 'কাদের ভাই, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। জগতে যত লোক আছে সবারই কিছু না কিছু অ্যামবিশন আছে। সাধু-সন্ন্যাসীদেরও আছে। নিজের জন্য না থাক তার প্রতিষ্ঠানের জন্য আছে। কিন্তু আপনার কি কোন অ্যামবিশন নেই?'

কাদের মিঞা কথাটা ধরতে পারলেন না। বনওয়ারীলালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন কথা কেন বলছেন?'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'আপনি পঞ্চায়েতের লিডার। মোটে চারখানা আসন জিতেই থেমে গেছেন। অথচ দুর্গাবাবুরা থেমে নেই। গ্রামের সব কটা মুসলিম ভোট যদি আপনার পক্ষে যায় তাহলে আপনি কতগুলো সিট পাবেন সেটা হিসেব করেছেন?'

কাদের মিঞা জল খেলেন। মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, 'তা তো পাওয়া সম্ভব নয়। ওঁদের সংগঠন বড়, ক্যাডারের সংখ্যা বেশি। ওদের পার্টি এ অঞ্চলে আমাদের থেকে অনেক বেশি সংগঠিত। তাছাড়া...

কাদের মিঞা থামতেই বনওয়ারীলাল বললেন, 'তাছাড়া কী?'

কাদের মিঞা বললেন, 'তাছাড়া ওরা সরকারে আছে। আমরা অপজিশনে। ওদের দাপট যেমন বেশি, ক্ষ্যামতাও বেশি। প্রশাসনের মদত পাচ্ছে তো?'

বনওয়ারীল বললেন, 'একসময় তো সরকার আপনাদেরও ছিল। সেই ক্ষ্যামতা ধরে রাখতে পারলেন না কেন? আপনাদের দলের শক্তি কমে গেল আর ওদের দলের শক্তি বেড়ে গেল কেমন করে?'

কাদের চুপ করে রইলেন। বনওয়ারীলাল তাঁর মুখের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন, 'বাড়িতে কখনও কুকুর পুষেছেন?'

কাদের মিঞা অবাক ভঙ্গিতে বনওয়ারীলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন?'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'পোষা কুকুরকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে দিতে হয়। পেটে খিদে থাকলে যে কেউ আতু বলে ডাকলেই তার কাছে খাবার লোভে ছুটবে। ভোটার

BanglaBook.org

মানে পাবলিকও তাই। তাদের কিছু দিতে হয়, দেখভাল করতে হয়। আপনি মুসলমান, তবুও মুসলমানদের পুরো ভোট আপনি পান না কেন বলুন তো ? কারণ, আপনি ওদের কিছু করেননি। অথচ দুর্গাবাবুরা আমাকে কী প্রস্তাব দিয়েছেন জানেন ?

কাদের মিঞা এবার নড়েচড়ে বসলেন। জানতে চাইলেন, 'কী প্রস্তাব ?'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'গ্রামের মসজিদগুলোর সংস্কারের জন্য কিছু টাকা চায়। সরকারের টাকার ভরসায় না থেকে নিজেরাই টাকা জোগাড়ে নেমে পড়েছেন। এখন হিন্দু হয়ে দুর্গাবাবু যদি আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মসজিদ সংস্কার করে দেয় তাহলে আপনার পজিশন কোথায় যাবে ? আর একটাও মুসলিম ভোট পাবেন না।'

কাদের মিঞা ক্ষোভের গলায় বললেন, 'এ সব ভোট পাবার চাল।'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'তাহলে আপনিও উল্টো চাল দিন। গ্রামে মুসলমানদের ডেকে মিটিং করে বলুন, এটা রাজনীতির সভা নয়। গ্রামে মসজিদগুলো সংস্কার করা দরকার। মুসলমানদের স্বার্থেই এটা করা উচিত। তারপর বাজেট তৈরি করুন। সেই বাজেট আমাদের দিন, আমরা টাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

কথাটা কাদের মিঞার মনে ধরল। এমন একটা কাজ তার নেতৃত্বে হলে মুসলমান ভোট তার পক্ষে অতি সহজেই চলে আসবে।

বনওয়ারীলাল পান পরাগ খেতে খেতে কাদের মিঞাকে দেখতে লাগলেন। যেন তিনি কাদের মিঞাকে ভাববার জন্য কিছুটা সময় দিচ্ছেন।

কাদের মিঞা কিছু একটা বলবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করতেই বনওয়ারীলাল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের গ্রামে মাদ্রাসা আছে ?'

কাদের মিঞা বললেন, 'না।'

ভজনলাল বললেন, 'তাজ্জব কি বাত্ ! তাহলে গ্রামে থেকে নেতা হয়ে গ্রামের জন্য কী করলেন ? কেন মুসলমানরা আপনাকে নেতা হিসাবে মানবে, মান্য করবে। ওরা নেতা মানে দুর্গাবাবুকে। ওদের ধারণা দুর্গাবাবুরা ওদের জন্য বেশি ভাবে।'

কাদের মিঞা উত্তেজিত গলায় বললেন, 'এটা ভুল ধারণা। যে দল সরকারে থাকবে, যাঁদের হাতে পুলিশ, প্রশাসন সংখ্যালঘুরা ভক্তিতে না হলেও ভয়ে তাদের মান্য করবে। বীরপাড়াতে দেখলেন না, ভোট পায়নি বলে গ্রাম জ্বালিয়ে, মেরে-ধরে কত লোককে গ্রামছাড়া করে দিল।'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'আপনার দল দিল্লিতে ক্ষমতায় আছে। আপনাদের ক্ষমতা তো আরও বেশি। শুধু ক্ষমতা থাকলে হয় না, বুদ্ধি করে সেটা প্রয়োগ করতে হয়। আপনার জাত ভাইদের ভুল ধারণাটা কাজ করে আপনাকেই ভেঙে দিতে হবে। আপনি কি খবর রাখেন, এই মসজিদ, মাদ্রাসা এসব তৈরি করার কাজে ইসলামিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া যায় ?

কাদের মিঞা বললেন, 'এরকম একটা খবর শুনেছিলাম। তবে সে অনেক হ্যাপা।'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'কিচ্ছু হ্যাপা নেই। ওসব আমি দেখব। আপনি আগে মাদ্রাসা আর মসজিদগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করুন। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

কাদের মিঞা জানতে চাইলেন, 'কী শর্ত ?'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'টাকাটা যে আমরা জোগাড় করছি সেটা আপনি ছাড়া কেউ জানবে না। দুর্গাবাবুদের কানে গেলে ওরা বাগড়া দেবে, নয়তো ঝামেলা পাকাবে।

BanglaBook.org

সবাই জানবে, টাকার ব্যবস্থা আপনি এবং আপনার পার্টি করেছে। চাঁদার রসিদ বইও লোক দেখানোর জন্য ছাপাবেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দশ-বিশ টাকা যদি তুলতে পারেন তা হলে আরও ভাল।'

কাদের মিঞা মনে মনে খুশি হলেন। তিনিও এমনটাই চাইছিলেন। এই কাজের কৃতিত্ব এবং গৌরব যেন সে আর তার পার্টি পায়, অন্য কাউকে ভাগীদার করতে তিনি রাজি নন।

এর ঠিক তিন দিন পরে ভজনলালের অফিসে আনারের সরবত খেতে খেতে দুর্গাবাবু বললেন, 'কাদের মিঞাদের মতলবটা ধরতে পারছি না। মসজিদে-মসজিদে ঘুরে দিনরাত কেবল ফিসফাস আলোচনা করে যাচ্ছে। আপনাদের কাছে কোন খবর আছে?'

ভজনলাল হাসতে হাসতে বললেন, 'গাঁয়ের খবর আপনার চাইতে আমি কেমন করে বেশি জানব। আমিই তো আপনার কাছ থেকে খবর নিই। আপনার কমরেডরা খবর আনতে পারছে না?'

দুর্গাবাবু বললেন, 'খবর যা পেয়েছি সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। কাদের বলছে গ্রামের মসজিদগুলো সংস্কার করবে, গ্রামে মাদ্রাসা বানাবে। পঞ্চাশ হাজার টাকা বাজেট। এত টাকা ওরা পাবে কোথায়?'

ভজনলাল হাসতে হাসতে বললেন, 'এসব কাজে, পঞ্চাশ কেন, পঞ্চাশ লাখও পেয়ে যেতে পারে। ওরা কি আপনার সরকারের ওপর ভরসা করে? ওদের টাকা দেবে ইসলামি দেশ, ঘরের কাছে রয়েছে বাংলাদেশ আর পাকিস্তান। ওরাও দিতে পারে।'

দুর্গাবাবু চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন। একটু পরে বললেন, 'জেলা কমিটিকে খবরটা জানানো দরকার।'

ভজনলাল কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'আপনাদের এই কমিটিবাজি আমার ভাল লাগে না। ডিস্ট্রিক্ট কমিটি কী করবে? কাদের মিঞার কাজ বন্ধ করে দেবে? তার চেয়ে ভাবুন, এই কাজগুলো করে ফেললে কত পরিমাণ মুসলিম ভোট কাদের মিঞার দল টেনে নেবে।'

দুর্গাবাবু বললেন, 'সে তো নেবেই।'

ভজনলাল বললেন, 'তাহলে এবার আমার খবর শুনুন। এই কাজের মধ্যে দিয়ে কাদের মিঞা সব কটা গ্রামের মুসলমানদের সংগঠিত করে ফেলবে। তারপর ওদের তাতিয়ে খেপিয়ে পাঠাবে সাঁওতাল পল্লীতে। ওই পল্লী থেকে ওরা একটা ভোটও পায় না, সব আসে আপনাদের বাক্সে। ওদের তাড়িয়ে দিতে পারলে আপনার পকেট ভোট গেল, মুসলিম ভোটও গেল। স্রেফ হিন্দু ভোট ভরসা। সেটা তো তিন ভাগ হবে। কাদের মিঞার প্ল্যানটা আপনার মাথায় ঢুকল?'

কপালে ভাঁজ পড়ল দুর্গাবাবুর। তিনি গুম মেরে খানিকক্ষণ বসে থেকে ভজনলালের মুখের দিকে তাকালেন। ভজনলাল বললেন, 'দেখুন, আমরা রাজনীতির লোক নই। ওসব জিনিস বুঝি না। আমরা বেওসা বুঝি। সেই জন্যে আমরা শান্তি চাই, মানে পিস। পিস না থাকলে বেওসা চলে না। কাদের মিঞার চালটা ভাল। তবে এটা কলকাতার প্ল্যান। কিন্তু আসল মজাটা হল ওঁদের পার্টিতে ডিসিপ্লিন নেই। ওঁরা জোশে চলে, হোসে নয়। আপনি হুঁসিয়ারি সে কাম লিন।'

দুর্গাবাবু বললেন, 'কী-রকম?'

ভজনলাল বললেন, 'আপনিও মুসলমানদের বোঝান মসজিদ সংস্কার খুবই জরুরি।

আপনিও ওদের সঙ্গে সামিল হয়ে যান। চাঁদার বই নিয়ে চাঁদা তুলতে থাকুন। কমিটি তৈরি করুন। আপনি কমিটিতে না থেকে আপনার দলের পাঁচ-সাতজন সাচ্চা মুসলমান কমরেডকে কমিটিতে ঢুকিয়ে দিন। এবার আসল কাজ শুরু হবার আগে নানা ফ্যাকড়া তুলে কাজটা পিছিয়ে দিতে থাকবেন। কাদের মিঞা গ্রামের লোকদের কাছে ফালতু বনে যাবে। তারপর লোক যখন কাদেরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে খেপে যাবে তখন কমিটি ভেঙে দিয়ে আপনি কমিটি গড়বেন। যেন শেষ মুহূর্তে আপনিই হাল ধরলেন।'

দুর্গাবাবু বললেন, 'তারপর ?'

ভজনলাল বললেন, 'তারপর আপনার নেতৃত্বে কাজ শুরু হবে। প্রাথমিক টাকার ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা আর কেউ জানবে না। সবাই জানবে, আপনার পার্টি টাকা তুলে দিয়েছে।'

দুর্গাবাবুর চোখ জোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভজনলাল সেটা লক্ষ করলেন। তিনি এক চামচ পানপরাগ মুখে দিয়ে বললেন, 'সাঁওতালরা আপনার ভোট ব্যাঙ্ক। মুসলমানদের হাত থেকে ওঁদের বাঁচাতে হবে। কাদেরের বদ মতলবটা হাসিল করতে দেবেন না। দরকার হলে ওখানে কমরেডদের রাখবেন পাহারায়।'

দুর্গাবাবু বললেন, 'সে তো করতেই হবে। তবে মংলুরা কাজটা ভাল করেনি। থানা-পুলিশের হ্যাপা কতদিন চলবে কে জানে। ওভাবে মোল্লাপাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়াটা ওদের মোটেও উচিত হয়নি। দুজন নিরীহ লোক খুন হয়ে গেল। কী লজ্জার কথা বলুন তো।'

ভজনলাল কোন কথা বললেন না। পানপরাগ চিবুতে চিবুতে দুর্গাবাবুকে দেখে যেতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, 'স্যার, একটা কথা বলব ?'

দুর্গাবাবু কখনও ভজনলালের মুখে 'স্যার' সম্বোধন শোনেননি। তাই তিনি অবাক হয়ে ভজনলালের দিকে তাকালেন। বললেন, 'বলুন ?'

ভজনলাল বললেন, 'আপনার মেয়েকে যদি কেউ রেপ করার চেষ্টা করে আর আপনি সেটা দেখতে পান তাহলে আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে ? যদি জানতে পারেন ওই লোক দুটো আশ্রয় নিয়েছে আমার বাড়িতে, তবে কি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন ? আপনার ক্যাডাররা আমার বাড়ি ঘিরে ফেলতে কসুর করবে ?'

ভজনলালের কথায় দুর্গাবাবুর বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি শুধু কোনমতে উচ্চারণ করলেন, 'তার মানে ?'

ভজনলাল আরও একটু পানপরাগ খেলেন। সঙ্গে সামান্য জর্দা। পিকদানিতে পিক ফেলে বললেন, 'মানেটা খুব সোজা। আপনার জানা উচিত। ওই ছেলে দুটো অন্য গাঁয়ের হলেও ওরা মুসলমান এবং মংলুদের তাড়া খেয়ে ওরা মোল্লাপাড়ারই কোন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এমনও হতে পারে কাদের মিঞা কিংবা রশিদরাই ওদের লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।'

দুর্গাবাবুর মাথাটা ঘুরতে থাকে। তিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন না। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে, কিসের স্বার্থে কাদেররা এমন জঘন্য কাজ করতে যাবে। মংলুদের সঙ্গে তো ওদের বিরোধ নেই। একজন মহিলার সম্ভ্রম হানি করার চেষ্টা যারা করে, করতে পারে তাদের কেন মদত দিতে যাবে কাদের এবং রশিদরা ? রশিদ তো কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তার তো দলগত কোন স্বার্থ নেই। কাদের রাজনীতির লোক হলেও এমন একটা ব্যাপারকে সে সমর্থন করবে সেটা ভাবতে দুর্গাবাবুর

BanglaBook.org

খারাপ লাগছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুর্গাবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এতে কাদেরের কী লাভ ? এই ঝামেলার জন্যই তো হাফিজুল আর লতিফের প্রাণটা গেল। থানা-পুলিশ হল। মংলুরা বিশ্রি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল।'

ভজনলাল বললেন, 'আর এ জন্যই মুসলমানরা এককাট্টা হয়ে কাদের মিঞা আর তার দলের পিছনে এসে গেল। ছোট্ট এই চালটা কাদের চেলেছিল মুসলমানদের থেকে আপনাকে আর আপনার দলকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে। আপনার সদরহাটির বোকা কমরেডরাও এটা বুঝতে পারেনি। আপনার ডিস্ট্রিক্ট কমিটির শতকরা চল্লিশ ভাগ কমরেড আমাদের কাছ থেকে অনেক সুবিধে পায়, সেজন্য তারা আমাদের হয়ে জমির দালালিতে সাহায্য করে। আর আপনি ওদের কাছ থেকে বুদ্ধি ধার নিতে চান।'

দুর্গাবাবু বললেন, 'তাহলে আমাদের কী করা উচিত ?'

ভজনলাল হাতের আঙুল ফোটাতে ফোটাতে বললেন, 'এখনই থানায় গিয়ে দরবার করুন মংলুদের অ্যারেস্ট করার জন্য। কাদের মিঞার দল ডি এম-কে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু আপনাদের জন্যে মংলুদের ধরতে পারছে না। এবার আপনারা মংলুদের অ্যারেস্ট করাবার উদ্যোগ নিন। আপনার নেতৃত্বে এবং আন্দোলনে ওদের সাত আটজন মরদ অ্যারেস্ট হলে আপনার প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস ফিরে আসবে।'

দুর্গাবাবু যেন বিষম সঙ্কটে পড়েছেন সেইভাবে বললেন, 'কিন্তু সাঁওতাল পল্লীর রি-অ্যাকশনটা কী হবে ? সেই সব ভেবেই তো জেলা কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, ভিতর থেকে ওদের সাহায্য করো।'

ভজনলাল দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তা হলে তাই করুন। কিন্তু পরে পস্তাবেন। পঞ্চায়েত ইলেকশন এখন ঘরের কাছে। জেনারেল ইলেকশন আরও দেরিতে। অত দূরের কথা না ভেবে কাছের কথা ভাবুন। জেলা কমিটিকে সেটা বোঝাবার চেষ্টা করুন। ওদের অ্যারেস্ট না করলে মুসলমানরা আপনাদের বিশ্বাস করবে না।'

দুর্গাবাবুর দুই ভুরু কুঁচকে গেল। কোঁচকানো ভুরুর মধ্যিখানে যেন এক জটিল প্রশ্ন। দুর্গাবাবু উঠে এলেন। সদরহাটিতে তখন সন্ধ্যা নামছে।

ঠিক এমনই এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় সদরহাটি থেকে দুখানা গাড়ি এসে ঢুকল সাঁওতাল পল্লীতে। মোল্লাপাড়ার মানুষরা তখনও বাড়ির উঠোনে, বটতলায়, নয়তো দরগাতলায় বসে নানা গল্প করে যাচ্ছে। পুকুরের এপার থেকে ওরা পুলিশের গাড়ি দুটোকে সাঁওতাল পল্লীতে ঢুকতে দেখল। কিন্তু গাড়ি দুটো চলে যাবার পর খবর এল, মংলু আর তার আটজন সঙ্গীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে থানায়। খবরটা মোল্লাপাড়ার কাউকে অখুশি করল না। কেউ কেউ বললেন, 'সত্যি, দ্যাশে একটা আইন আছে। তারে ফাঁকি দেওয়া যায় না।'

অন্যরা বললেন, 'পুলিশ সব জেনে-বুঝেও ওদের ধরতে সাত দিন দেরি করল কেন ? ওদের তো এতদিনে ফাঁসি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

সাঁওতালপাড়া তখন থমথমে। মংলুর মা বুক চাপড়ে বিলাপ করতে করতে কাঁদে আর পুলিশকে শাপশাপান্ত করে। মংলুর বৌ বরখে ছলছলে চোখে কদমখণ্ডীর রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে এই বুঝি তার মংলু ফিরে এল। সে একবার যায় দুর্গাবাবুর কাছে আরেকবার ছোটে কাদের মিঞার দোকানে। কিন্তু কেউই কোন নিদান দিতে পারে

BanglaBook.org

না। মোল্লাপাড়ার লোকেরা যে খুশি হয়েছে সেটুকু শুধু সে টের পায়। সেদিনের ঘটনার পর থেকে সাঁওতাল পল্লীর লোকেরা যেমন মোল্লাপাড়ায় যায় না, তেমনই মোল্লাপাড়ারও কেউ আসে না সাঁওতালপল্লীতে। দুটো পাড়ার মধ্যে যেন অদৃশ্য একটা বেড়া গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কেমন করে এটা হল সে কথাটা কেউ বুঝতে পারে না। মোল্লাপাড়ার ফতিমা বুড়ি কত রকমের জলপড়া আর শেকড়- বাকড়ের সন্ধান জানে। বরখে আর ঝিমলিকে মেয়েলি রোগের কত ওষুধ দিয়েছে ওই ফতিমা বুড়ি। আবার ওরাও এসেছে মংলুর মা-র কাছে পিত্তশূলের ব্যথা আর গিঁটে বাতের শেকড় নিতে। এখন কাজে-অকাজে কেউ আর আসা-যাওয়া করে না। বরখে ভীরু চোখে মোল্লাপাড়ার দিকে তাকায়। সে দেখে মসজিদের মাথার ওপর দিয়ে পাখি উড়ে যায়, বাঁশবনের মধ্যে হাওয়ার শনশন শব্দ ওঠে, বাঘমারির জঙ্গলের দিক থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসে, কখনও বা ডাহুক ডাকে। অন্য কিছু না বদলালেও গাঁয়ের মানুষগুলো বদলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ওরা কেউ একবারও বলে না যে, বরখেকে বেইজ্জত করার চেষ্টা যারা করেছিল তাদেরও ফাঁসি হওয়া দরকার। যারা তাদের নিজেদের ঘরে জাতভাই বলে ওই বদমাইস দুটোকে আশ্রয় দিয়েছিল, যারা ছুটে এসে আচমকা গণেশের কাঁধে ভোজালি বসিয়েছিল, মসজিদের ভিতর থেকে বোমা ছুঁড়েছিল তাদেরও তো কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে যাওয়া উচিত। পুলিশ তা হলে 'উয়াদের ছেইড়ে দিল ক্যানে ?'

প্রশ্নটা বল্লমের ফলার মতো সাঁওতালপাড়ার লোকগুলোর বুকে বিঁধতে থাকে। বরখে দাঁতে ঠোঁট চেপে দূরের আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা যেখানে ঝুঁকে এসেছে মাটির কাছাকাছি। আকাশ কি কখনও মাটির সঙ্গে মেশে ? বরখে লম্বা একটা শ্বাস ফেলে উঠোন থেকে ঘরের দিকে যায়।

সকালে বাঘমারির জঙ্গলে শুকনো পাতা আর লকড়ি কুড়োতে যায় বরখেরা। মংলুর মা বলে, 'সূয্যি ডোবার আগেই ঘরে ফিরে আসবি।'

মাথায় শুকনো ডালপালা বয়ে আনার সময় ওরা দেখতে পায় মোল্লাপাড়ার বৌরা মজা পুকুরের মধ্যে পা ডুবিয়ে গেঁড়ি-গুগলি খুঁজছে। বরখেদের দেখে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। সামনে জানু মণ্ডলের চায়ের দোকান। বাঁশের মাচায় জনা চারেক ছোকরা বসে। ওরা বরখেদের দেখে বলে, 'থানার ভিতরে যা পেটাই হচ্ছে না, তাতে চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলে যাবে। দুর্গাবাবুরা না থাকলে ওই কুত্তাদের ছারপোকার মতো টিপে মেরে দিতাম।'

বরখে মাথায় বোঝা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে। ওরা গ্রাহ্য করল না। বরখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করে কেউ কেউ হাসল। একজন ছোকরা বরখের ভরা বুকের দিকে তাকিয়ে জিভে চুকচুক শব্দ করে বলে উঠল, 'যেন বেগুনফুলি আম। বাঘমারির জঙ্গলে নিঙড়ে নিয়েছে। তবুও যা আছে, তাতেই...'

বরখে এগিয়ে এল। ওর মনে এখন দুর্জয় সাহস। ওরা কেউ ভাবেনি বরখে এমনভাবে ওদের দিকে এগিয়ে আসবে। বরখে এসে দাঁড়াল সেই ছেলেটার সামনে। ছেলেটার চোখের দিকে চোখ রেখে বরখে বলল, 'হেই, তুরা তো বাবুলোক। আম খাবি ? যিমন আম দেখে তুদের জিভে জল গড়ায় তিমন আম খুঁজে দ্যাখ না। তুয়াদের ঘরেও আছে। তুর মা-র নাই ? মরদ হবি তো আমার ঘরে আয়, হিম্মত থাকে তো আমার মরদের সামনা কর। শালা কুত্তার বাচ্চা, পরের মাগের বুক দেখে চোখ টাঁটায়।'

হঠাৎ আবহাওয়াটা বদলে যাচ্ছে দেখে দোকান থেকে জানু মণ্ডল আর দুজন প্রৌঢ় লোক এসে বলল, 'এদের কথায় কিছু মনে করো না মা। এরা তোমাদের কিছু বলেনি। তোমরা

BanglaBook.org

ঘরে যাও। আমি ওদের হয়ে হাতজোড় করছি।'

বরখেরা ফিরে গেল। জানু আর ওই দুজন প্রৌঢ় লোক ছোকরাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোরা বড় ইতর স্বভাবের। এসব কথা কেউ বলে? ওই মেয়েটাকে বাঘমারির জঙ্গলে কারা বেইজ্জত করার চেষ্টা করেছিল? আমাদেরই জাতের লোক। ওরা কারা তা জানি না, কিন্তু ওরা তো হিঁদু নয়।'

ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'ওরা যে মুসলমান তাই বা জানলে কেমন করে?'

জানু বলল, 'যা রটে তার কিছুটা তো বটে। আমাদের পাড়া থেকে কে ভোজালি চালাল? কারা মসজিদের ভিতর থেকে বোমা ছুঁড়ল?'

ছেলেদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'ওরা কেন মশাল আর টাঙ্গি নিয়ে ধেয়ে এল? কেন আফজল চাচা আর লতিফ চাচাকে খুন করল?'

এবার জানু নয়, জানুর পরিবর্তে মেহবুব গোলদার বলল, 'ওরা অন্যায় করেছে তার জন্যে সাজাও পাচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখ তো, তোর বৌরে কেউ অমনটি করলে তোর মাথা ঠিক থাকতো?'

ছেলেদের মধ্যে থেকে পাল্টা প্রশ্ন আসে, 'আমাদের দুজন লোককে ওরা খুন করেছে। তার বদলা নিতে হবে না?'

মেহবুব বলে, 'দেশে আইন আছে। দুর্গাবাবুরা আছেন। যা করবার, আইন করবে। তোরা কি বল্লম হাতে দাঙ্গা করতে যাবি?'

ছেলে-ছোকরারা এসব কথায় খুশি হতে পারল না। তারা গম্ভীর মুখে বড়দের দিকে তাকিয়ে উঠে গেল।

মংলুদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পর কদমখণ্ডী, ধলাডাঙা, পলাশডাঙা আর সদরহাটিতে খেপে-খেপে মিটিং হল। সকালে দুর্গাবাবুদের, দুপুরে কাদের মিঞা আর গোকুল মাস্টারদের এবং সন্ধ্যায় ভজনলাল আর বনওয়ারীলালের সঙ্গে থানার দারোগার।

ভজনলাল আর বনওয়ারীলালরা দারোগাবাবুকে বললেন, 'আমরা বেওসায়ী লোক। পেটের ধান্দায় দেশ ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ গ্রামেও যদি এরকম অশান্তি চলতে থাকে তাহলে আমরা বেওসা তুলে কলকাতায় চলে যাব।'

দারোগাবাবু বললেন, 'না না এ জিনিস আর বাড়বে না। গোলমাল তো থেমে এসেছে।'

ভজনলাল বললেন, 'আপনার কাছে কী খবর আছে জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে বড় রকমের গণ্ডগোল শুরু হবে এবার। বীরপাড়া আর নসীবপুরের আদিবাসীরা খেপে গেছে। বাঘমারি জঙ্গলের ওপারে ধোবিডাঙা। ওখানে তো শুধু আদিবাসীরাই থাকে। ওরা মদত পাচ্ছে হিঁদুদের।'

দারোগাবাবু গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'বীরপাড়া আর নসীপুর নিয়ে আমার কোন দায় নেই। কিন্তু ধোবিডাঙার লোকরা তো জঙ্গলের খাড়ি পথ দিয়ে ধলাডাঙায় এসে যেতে পারে। ওখানে তো হাজার দেড়েক আদিবাসী আছে।'

ভজনলাল একবার আলতো করে বনওয়ারীলালের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমরা ডি এম সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি সাঁওতালপল্লীর সেন্টিমেন্টটাও বুঝুন। ওদের আটজন মরদকে লকআপে রেখেছেন। ভাল কথা। কিন্তু মংলুর বৌকে যারা রেপ করতে গিয়েছিল তাদের কাউকে আপনারা ধরতে পারেননি।

BanglaBook.org

যারা ভোজালি আর বোম চালিয়েছে তারাও ধরা পড়েনি। ওদের দু' একজনকে ধরলে ব্যাপারটা ব্যালান্স হতো। আপনাদের ডি এম এবং এস পি সাহেবও সেটা বোঝেন।'

ব্যাপারটা আস্তে আস্তে প্রশাসনের অনেকেই বুঝলেন। ফলে ভরদুপুরে পুলিশের গাড়ি গিয়ে মোল্লাপাড়া থেকে যাকে সামনে পেল তাকেই বন্দুকের গুঁতো মেরে গাড়িতে তুলে নিল। কারও নাম-ধাম জানার দরকার ছিল না। শুধু লোক দেখলেই তুলে নাও। কেউ খেয়ে উঠে হাত ধুচ্ছে, কেউ খেজুর গাছের পাতা থেকে চাটাই বুনছে, কেউ শুয়ে আছে মাটির দাওয়ায়, কেউ বসে আছে দোকানের মাচায়, সবাইকে ভেড়ার পালের মতো পুলিশ তুলে নিয়ে গেল গাড়িতে। মাথা গুনতিতে দেখা গেল মোট বাইশজন। হাওয়ার মুখে শুকনো কুটো ওড়ার মতো খবরটা উড়তে লাগল। কেউ কেউ খবর দিল, 'এসবই দুর্গাবাবুদের খেল।' অন্যরা বলল, 'এটা ওই বরখেদের কাজ। সেদিন জানু মণ্ডলের চায়ের দোকানে বরখেদের ওই সব কথা বলার জন্যে ওরাই গিয়ে থানায় নালিশ করেছে।'

আকাশের জল না পেয়ে কদমখণ্ডী যে শুকিয়ে দড়ি হয়ে যাচ্ছে, অনাহারের কষ্ট সইতে না পেরে ফলিডল আর করবীর ফল খেয়ে মানুষ মরছে সে কথাটা চারখানা গাঁয়ের লোক আর মনে রাখতে পারছে না। একসময় তাকাতো আকাশের দিকে বৃষ্টির আশায়, তারপর তাকাতো ধুলোভরা সেই রাস্তার দিকে, যে রাস্তা বিলকান্দার চৌমাথা হয়ে চলে গিয়েছে সদরহাটিতে, শোনা গিয়েছিল ওই পথ দিয়েই নাকি গাড়ি করে সরকারি রিলিফ আসবে গাঁয়ে-গাঁয়ে। আকাশ দয়া করেনি, সরকারও না। এখন মানুষরা কান পেতে থাকে কখন পুলিশের গাড়ি এসে কাকে তুলে নেবে, কখন গাঁয়ের কোন দিক থেকে ধেয়ে আসবে নতুন বিপদ। মানুষ এখন মানুষের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। কদমখণ্ডীর ধুলোভরা বাতাসে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক ভেসে বেড়ায়। নারাণ গুম মেরে নিজের দাওয়ায় বসে থাকে। তার মন ভাল নেই। অথচ এখন তো তারই মন ভাল থাকবার কথা। ভজনলাল স্যার চৌধুরীবাবুদের কাছ থেকে তার বসতভিটে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। চারশো টাকার দেনা সুদে-আসলে পাঁচ হাজার টাকার ওপরে উঠেছে। ভিটের কাগজ নারাণের হাতে দিতে দিতে চৌধুরীদের সরকারমশাই বললেন, 'এতটাকা পেলি কোত্থেকে? কে দিল?'

নারাণ উত্তর দিল, 'চুরি-ডাকাতি করিনি। গায়ে খেটে রোজগার করেছি।'

চৌধুরীমশাই চৌকির ওপর বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। পুরনো অভ্যাস এবং আদব-কায়দা তিনি কিছুই বদলাননি। ছেলে-মেয়েরা কলকাতায় থাকে। ছেলের বৌরা দু'দিন এ বাড়িতে এসেই হাঁফিয়ে ওঠে। এ বাড়িতে এখনও মেঝের ওপর কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে কাঁসার থালা-বাসনে খাওয়া। খেয়ে উঠে উঠোনের কোণে নালার ধারে পিতলের ঘটি থেকে জল ঢেলে হাত ধোওয়া। কলকাতার লোকদের চেয়ার-টেবিলে খাওয়ার অভ্যাস, কল ঘুরিয়ে হাত ধোয়ার রেওয়াজ। এ সব কারণেই ওরা এখানে এসে সুখ পায় না। তা সেই চৌধুরীমশাই শুধু বললেন, 'এটা তোর বাপ বাঁধা রেখেছিল। অনেক টাকা ছাড় দিয়ে দিয়েছি। কাগজটা সাবধানে রাখিস। তোদের হয়ে খাজনা আমিই দিয়ে এসেছি এতদিন। এবার থেকে মনে করে তুই দিস।'

অথচ মনে তেমন আনন্দ নেই। গফুররা শুকনো মুখে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে। সন্ধে হবার আগেই সবার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যায়। গফুরের বাবা রহমত নিজের পাতলা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'কে যে ভাল আর কে যে মন্দ

সেটাই বোঝা দায়। কখনও মনে হয় দুর্গাবাবুরাই ঠিক, আবার কখনও ভাবি কাদের মিঞা আর গোকুল মাস্টাররাই হক কথা কইছে। কদমখণ্ডীতে ছেচল্লিশের পর তো আর কোন জাতের বিরোধ হয়নি। চৌষট্টিতে গোটা ইণ্ডিয়াতে হাঙ্গামা হলেও ইদিকে কিচ্ছু টের পাইনি। তখন দুর্গাবাবুর লোকেরাই বুক দিয়ে আগলেছিল। এখন কাদের বলে, দুর্গাবাবু তো আসলে হিঁদু, মনে মনে তিনি হিঁদুদের দিকেই থাকবেন। ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারি না।'

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে অদ্ভুতভাবে বসে ছিল নারাণ। যেন আদ্যিকালের এক বুড়ো। পদ্ম এসে বসল তার কাছে। পিঠে হাত রেখে বলল, 'ভজনলালের দেনা কেমন করে শুধবে?'

নারাণ বলল, 'তেনার দয়ার শরীর। কাগজখানা দেখাতেই মাথায় ঠেকিয়ে একবার ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, গাঁয়ের অবস্থা ভাল না। এগুলো সামলে রেখো। ঘরে সিন্দুক আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে। যত্ন করে রেখে দিও। তুমি এখন থেকে বাঘমারির জঙ্গলে কাঠ কাটার ব্যাপারটা দেখবে। তোমাকে চাকরি দিলাম। চাকরির কাগজে সই করিয়ে হাতে একশো টাকা দিলেন।'

নারাণের কথা শুনে পদ্ম দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রণাম করল। তারপর নারাণের গায়ের কাছে সরে এসে বলল, 'পেটে যেটা আসছে, সেটা বড় দামাল হবে।'

নারাণ বলে, 'কেন? কিসে বুঝলি?'

পদ্ম বলে, 'পেটের মধ্যি যেমন দস্যিপনা করে, বাইরে বেরুলে তো তার দ্বিগুণ হবে। রেতের বেলা মনে হয় যেন চু-কিত্‌কিত খেলছে।'

নারাণ পদ্মর ভরা পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'বাপ কা বেটা হবে। তর কি মনে লয়, বেটা হবে না বেটি?'

পদ্ম বলে, 'ভগবান যা মন করবেন তাই দেবেন। আমার মন বলছে বেটা হবে। আমার বেটারে কিন্তু বাবুদের ছেলেদের মতো ইস্কুলে পড়াবো। পাশ দিয়ে কলেজে যাবে। বড় চাকরি করবে। ওই চৌধুরীবাবুর ছেলেদের মতো।'

নারাণ পদ্মর কাঁধে মাথা রেখে পদ্মর খোলা পেটে হাত বুলোতে থাকে। ঠিক তখনই আফজল আর গফুর নারাণকে ডাকতে ডাকতে উঠোনে এসে দাঁড়াল। পদ্ম তখন তড়িঘড়ি নিজের শাড়ি সামলাতে ব্যস্ত। কোমরের শাড়িটা আলগা করে পরা ছিল। নারাণ হাত বুলোতে বুলোতে সেই আলগা শাড়ি আরও নীচে নামিয়ে এনেছে। পদ্ম শুধু চাপা স্বরে বলল, 'তুমি উঠোনে যাও।'

নারাণ উঠোনে নেমে এল। তখনও দিনের আলো চকচক করছে উঠোনে। গফুর উত্তেজিত গলায় বলল, 'কাদের চাচা আর দুর্গাবাবুরা মিলে মসজিদ ভাল করবার কমিটি করেছে। সব ভাঙা মসজিদ সারাবে, মাদ্রাসা করবে। এখন কমিটি বলছে বড় মসজিদের পাশে আমাদের ওই ডোবা আর জমিটা নাকি ছেড়ে দিতে হবে। ওটা ওয়াকফ নামা করা আছে। আল্লার কাজে ওই জমি দেওয়াই নাকি রীতি।'

নারাণ বলল, 'তুই দুর্গাদার কাছে গিয়েছিলি?'

গফুর বলল, 'দুর্গাদা বললেন, আমি নাম কা ওয়াস্তে কমিটিতে আছি। এটা তোদের ধম্মের ব্যাপার। আমি বাধা দিলে ওই কাদেররাই বলবে, আমি হিঁদু তাই বাগড়া দিচ্ছি। এটা তোরা আপোষে মিটিয়ে ফেল।'

BanglaBook.org

নারাণ বলল, 'তাহলে কী করবি ?'

গফুর বলল, 'জান দিতে হয় দেব, কিন্তু শালা ওই জমি দেব না। মাদ্রাসা করার কি আর জমি নেই। বড় মসজিদ ভেঙে গেছে ওটা সারাই করতে হবে, তার জন্যি আমাদের জমি লাগবে কেন ? তোরা আমার সঙ্গে থাকবি ?'

আফজল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'থাকবো। কাদের চাচার বুজরুকি আমি জানি।'

গফুর নারাণের দিকে তাকাল। মুখে কিছু বলল না। বলার দরকারও ছিল না। ওর দুই চোখে নীরব জিজ্ঞাসা। নারাণ বলল, 'আমিও আছি। জান দিতে হলে তিনজনে একসঙ্গে দেব।'

গফুরকে সঙ্গে নিয়ে রহমত গেলেন বড় মসজিদের ইমামের কাছে। ইমামের বয়স এখন নব্বই। রহমত বললেন, 'খোদার কী মর্জি জানি না। কিন্তু ওই জমিটা তো আমাদের।'

ইমাম সাহেবের মাথা কলের পুতুলের মতো থরথরিয়ে কাঁপে। মাথা কাঁপাতে কাঁপাতেই তিনি বললেন, 'মসজিদের জন্যে এই জমি দিয়েছিলেন সদরহাটির ইরফানরা। ওরা এখন করাচিতে থাকে। তোর ঠাকুর্দা ছিলেন ইরফানের প্রজা। গোটাটাই মসজিদের জন্য দেওয়া ছিল। শুধু থাকতে দিয়েছিল তোদের। কিন্তু ইরফানরা তোর ঠাকুর্দারে ভিটে ছাড়া করেনি। তাই থেকে গিয়েছিল। পরে তো তোর বাপ বিয়ে করে জমি কিনলে। সেই জমিতে তোরা থাকিস। এটা তো বড় মসজিদেরই সম্পত্তি।'

ইমাম সাহেবের কথা শুনে রহমত যেন বোবা হয়ে গেল। ইমাম আবার ঘাড় নাড়তে নাড়তে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'তোরা যদি এটাকে বাস্তুভিটে করতিস তাহলে একটা কথা ছিল। এটা তো পতিতই পড়ে আছে। পতিত থাকার চাইতে খোদার কাজেই না হয় লাগুক।'

রহমত ফিরে এলেন হতাশ হয়ে। এবার কার কাছে আর্জি জানাতে যাবেন সেটা তার জানা নেই। কিন্তু গফুর বিশ্বাস করে এটা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে। এই চক্রান্তের মধ্যে কাদের মিঞা, গোকুল মাস্টার এমনকি দুর্গাদাও আছেন। তবুও মরিয়া জেদে গফুর বলল, 'রক্ত দিয়ে হলেও বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে রাখব।'

কদমখণ্ডীর বুক জুড়ে আতঙ্ক, অবিশ্বাস আর সন্দেহ ঘন হয়ে আসে। তারই মধ্যে একদিন প্রবল ঝড় ওঠে কদমখণ্ডীতে। এতদিনের নির্মেঘ আকাশ ছেয়ে যেতে থাকে কালো মেঘে যে মেঘ দেখবে বলে কদমখণ্ডী আর তার চারপাশের গাঁয়ের মানুষরা চাতকের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো, আজ সেই মেঘ ঢেকে ফেলছে চারখানা গাঁয়ের আকাশ। সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। তাদের অবাক করে দিয়ে অনেক অনেক দিন পর গাঁয়ে বৃষ্টি নামে। গাঁয়ের মানুষরা পরম উল্লাসে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে সেই বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। মেয়েরা শাঁখে ফুঁ দেয়, উলু পাড়ে, মসজিদের মাথায় উঠে আকাশের দিকে দু' হাত তুলে আল্লাকে প্রণাম করে কদমখণ্ডীর মুসলমানরা। পনেরো-কুড়ি মিনিটের বৃষ্টিতে পথের ধুলো মরে, মাঠের মাটি তবু ভেজে, গাছের পাতা সবুজ চেহারা ফিরে পায়। যেন অনেকদিনের অপেক্ষার পর একবিন্দু স্বস্তি ফিরে আসে।

সেই সন্ধ্যার পর রাত নামে। রাত ঘন হয়। কদমখণ্ডী, ধলাডাঙা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম ভাঙে তুমুল হট্টগোলে। নিশুতি রাতে এ গাঁয়ের কান্না পাশের গাঁয়েও পৌঁছে যায়। সাঁওতাল পল্লীর চিৎকার মধ্যরাতে আছড়ে এসে পড়ে কদমখণ্ডীর ঘরে ঘরে। কেউ কেউ বলে, মোল্লাপাড়া থেকে চিৎকার আসছে। কেউ বলে, না সাঁওতাল পল্লী

থেকে।

সবাই ছোটে ধলাডাঙার দিকে। গফুরের পাশাপাশি ছুটতে থাকে নারাণও।

॥ ৬ ॥

কদমখণ্ডী থেকে সদরহাটি তারপর সদরহাটি থেকে দীর্ঘযাত্রা। সেই যাত্রাপথ এসে থামল যেখানে তার নাম বেলেঘাটা। কলকাতা মহানগরের পুবে, ঝকঝকে শহরের একেবারে নাইকুণ্ডলের কাছে স্যাঁতস্যাঁতে একটা জায়গা। কদমখণ্ডীর পথের মতো এখানে ধুলো নেই বটে, কিন্তু বস্তির সরু গলিতে কখনও জল শুকোয় না। এখানে বসে থাকলে মনে হয় শহরটার মাথায় বুঝি কোন আকাশ নেই। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। অনাবৃষ্টির ফলে ইদানীং কদমখণ্ডীর বাতাসে ধুলোর গন্ধ ভেসে বেড়াতো, এখানকার বাতাসে ধুলোর গন্ধ নেই, কিন্তু এক ধরনের চামড়া পচা গন্ধ সব সময়ই এখানে ঘুরে বেড়ায়। নারাণ চোখ তুলে গফুরকে দেখে, গফুর দেখে নারাণকে। পদ্মর দু' চোখে থমকে থাকে ভয় আর ভাবনা। সে গফুরের বৌ রাবেয়ার দিকে এক পা সরে আসে।

দরজা খুলে খুনখুনে একজন বুড়ো বেরিয়ে আসে। নারাণ আর গফুরের দিকে ভাল করে তাকায়। চোখের দৃষ্টি কমে গেলে মানুষ যেভাবে দেখে এই বুড়োও সেইভাবে ওদের দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'আজ্ঞে কদমখণ্ডী থেকে।'

বুড়োটা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'সেটা আবার কোথায় ?'

নারাণ বুড়ো লোকটাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আজ্ঞে ওই বাঁকড়ো আর পুরুলের মাঝামাঝি। ওই সদরহাটির গুরুচরণ মজুমদার মশাই একখান পত্র দিয়েছেন।'

বুড়ো লোকটা বার দুই চোখ পিট-পিট করে বলল, 'সদরহাটির গুরুচরণ মজুমদার !'

কথা বলার ভঙ্গিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বুড়ো লোকটি তার স্মৃতি হাতড়ে কিছু উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। সদরহাটির বাস কলকাতায় পৌঁছেছে বেলা এগারোটা নাগাদ। অথচ কথা ছিল সকাল আটটাতেই বাস পৌঁছে যাবে কলকাতায়। তারপর খোঁজাখুঁজি করে এখানে আসতে সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। ভজনলাল স্যার অবশ্য খুবই দয়ালু। তিনি সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন, এমনকি কলকাতায় থাকবার ব্যবস্থাও যে একটা হয়ে যাবে তার জন্যে গুরুচরণবাবুকে দিয়ে চিঠিও পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বুড়োটা তো গুরুচরণবাবুকে চিনতেই পারছে না। নারাণ আর গফুর কাতর দৃষ্টিতে বুড়োটার মুখের দিকে তাকিয়ে। বুড়ো যত ভাবে, ভাবতে ভাবতে সময় নেয়, ওদের কপালের ভাঁজ ততই বেড়ে যেতে থাকে।

নারাণ এবার পকেট থেকে চিঠিটা বার করে বুড়োটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই চিঠিখান পড়ে দেখেন। পড়তে পড়তে যদি...

বুড়ো লোকটি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিতে নিতে বলল, 'দাও পড়ে দেখি।'

চিঠিখানি হাতে নিয়েই বুড়ো লোকটি বলল, 'এই দাঁড়াও। চশমা নিয়ে আসি।'

চোখে চশমা দিয়ে চিঠিটা পড়তে পড়তে একবার ওদের দিকে তাকাল। তারপর চিঠি পড়া শেষ করে বলল, 'তাই বল, গুরুচরণ মজুমদার। ওনারে আমরা ডাকি গুরুপদবাবু

BanglaBook.org

বলে। কেউ কেউ বলে গুরুমশাই। কলকাতা থেকে সদরহাটিতে গিয়ে 'পদ'র জায়গায় 'চরণ' লাগিয়েছেন। তা মানে তো একই হল। পদ আর চরণ, অর্থের তফাত নেই।'

চিঠিটা ভাঁজ করে ফতুয়ার পকেটে রাখতে রাখতে বুড়ো লোকটা বলল, 'তা তিনি যখন হুকুম করেছেন তখন তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু তার জন্যে তো সময় লাগবে।'

গফুর জিজ্ঞেস করল, 'ক'দিন ?'

বুড়ো লোকটি উত্তর দিল, 'তা কেমন করে বলব। দিন সাতেক তো লাগবে। তাতেও হবে কিনা বলা মুশকিল।'

গফুর নারাণের মুখের দিকে তাকাল। নারাণ বলল, 'কিন্তু এই সাতদিন আমরা কোথায় থাকবো ?'

বুড়ো লোকটা এবার বিরক্ত হল। গলাটা একটু চড়িয়ে বলল, 'তার আমি কী জানি। এটা কি আমার বাপের তালুক নাকি যে চাইলেই ঘর পেয়ে যাব। এত হুট করে কলকাতায় ঘর কেন, ফুটপাথেও বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। গুরুপদবাবু কি সদরহাটিতে গিয়ে কলকাতার রীতি-নীতি ভুলে গেছেন ?'

গফুর করুণ গলায় জানতে চাইল, 'আমরা তাহলে এখন কী করব ?'

বুড়ো লোকটি চোখ থেকে চশমা খুলতে খুলতে বলল, 'তোমরা কেটে পড়। দু' দিন পরে খোঁজ করে যেও।'

নারাণ আকুল গলায় বলল, 'আমরা তেনার চিঠির ভরসাতেই এয়েছি। সঙ্গে আমাদের বৌ। এতবড় শহরে কোথায় যাব ?'

বুড়ো লোকটা বিরক্ত মুখে পদ্ম আর রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই আবার পাছায় বেঁধে নিয়ে এসেছে বৌকে। তা দেখে মনে হচ্ছে দুটো বউ-ই পোয়াতি। একটির তো যখন-তখন অবস্থা।' শেষের কথাগুলো বলার সময় বুড়ো লোকটা পদ্মর দিকে তাকাল।

পদ্মর দু' চোখ জলে ভরে আসছিল। কলকাতা নামের বিখ্যাত জায়গাটা দেখবার শখ তার মিটে গেছে। খিদের জ্বালায় পেট গোলাচ্ছে। বাস থেকে নামবার পরই তল পেট টনটন করছিল। একবার ভোররাত্রে বাস দাঁড়িয়েছিল কোন একটা অচেনা জায়গায়। রাস্তার একপাশে সারবন্দি গাছের সারি। অন্যদিকে গাছ আর জঙ্গল। জঙ্গলের ওপাশে ধান জমি। বাস দাঁড়াল একটা খোলা মাঠের সামনে। মাঠের একপাশে একটা দোকান। বাসের লোকরা সবাই নেমে গেল বাস থেকে। নামল গফুর আর নারাণও। রাবেয়াকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মকেও নামতে হয়েছিল। নারাণকে কাছে ডেকে পদ্ম ফিসফিসিয়ে তার সমস্যাটা বলল। নারাণ চারপাশে তাকাল। বাসের লোকেরা নেমে চা খাচ্ছে। ছেলেরা প্যান্টের বোতাম খুলে, কেউ কেউ ধুতি তুলে রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। নারাণ দেখল কোন মহিলা ওরকম কোন কাজ করছে কিনা। নারাণ নয়, গফুরই দেখাল। কিন্তু পদ্ম আর রাবেয়া প্রথমে সঙ্কোচ করলেও পরে অন্য মহিলাদের মতো ওরাও শাড়ি আর সায়া দু'হাতে ওপরে তুলে বসে গিয়েছিল। তারপর ওই দোকানে, তারে চটি না কি যেন বলে, ওইখানে চা, বিস্কুট আর জল খাওয়ার পর আর বাস থেকে নামবার সুযোগ পায়নি কেউ। বাসটা খেপে-খেপে অনেক জায়গায় দাঁড়িয়েছে। চুঙ্গি কর নেবার জায়গায় লরির বিরাট লাইন। কিন্তু সেখানে থিক থিক করছে লোক। ওখানে কেউ নামেনি। তারপর এতটা সময় গেল। এখন আবার তলপেট টনটন করছে। কিন্তু কথাটা কাউকে বলা

BanglaBook.org

যায় না। ভেবেছিল চিঠি নিয়ে গেলেই আশ্রয় মিলবে। কিন্তু এখন আশ্রয়ের ভরসাও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। বাসের ঝাঁকুনিতে শরীর ক্লান্ত হয়ে আছে। রাবেয়া দু'বার বমি করেছে বাসের জানালা দিয়ে। রাবেয়া আর পদ্ম অসহায় ভাবে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বুড়ো লোকটা তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওরা আছে বলেই সে ঘরে ঢুকতে পারছে না। লোকটা ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে আবার চিঠিটা বার করল কিন্তু আর পড়ল না। চিঠিটা আবার পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'তোমাদের মধ্যে গফুর কে ?'

গফুর উত্তর দিল, 'আজ্ঞে আমি।'

লোকটা বলল, 'গফুর মানে তো মোচলমান। নেড়েদের তো এখানে থাকবার জায়গা হবে না। শিবমন্দিরের চাতালে একটা-দুটো রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম, কিন্তু নেড়েদের ওখানে থাকতে দেবে না।'

গফুরের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে মুখ নামিয়ে নিল। নারাণ বলল, 'তাহলে আমরা কদমখণ্ডীতে ফিরে যাই। গিয়ে বলি, চিঠি দিয়ে এত ভরসা দিয়ে কোথায় পাঠালেন ? ওখানে তো কিছুই ব্যবস্থা নেই। তাতে ভজনলাল স্যার যা করবার তাই করবেন।'

বুড়োটা হঠাৎ কেশে উঠল। একটু কেশে নিয়ে বলল, 'অত হুটোপাটি করার কী আছে। এটা তো ওই কদমখণ্ডী নয়, এর নাম কলকাতা। এখানকার নিয়ম আলাদা। তা ট্যাঁকে পয়সাকড়ি কিছু আছে ?'

নারাণ বলল, 'কেন ?'

বুড়োটা উত্তর দিল, 'থাকবার ঘর তো আমার মুখ দেখে দেবে না, তার জন্যে অগ্রিম পয়সা লাগবে।' নারাণ জিজ্ঞেস করল, 'কত লাগবে ?'

বুড়ো লুঙিটা ভাল করে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'এখানে দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে আসি।'

পদ্ম আর রাবেয়া দাঁড়াতে পারছিল না। কোমর টনটন করছে। তলপেটে ভারী কষ্ট হচ্ছে ওদের। ওরা দুজনেই করুণ চোখে স্বামীদের দিকে তাকাল। গফুর আর নারাণ ওদের কষ্ট বুঝতে পারছে কিন্তু তারাই বা কী করবে। তবুও মরিয়া হয়ে নারাণ বলল, 'মেয়েদের জন্য এটু বসার ব্যবস্থা হতে পারে ?'

লোকটা বারান্দার কোন থেকে একখানা চটের বস্তা নারাণের হাতে দিয়ে বলল, 'এইটা দাওয়ায় পেতে বোস। সঙ্গে তো মোচলমান জুটিয়ে এনেছ, নইলে ঘরে বসাতাম।'

গফুর নয়, এবার আহত দৃষ্টিতে নারাণই তাকাল গফুরের দিকে। গফুর যেন কথাটা শুনতে পায়নি এমন ভাব করে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। বারান্দার ওপর চটের বস্তা পেতে রাবেয়া আর পদ্ম বসল। সরু গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে উদোম হয়ে উল্টোদিকের বাড়িটার গায়ে পেচ্ছাপ করছিল। বাড়িগুলোর দেওয়ালে কত কিছু লেখা। ভোটের আগে এমন ধারা লেখালেখি কদমখণ্ডীর বাড়িগুলোতেও হয়। বুড়োটা ওদের বসিয়ে গলি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কোথায় যে গেল তা বোঝার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ পর গফুর একটা বিড়ি বার করে নারাণের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে, বিড়ি খা।' নিজে বিড়ি ধরিয়ে সেই আগুনটা এগিয়ে দিল নারাণের দিকে। বিড়িতে পর পর দুটো টান দিয়ে বলল, 'তুই আগে কখনও কলকাতায় এয়েচিস ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'না।'

গফুর বলল, 'আমার বাপ নাকি একবার এয়েছিল। এখানে রাজাবাজার বলে নাকি

একটা জায়গা আছে। ওইখানে এক কুটুমের বাড়িতে দু'দিন ছিল। তা রাজাবাজারটা কোথায় রে ?'

নারাণ ঠোঁট উল্টে বলল, 'জানি নে। কোনদিন তো আসিনি।'

গফুর উদাস গলায় ঘোলাটে আকাশটার দিকে চোখ রেখে বলল, 'গাঁয়ে আমার বাপটার কী হচ্ছে কে জানে। ঝোঁকের মাথায় পাইলে এসে ভাল করলাম, না খারাপ করলাম তা, বুঝতে পারছিনে।'

নারাণও অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কদমখণ্ডীর চেহারাটা তার চোখের সামনে দুলতে লাগল। তার মনে হল অনেকগুলো অঘটন যেন দুঃস্বপ্নের মতো তাদের ঘিরে ধরেছিল। এক-একটা ঘটনার ধাক্কায় তারা যেন ছিটকে-ছিটকে পড়েছে এক-এক দিকে। সনাতন কোথায় গেছে তারা জানে না। আফজল কি এখনও কদমখণ্ডীতে আছে ? না থাকারই কথা। আফজল তাহলে কোথায় চলে গেল ?

বুড়ো লোকটা ফিরে এল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে। সঙ্গে মোটা মতন একজন মহিলা। গায়ের রং মিশমিশে কালো। মোটা ঠোঁটের ওপর তখনও পানের রসের দাগ শুকিয়ে আছে। বাঁ হাতে শাড়িটা এমনভাবে তোলা যে, নীচের মলিন সায়াটা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। সেই মহিলা এসে ওদের দুজনের দিকে তাকাল, তারপর পদ্ম আর রাবেয়াকে দেখল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। এক পা এগিয়ে এসে বুড়োটাকে বলল, 'হারুদা, অন্যের মাগ ভাগিয়ে আনে নি তো ?'

ওই বুড়ো লোকটা, এইমাত্র যার নাম জানা গেল হারু, তা সেই হারু বলল, 'না-না, সে সব কেস নয়। চেনা লোকের চিঠি আছে। আমার বড়বাবুর চেনা লোক।'

ওই মহিলা শাড়ির আঁচলের খুঁট থেকে তৈরি করা পান বার করে মুখে দিল। চিবুতে চিবুতে বলল, 'সাত দিনের জন্যে দিতে পারি। সাত দিন পর ছেড়ে দিতে হবে।'

হারু বলল, 'ওই সাতদিনই দাও না। তারপর বাঘাকে বলে ট্যাংরা বস্তিতে একটা ব্যবস্থা করে দেব।' মহিলা এবার ডান হাতটা বুড়োটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'চারজন মানে হল গিয়ে চার দশে চল্লিশ। চল্লিশ টাকা ডেলি লাগবে। তিন দিনের জন্যে একশো কুড়ি টাকা এখুনই চাই। টাকা ছাড়তে বলো।'

হারু বলল, 'টাকা ছাড়ো। এখন একশো কুড়ি দিতে হবে।'

গফুর আর নারাণ একবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। তারপর গফুরই পকেট থেকে একশো কুড়ি টাকা বার করে হারুর হাতে দিল। হারু টাকাটা দু'বার গুনে ওই মহিলার হাতে দিতেই মহিলা হুকুমের গলায় বলল, 'আমার পিছু পিছু এসো।'

দেখতে যেমন হোক, তবুও একটা ঘর পেয়ে ওদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এল। ঘরের তালা খুলে চাবিটা নারাণের হাতে দেবার সময় মহিলা বলল, 'সাত দিনের মধ্যে অন্য ঘর খুঁজে নিয়'।

মহিলা চলে যাবার পর ওরা চারজনেই ঘরে ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। পিছনের জানালা খুলে দেওয়ার পর বোঝা গেল ওই জানালা দিয়ে এক-আধটু হওয়াও এই ঘরে ঢোকে। কিন্তু ওরা কেউই বুঝতে পারল না, এই শহরের এই সব মানুষের সঙ্গে ভজনলাল অথবা বনওয়ারীলালের সম্পর্ক কোথায় ? তবে তেনাদের নামের জোরে যে এখানেও কাজ সিদ্ধ হয় সেটা বোঝা গেল আরও দু' দিন পর। ওই খুনখুনে বুড়োটা ওদের নিয়ে গেল বাঘার কাছে। ভজনলাল আর বনওয়ারীলালের নাম বলতেই বাঘা টেবিলের ওপর থেকে পা নামিয়ে চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস

করল, 'আপনারা ক'জন ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'আজ্ঞে চারজন। আমি আর গফুর, আর আমাদের বৌ।'

বাঘা লম্বা একটা সিগারেট মুখে দিয়ে পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'তার মানে দু'খানা ঘর চাই।'

নারাণ হাত কচলে বলল, 'আজ্ঞে স্যার, দু'খানা হলে তো বড়ই উপকার হয়।'

বাঘা বসেছিল একটা চায়ের দোকানে। এবার গলা তুলে হাঁক দিল, 'ন্যাপা, এখানে খান পাঁচেক চা চমকা। বিস্কুট চলবে ?'

নারাণ মাথা নাড়ল। বুড়োটা বলল, 'বাঘা, আমি এট্টু রুটি-আলুর দম খাই। সকালে পেটে কিছু পড়েনি।'

বাঘা বলল, 'যা খাবে খেয়ে যাও। আমি শালা যদ্দিন আছি তদ্দিন তোমাদের ভাবনা নেই। আজ চামড়াপট্টির কেসটা মেটাবো।'

নারাণ আর গফুর চা-বিস্কুট খেতে খেতে দেখে যেতে লাগল নানা বয়েসের লোকেরা খেপে-খেপে দোকানে এসে বাঘার সঙ্গে দেখা করছে, কথা কইছে আর চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বাঘার নাম করেই দোকানে বসে রুটি-তরকারি, ভাত-মাছের ঝোল অথবা চা-বিস্কুট খেয়ে চলে যাচ্ছে। নারাণ আর গফুর মনে মনে অস্থির হচ্ছে এই ভেবে যে, তাদের ঘরের কথা একবার জিজ্ঞেস করেই লোকটা থেমে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলে যাচ্ছে। লোকটা কি তাদের কথা ভুলে গেল ? মনে করিয়ে দেবার কথা তো সেই বুড়োটার। তা সেই বুড়ো পাউরুটি আর আলুর দম খাওয়ার পর এখন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। বুড়োটাও কি তাদের কথা ভুলে গেল ?

নারাণ আর গফুর পরস্পরের দিকে কয়েকবার তাকালেও বাঘাকে কিছু বলবার সাহস পেল না। এই সময়টুকুর মধ্যেই ওরা বুঝে গেছে বাঘা নামের লোকটার দাপট আছে। কেউ তার দিকে চোখ তুলে কথা কইবার সাহস পায় না। দোকানে যারা আসছে, কথা কইছে এবং চলে যাচ্ছে তারা সবাই এই লোকটাকে মান্যি করে।

অনেকক্ষণ পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাঘা। দোকানের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসা আরও জনা তিনেক ছেলে বাঘার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দোকানের বাইরে মোটর সাইকেল দাঁড় করানো ছিল। বাঘা তার ওপর বসতে বসতে ওই বুড়োটাকে বলল, 'হারুদা, ওদের নিয়ে এসো। আমি রেশন দোকানে আছি।'

গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে নারাণ আর গফুরের দিকে তাকিয়ে বাঘা বলল, 'আপনারা হারুদার সঙ্গে আসুন।'

মোটর সাইকেল চালিয়ে বাঘা চলে যেতেই হারু বলল, 'চলুন। ট্যাংরায় যেতে হবে।'

যেতে যেতে গফুর জিজ্ঞেস করল, 'এই বাঘাবাবু কী করেন ?'

হারু বলল, 'এখানে থাকলে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে। তবে মানুষটা বড্ড ভাল। মেজাজ ভাল থাকলে দেবতা। খেপে গেলে যা খুশি করতে পারে। ওকে ঘাঁটাবার সাহস পুলিশের নেই, নেতাদেরও নেই। ওর মন রেখে চলতে পারলে তোমাদের অসুবিধে হবে না।'

নারাণ মনে মনে হাসল। এই মন রাখারাখির ব্যাপারটা কদমখণ্ডীতেও আছে, আবার কলকাতাতেও রয়েছে।

সব জায়গাতেই কারও না কারও মন জুগিয়ে তাদের থাকতে হয়। তবে বাঘার মন জুগিয়ে থাকতে পারলে যে তাদের লাভ সেটা তো বোঝাই গেল। ট্যাংরার বস্তিতে ওদের

BanglaBook.org

থাকবার জন্যে দুটো ঘরের ব্যবস্থা বাঘাই করে দিল। মাসে চল্লিশ টাকা করে ভাড়া। দু'খানা ঘরের জন্যে আশি টাকা।

ঘর ঠিক করে দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বাঘা জিজ্ঞেস করল, 'ঘর তো হয়ে গেল। এবার ঘর ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া এসবের জন্যে তো কাজকর্মের ধান্দা করতে হবে। সে সব কিছু ভাবছেন ?'

উত্তর দেওয়ার আগে নারাণ একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'আজ্ঞে, সে নিয়ে তো ভাবছি। নতুন জায়গা, চেনা-জানা কেউ নেই। সদরহাটি ছাড়বার সময় স্যার বলেছিলেন—'

বাঁ হাতের আঙুলে শব্দ করে তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বাঘা। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন করল, 'স্যার কে ?'

নারাণ বলল, 'আজ্ঞে সদরহাটির ভজনলাল স্যার। ভজনলাল আর বনওয়ারীলাল দুই স্যারই আমাদের ভরসা দিয়ে এখানে পাঠালেন।'

বাঘা বলল, 'জানি। ওঁদের কলাকার স্ট্রিটের অফিসে আপনার খবর এসে গেছে। ওরাই আমাকে খবর দিয়েছে। দিন কয়েক থাকুন, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কদমখণ্ডীতে তো আর ফিরে যেতে পারবেন না।'

বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল ওদের। গফুর আর নারাণ দুজনেই এক সঙ্গে বাঘার মুখের দিকে তাকাল। গফুর জানতে চাইল, 'কেন ?'

বাঘা সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'আপনাদের নামে তো এফ আই আর হয়ে গেছে। ওখানকার পুলিশ খুঁজছে আপনাদের। পেলেই পেঁদিয়ে লক আপে ঢোকাবে। তারপর কোর্ট-ফোর্ট ঘুরিয়ে সাত-আট বছরের নামে হাজতে পুরে দেবে।'

গলা শুকিয়ে এল ওদের। নারাণ ঢোঁক গিলে নিয়ে বলল, 'আমরা তো কিছু করিনি। শুধু গণ্ডগোল শুনে ছুটে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে তো...'

বাঘা বলল, 'ও সব কথায় তো চিঁড়ে ভিজবে না। পুলিশ অন্য মাল। সাঁওতালদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ যাঁদের খুঁজছে তাদের মধ্যে আপনারাও আছেন। ওই জন্যেই তো আপনাদের স্যাররা কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

নারাণ বলল, 'পুলিশ কি আমাদের খুঁজতে এখানেও আসতে পারে ?'

বাঘা বলল, 'অসম্ভব নয়। ইচ্ছে করলে সবই পারে। তবে এটা হচ্ছে আমার এলাকা। এখানে আমি না চাইলে কারও গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা পুলিশের বাপেরও নেই। সেপাই থেকে বড়বাবু আর বড়বাবু থেকে বড় বড় চাঁই সবারই টিকির একটা ডগা আমার কাছে বাঁধা। এখানে আপনাদের কোন ভয় নেই।'

বাঘার কথাতে খানিকটা ভরসা পেলেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না গফুর। সাপের খোলসের মতো একটা ভয় আর উৎকণ্ঠা তাদের জড়িয়ে রাখল। রাত্রে বারান্দায় শুয়ে মিলের ভোঁ শুনল। রেল চলার শব্দ তো সব সময়ই শোনা যায় ঘর থেকে। রেলের শব্দ আর চামড়ার গন্ধ দুটো জিনিস এখানে বড় সহজ। কিন্তু এখানে ঘুম আসে না। কদমখণ্ডীর মতো স্তব্ধ এবং নিঝুম রাত এখানে আসে না। মনে হয় এই শহরটা কখনও ঘুমোয় না। কেউ না কেউ জেগেই থাকে। রাস্তা দিয়ে সারা রাত গাড়ি চলার শব্দ, কুকুরের কান্না, মানুষের টলোমলো কণ্ঠের বিলাপ সব নিয়ে শহরটা যেন দানবের মতো চোখ খুলে দাঁড়িয়েই থাকে।

চোখের পাতা বুজতে পারে না নারাণও। চোখ বুজলেই কদমখণ্ডী গ্রামটা তার চোখ

BanglaBook.org

জুড়ে ভাসতে থাকে। তারপর এক-এক করে ভেসে আসে সেই সব ভয়ানক ঘটনাগুলো। ধলাভাঙার সাঁওতাল পল্লী জ্বলছে। সবকটা ঘর জুড়ে আগুন, ধোঁয়া, মানুষের চিৎকার আর জ্বলন্ত ঘরগুলোর ভিতর থেকে বাঁশ ফাটার ফট-ফট আওয়াজ। আগুন দেখে মানুষ ছুটে এসেছিল ধলাভাঙা মোল্লাপাড়া আর কদমখণ্ডী থেকেও। মোল্লাপাড়ার মসজিদের মোয়াজ্জিন এশার আজান দিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। মশারির মধ্যে ঢুকলেও তখনও তার চোখে ঘুম আসেনি। চিৎকার শুনে সেও ছুটে বাইরে বেরিয়েছিল। আগুনের শিখা দেখে চিৎকার করতে করতে সেও ছুটে এসেছিল সাঁওতাল পল্লীতে। গ্রামে জলের বড় অভাব। পুকুরগুলো অনাবৃষ্টিতে মজে আছে। অথচ জল ছাড়া এই আগুন নেভাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু কোথায় জল ? মোল্লাপাড়া আর কদমখণ্ডীর মানুষরা রাত্রের অন্ধকারে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করেছে আর চিৎকার করে আল্লাকে ডেকেছে কিন্তু কয়েক বালতির বেশি জল জোটেনি। অথচ চোখের জলের কোন খরা নেই। দু' চোখ ভেসে গেছে গাঁয়ের মানুষদের। তারা অসহায়ের মতো দেখেছে সাঁওতালদের ঘরগুলো আগুনে জ্বলে-জ্বলে ভেঙে পড়ছে। বুকফাটা আর্তনাদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে মংলুর বৌ বরখে। ঘরের মধ্যে পুড়ছে মংলুর অতি বৃদ্ধা মা, পুড়ছে পাঁচ মাসের শিশু। সনাতন, আফজল, রতন দলুই আর মোল্লাপাড়ার রশিদ গায়ে একফালি ত্রেপল জড়িয়ে জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে কয়েকজনকে বার করে এনেছে। কিন্তু তাতে আগুনের আক্রোশ মেটেনি। সবার চোখের সামনেই পল্লীটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। থোকা-থোকা আগুন, অন্তহীন কান্না আর হাহাকার ছাড়া আর যা রইল তা হল কালো কালো ছাই। বিভীষিকা ঘেরা সেই রাত্রি আস্তে আস্তে শেষ হল। ফজরের আজানের পর সকালের প্রথম আলো এসে পড়ল সাঁওতাল পল্লীর ওপর। দিনের আলোয় রাত্রের সত্যটা আরও নিষ্ঠুর হয়ে সবার চোখে ভেসে উঠল। দগ্ধ খাটিয়া, পোড়া কাঠ, মাটির জালার অগুন্তি টুকরো, দগ্ধ আসবাবপত্রের বিকৃত চেহারার মধ্যে পড়ে আছে শিশু আর বৃদ্ধার পোড়া শরীর। সবার চোখ তখন স্থির, আর সেই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। কারও মুখে কোন কথা নেই। সাঁওতাল পল্লীর যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তারা যেন বোবা হয়ে গেছে। চরম শোক বুঝি মানুষের কথাও কেড়ে নেয়।

কিন্তু এই শোক মধ্য দুপুরে আতঙ্কের চেহারা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাঁয়ের ওপর। পুলিশ কোথা থেকে কী খবর পেয়েছে কে জানে, তারা দল বেঁধে এল। মোল্লাপাড়া আর কদমখণ্ডীর ছেলেদের চুলের মুঠি ধরে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারতে-মারতে গাড়িতে তুলতে লাগল। গফুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই দোকান থেকে লাফ দিয়ে নেমে পেছনের দরজা দিয়ে কলাবাগানের ভিতরে এল। পুলিশ তখন গফুরের দোকানে ঢুকে জিনিসপত্র তছনচ করছে। কিছু-কিছু জিনিস তুলে নিচ্ছে গাড়িতে। বিপদ বুঝে গফুর বাঁশ বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে চলে এল নারাণের বাড়িতে। মিনিটখানেক কথা বলার পরই নারাণ দেখল চারজন পুলিশ ধেই ধেই করে ঢুকে পড়ছে তার উঠোনে। সেই মুহূর্তে গফুর নারাণের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বলেছিল, 'নারাণ, পাইলে আয়।'

বাড়ির পিছন দিয়ে গফুরের সঙ্গে নারাণ দৌড়ল। তারপর এল সদরহাটিতে ভজনলালের গদিতে। ওদের কাছে তখন মনে হয়েছিল তিনিই ওদের বিপদতারণ। তিনিই পয়গম্বর। তিনিই উদ্ধারকর্তা।

ভজনলাল আর বনওয়ারীলালের দয়ার শরীর। নারাণ আর গফুরকে দেখে ভজনলাল বললেন, 'কী ব্যাপার ? তোমরা ?'

নারাণ নিজেদের বিপদের কথাটা ভজনলালকে বলল। গদিতে ভজনলালের পাশেই বসে ছিলেন বনওয়ারীলাল। সব শুনে বনওয়ারীলাল ভজনলালকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ভজন ভাই, নারাণ আমাদের লোক। বাঘমারির জঙ্গলে ওকে আমরা কাজ দিয়েছি।-ওকে আমাদের বাঁচাতে হবে।'

নারাণ বলল, 'স্যার, আমার মতো গফুরেরও বিপদ। ওকেও আপনাদের দেখতে হবে স্যার। ও আমার বন্ধু।'

ভজনলাল পান পরাগ চিবুতে চিবুতে বললেন, 'আমি তোমাদের গাঁয়ের সবাইকে ভালবাসি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তোমরা লোক চিনতে পার না। ওই দুর্গাবাবু আর কাদের মিঞা ওরা তলায়-তলায় একজোট হয়ে আছে। ওরাই তোমাদের ডোবাচ্ছে।'

নারাণ আর গফুরের বুকের মধ্যে তখন থরথর উত্তেজনা। ওরা সেইভাবে ভজনলাল আর বনওয়ারীলালের দিকে তাকাল। ভজনলাল হঠাৎ টেলিফোন তুলে কোথায় যেন ফোন করলেন। হিন্দি আর ইংরেজিতে কিছুক্ষণ কথা বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। ভজনলালকে খুব চিন্তিত দেখাল। ইংরেজিতে বনওয়ারীলালের সঙ্গে একটু কথা বলে নিয়ে ভজনলাল বললেন, 'তোমাদের দু'জনের গ্রামে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন সময় পুলিশ তোমাদের ধরতে পারে। একবার পুলিশ ধরলে, পুলিশের খাতায় নাম উঠলে তোমাদের খুব ক্ষতি হবে। তোমরা...'

ভজনলাল থেমে গেলেন। থেমে গিয়ে ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, 'তুমি আর গফুর যত তাড়াতাড়ি পার কলকাতা চলে যাও।'

'কলকাতা!' নারাণ আর গফুর দুজনের গলাতেই বিস্ময় ঝরে পড়ল।

ভজনলাল বললেন, 'হ্যাঁ, কলকাতা। যা ব্যবস্থা করার সব আমি করে দিচ্ছি। এখন তোমরা এইখানে থাক।'

ভজনলালের গদিঘরের পিছনে চওড়া বারান্দা। ওই বারান্দা থেকে দোতালায় ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে ছোট্ট একটা ঘর। বারান্দায় দাঁড়ালেও চট করে বোঝবার উপায় নেই যে ওখানে একখানা ঘর আছে। সেই ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হল নারাণ আর গফুরের। দুপুরে সদরহাটির হোটেল থেকে ভাত, আলুভাজা আর ডিমের তরকারি আনিয়ে দিলেন গুরুচরণবাবু। পেটের খিদে মিটলেও মনে শান্তি ছিল না ওদের। বাড়ির জন্য মনটা ছটফট করছিল। ওরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল আর ভিতরের উথাল-পাতাল দুশ্চিন্তাকে সামাল দেবার জন্য ঘনঘন বিড়ি খেয়ে যাচ্ছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ গুরুচরণবাবু ঘরে এলেন। ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার একটু পরে তোমাদের ডাকবেন। তোমাদের হয়তো আজ রাতেই কলকাতা রওনা দিতে হবে।'

'আজ রাতেই!' উৎকণ্ঠা আর বিস্ময় যেন গলা বুজিয়ে দিচ্ছে ওদের। বাড়িতে ওদের বৌ আছে। গফুরের বৌ ছাড়াও রয়েছে বুড়ো বাবা-মা। ওরা তো জানতেও পারবে না নারাণ আর গফুর কোথায় গেল। তাই আমতা-আমতা করে নারাণ বলল, 'কিন্তু বাড়িতে তো...'

গুরুচরণবাবু বললেন, 'সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। স্যারের সব দিকে নজর থাকে।'

স্যারের নজর যে সব দিকে থাকে তার প্রমাণ পেতে দেরি হল না। বেলা চারটে নাগাদ ভজনলাল স্যার বললেন, 'আমি একটা জিপগাড়ি দিচ্ছি। ওই গাড়ি করে তোমরা কদমখণ্ডীতে গিয়ে তোমাদের যা কিছু সঙ্গে নেবার সে সব নিয়ে চলে এসো। বৌকেও

BanglaBook.org

এনো। বাড়িতে তালা দিয়ে এসো। একদম দেরি করবে না। রাতের বাসেই তোমাদের কলকাতা পালাতে হবে।'

গফুর বলল, 'কিন্তু জিপ থেকে নামলেই যদি পুলিশ ধরে।'

ভজনলাল গম্ভীর গলায় বললেন, 'ধরবে না। আমার ড্রাইভারকে সব বলা আছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। আর যদি আসতে না চাও, গ্রামেই থাকতে চাও তাহলে ড্রাইভারকে সেটা জানিয়ে দেবে। তোমরা তোমাদের দায়িত্বে থাকবে। আমার আর কোনও দায় নেই। ধোবিডাঙার সাঁওতাল কিংবা পুলিশ কেউ মারলে কিংবা জেলে পাঠালে আমি কিছু করতে পারব না।'

ভজনলাল স্যারের অবাধ্য হবার সাহস ছিল না ওদের। আর কোন ভরসাতেই বা অবাধ্য হবে। স্যার তো তাদের ভালোর জন্যই এ সব করছেন। অতএব, সন্ধ্যার অনেক আগেই ওরা বৌ সঙ্গে করে ফিরে এল। ভজনলাল আর বনওয়ারীলাল তখন পাশাপাশি বসে। বনওয়ারীলাল ওদের বৌদের দিকে একবার তাকিয়ে গুরুচরণবাবুকে বললেন, 'মজুমদারবাবু, মায়েদের অন্য ঘরে নিয়ে বসান।'

বৌরা গিয়ে বসল অন্য ঘরে। বনওয়ারীলাল বললেন, 'ঘরে তালা দিয়ে এসেছো তো?'

নারাণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বনওয়ারীলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়িতে কোনও দামি জিনিসপত্র রেখে আসোনি তো? যেমন টাকাপয়সা, সোনা-দানা, দলিল বা ওই রকম কিছু?'

নারাণ বলল, 'দামি জিনিসপত্তর কিছু নেই। দু'তিনখানা থালা-বাসন ছিল নিয়ে এয়েছি। আর ভিটের দলিলটা।'

বনওয়ারীলাল এবার তাকালেন গফুরের দিকে। গফুর বলল, 'বাবা বাড়িতে ছিল না। আমি শুধু ওই গুরুচরণবাবুর কথা মতন বাক্সো খুলে ভিটে আর ওই বড় মসজিদের পাশে আমাদের যে জমিটা, যা নিয়ে কাদের মিঞা ঘোট পাকাচ্ছে ওগুলো সঙ্গে এনেছি। মা বলল, ও গুলো তোর কাছেই রাখ। গাঁয়ের কোনও ভরসা নেই। কবে কোন রাত্তিরে কে ঘরে আগুন দেবে, কে বুকে বল্লম ঠেকিয়ে সব কেড়ে নেবে সে কথা খোদা ছাড়া কেউ জানে না।'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'তোমার মা খুব বুদ্ধিমতী। তিনি গাঁয়ের মেজাজটা ধরতে পেরেছেন। এ সবের পিছনে শুধু দুর্গাবাবু আর কাদের মিঞারাই নেই। কদমখণ্ডীর চৌধুরীমশাই, বিলকান্দার ঘোষালরাও আছেন। ওঁরা সব পারেন।'

ভজনলাল স্যার মাথা নেড়ে কথাটায় সায় দিলেন। টেলিফোন ধরবার জন্য উঠে যেতে যেতে বললেন, 'তোমাদের কোনও ভাবনা নেই। শুধু হাঙ্গামা না মেটা পর্যন্ত কলকাতায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে।'

বনওয়ারীলাল বললেন, 'কদমখণ্ডীতে আছেটাই বা কী? পরের জমিতে কাজ করে দিন কাটে। এখানে থাকলে তোমাদের ছেলে-মেয়েরাও তাই হবে। যে ফুলে মধু নেই, সেই ফুলে প্রজাপতি আসে না। আমরা তো কাজের ধান্দায় নিজেদের মুলুক ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছি। এখন আছি সদরহাটিতে। এখানে রোজগারপাতি তেমন না হলে এ জায়গাও ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব।'

টেলিফোনে কথা বলা শেষ করে ভজনলাল ফিরে এলেন গম্ভীর মুখে। বললেন, 'এস পি সাহেব ফোন করেছিলেন। কদমখণ্ডী আর ধলাডাঙায় আরও ফোর্স পাঠাচ্ছে। আজ

BanglaBook.org

রাতেই ধোপীডাঙার সাঁওতালরা মুসলমানদের অ্যাটাক করতে পারে।'

গফুর আর নারাণ ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠল। ওদের পেটের মধ্যে কেমন যেন একটা হচ্ছে। গলা শুকিয়ে আসছে। ওরা আর্তের মতো চোখ তুলে দুই স্যারের দিকে তাকাল। ভজনলাল ওদের চোখের ভাষা বুঝে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের কোনও ভয় নেই। গুরুচরণ চিঠি দিয়ে দেবে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি ওখানেই তোমাদের কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করব। তোফা থাকবে। ছুটি-ছাটায় গাঁয়ে বেড়াতে আসবে।'

একসঙ্গে অনেকগুলো দুর্ভাবনা ঘিরে রেখেছে ওদের। এখন কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ সে হিসেব বুঝতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে এই দুই স্যার বড় দয়ালু। অন্যের বিপদে নিজেই এগিয়ে এসেছেন।

বাসে ওঠাবার আগে গুরুচরণ চিঠি দিলেন। ভজনলাল দুজনকে তিনশো করে টাকাও দিয়ে দিলেন। ভিন দেশে কোথায় থাকবে, কোথায় যাবে এই সব ভেবে ওরা দুজনেই ভিটে-জমির কাগজপত্র রেখে দিল ভজনলালের কাছে। ভজনলাল নিজেই বললেন, 'ওগুলো নিয়ে অচেনা জায়গায় কেন ঘুরবে। ওগুলো আমার সিন্দুকে রেখে দিচ্ছি। কদমখণ্ডী, ধলাডাঙা, মোল্লাপাড়া, পলাশডাঙা আর বিলকান্দার বহু লোক গণ্ডগোল দেখে ও সব জিনিস আমাদের কাছে রেখে গেছে। যদি হাঙ্গামায় ঘরবাড়ি পুড়ে যায় তাহলে তো সবই গেল। পোড়াজমিতে নতুন বাড়ি তোলা যায়, কিন্তু ওই জমিটা যে তোমার, সেটা প্রমাণ করবে কেমন করে।'

ভজনলাল আর বনওয়ারীলালের কথার মধ্যে যে আশ্বাস আর ভরসা ছিল এখন, এই মুহূর্তে নারাণ আর গফুরের কাছে তার মূল্য অনেক। ওরা রুটি আর আলুর দম খেয়ে রাতের বাসে উঠে পড়েছিল। যে বাস যাবে কলকাতা নামের মস্ত শহরে। ওই শহর বড় সুন্দর, বড় নিরাপদ। বনওয়ারীলাল আর ভজনলালের মতো গুরুচরণবাবু বাসে তুলে দেবার সময়ও বলেছিলেন, 'কলকাতা তোদের কদমখণ্ডীর মতো নয়। ওখানে এত লাঠালাঠি নেই, অজন্মার দুঃখ নেই, এক ফোঁটা জলের জন্যে আকাশের দয়া ভিক্ষা করতে হয় না। ওই শহর গিয়ে লোকেরা ভাগ্য বদলে ফেলে। চেষ্টা থাকলে তোদের ভাগ্যও বদলে যাবে। তোরা মানুষ হয়ে যাবি। দু হাতে টাকা কামাবি।'

বাস যখন জয়পুরের অন্ধকার জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছিল তখন গুরুচরণবাবুর কথাগুলো নারাণের বুকের মধ্যে ছোট-ছোট ঢেউ তুলছিল। সে শুধু ফিসফিসিয়ে গফুরকে বলেছিল, 'গফুর, কলকাতা কি আমাদের ভাগ্য বদলে দেবে?'

গফুর অন্ধকার জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে উত্তর দিয়েছিল, 'আব্বাজানের জন্য বড্ড ভাবনা হচ্ছে। আমার আব্বা বড্ড সরল।'

গফুর বাঁ হাতে কপাল টিপে ধরে মাথা নিচু করল। নারাণ দেখল জানালার পাশে ঘন জঙ্গল আর অন্ধকার। তারই মধ্য দিয়ে বাসটা ছুটে যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

॥ ৭ ॥

কলকাতার জীবনে অভ্যস্ত হতে বেশি দিন সময় লাগল না ওদের। গফুরের কথাই ঠিক, শহরটা যেন মায়াবি দৈত্যের মতো, চোখের টানে আস্তে আস্তে কাছে আনে তারপর গোটা শরীরটা গিলে নেয়। এই শহরও ওদের গিলে নিল। জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে টিনের কৌটো তৈরির ফ্যাকটরিতে নারাণের কাজ জুটে গেল। গফুরকে বাঘা নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিল ট্যাংরার জুতো তৈরির কারবারে। দুটো জায়গাতেই যাঁদের নামের জোরে ওদের কাজ হয়ে গেল তাঁরা হলেন ভজনলাল আর বনওয়ারীলাল। কদমখণ্ডীর মাটির সঙ্গে ওদের যে নাড়ির টান সেই টান এখন আলগা হয়ে এসেছে। এখন শুধু কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পর রাতের বেলা কখনও কখনও কদমখণ্ডীর কথা মনে পড়ে। মনে হয়, একটিবার গাঁয়ে গেলে কেমন হয়! শোক, দুঃখ, অনাহার আর অজন্মা যাই থাক, তবু কদমখণ্ডীকে এই দেড় বছরেও ভুলতে পারল না নারাণ। থেকে থেকে তার বুকের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়ায় একখানা দরিদ্র গ্রাম, তার নাম কদমখণ্ডী। তবুও সেখানে যেতে পারে না। ভজনলাল স্যার বলে রেখেছেন, আমি না বললে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াবে না। এখনও নাকি পুলিশের খাতায় ওদের নাম কাটা হয়নি। অদেখা এমনই জিনিস যে, তাতে অনেক আবেগ শুকিয়ে আসে। তাই কদমখণ্ডীর টান ক্রমে-ক্রমে শিথিল হয়।

কদমখণ্ডী নিয়ে গফুরের বুকে শুধু জ্বালা আছে। ওই গাঁয়ের ধুলোমাটির সঙ্গে তার রক্তের দোস্তি। তবুও ওই গাঁ তাকে অনাথ করে দিয়েছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। শোকে, দুঃখে আর অপমানে আব্বা মরেছে নিজের পোড়া ভিটেয়। এ সব কেন হল, কে করল গফুর জানে না। সে শুধু জানে, ওই গাঁয়ে আজ আর তার কেউ নেই, কোনও টান নেই।

ভজনলাল খবর পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'গফুর, তোমার মাকে কি কলকাতায় পাঠিয়ে দেব?'

গফুর তাই চেয়েছিল, কিন্তু মা আসেনি। স্বামীর পোড়া ভিটেতে গফুরের মা একাই থেকে গেছেন। ভয় পাবার মতো কোন ভয় আজ আর তাঁর নেই। তিনি শুধু মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকান, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তারপর মুখটা আস্তে আস্তে নীচে নামিয়ে এনে অস্ফুটে বলেন, 'আল্লা!'

কিন্তু আল্লা বা ভগবান যে কোথায় থাকেন তার হদিশ কেউ জানে না। অনাদি-অনন্তকাল থেকে বিপন্ন, অসহায় মানুষ ঈশ্বরকে খোঁজবার জন্য আকাশের দিকে তাকান। কিন্তু ওই আকাশে তো শুধু মেঘ, রৌদ্র আর চাঁদ-তারাদের দেখা যায়। কখনও ঈশ্বরের মুখ কেউ দেখেছে কি না সে কথা নারাণরা জানে না। তবু আকাশের দিকে মুখ তুলে ঈশ্বরকে খোঁজার বিরাম নেই।

কাজ থেকে ফিরে নারাণ দেখতে পায় বারান্দার ওপর কাঁথায় শুয়ে একা-একাই খেলছে তার ছেলে। উল্টোদিকের ঘর থেকে গফুরের ছেলেমেয়ের কান্না ভেসে আসে। এ রকমই রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘটে। গফুরের কাজ থেকে ফিরতে দেরি হয়। গফুর আস্তে আস্তে বদলে গেছে। শোক ওকে কিছুটা বদলে দিয়েছে। একদিন গফুর বিড়ি খেতে খেতে বলল, 'নারাণ, আমার মতো মোচলমানদের ইন্ডিয়া ছেড়ে বাংলাদেশেই চলে যাওয়া উচিত।'

নারাণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এ সব কথা বলছিস কেন?'

BanglaBook.org

গফুর বলে, 'আগে কখনও ভাবিনি। কিন্তু এখন মনে হয় আমার বাপ থেকে গিয়ে ভুল করেছে। নিজেকে কেমন যেন পরগাছা-পরগাছা লাগে। একটা গোপন ভয় সব সময় বুকের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।'

নারাণ বলল, 'এখানে তো কত মুসলমান থাকে। সবাই কি ভয়ে-ভয়ে থাকে?'

গফুর বলল, 'ভয় পায় বলেই তোয়াজ করে থাকতে হয়। আমাদের কারখানার লোকেরাও তাই বলে।

নারাণ বলে, 'না-না, এটা ঠিক কথা নয়। এই শহরে কত মুসলমান থাকে। ঈদ-মহরমে কত উৎসব হয়, তেমনটা তো কদমখণ্ডীতেও হতো না।'

গফুর চুপ করে থাকে। তার মনে হয়, নারাণকে সে বোঝাতে পারবে না। হিন্দুস্থানের কোনও হিন্দুকেই এ জিনিস বোঝানো যাবে না। কদমখণ্ডীতে থাকতে এমন করে টের পাওয়া যেত না, কিন্তু কলকাতায় সেটা অনুভব করা যায়। এখানে মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক তার বাঁধন বড় আলগা। কদমখণ্ডীতে হিঁদু আর মোচলমানদের মধ্যে যে কোনও ভেদ আছে সেটা অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতেই পারেনি গফুর। নারাণ, আফজল, সনাতন, রশিদ এরা যে এক নয় এ কথা গফুরদের কখনও মনে হয়নি। হিন্দু আর মুসলমান এই দুটো জাত, তাদের ধর্ম, তাদের আচার-বিচার এ সব নিয়ে কদমখণ্ডীর কোনও মুসলমানদের কখনও ভাবতে দেখেনি গফুর। তার মনে হত, এ রকমই তো হয়। নানা জাতের মানুষ নিয়েই তো সংসার। মানুষ তো সুখে, দুঃখে, পালা-পার্বণে মানুষকে নিয়েই বাঁচে। বাঘমারির জঙ্গলে যেমন নানা জাতের গাছ, লতা আর ঝোপ-ঝাড়, দুনিয়ার মাটিতে তেমনই তো নানা জাতের মানুষ। সবাই এই মাটির কাছে ঋণী। মাটি কাউকে তাড়ায় না। গাছ কখনও অন্য গাছকে উৎখাত করে না। তেমনই মানুষ কখনও অন্য মানুষকে ভিটে ছাড়া করে না, করতে পারে না। দূরদেশে কোথাও দাঙ্গা বাঁধলে তাদের দোকানে বসে গাঁয়ের মুসলমানরা দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা করত। কেউ কেউ চাপা গলায় হিঁদুদের গাল পাড়তো। কিন্তু সে কখনও হিঁদুদের মধ্যে কোন খারাপ কিছু দেখেনি। দোষে-গুণে মানুষ। হিঁদুরা তো খোদার দোসর নয় যে, তাদের মধ্যে কোনও দোষ থাকবে না। নারাণের সঙ্গে যে তার এত দোস্তি, তা সেই নারাণের সঙ্গেও তো তার কতবার ঝগড়া হয়েছে, আবার ভাবও হয়ে গেছে। মানুষে-মানুষে অমন জিনিস হয়েই থাকে। কিন্তু তাই বলে মানুষ মানুষকে কাটে, পোড়ায়, ভিটে থেকে উৎখাত করে এ আবার কেমন জিনিস। অথচ এই জিনিস নানা দেশে কতবার হয়ে গেল। এ দেশের মানুষ ও দেশে পালিয়ে বাঁচল, ও দেশের মানুষ এ দেশে এসে স্বস্তি পেল। মানুষের দেশ বদলে গেল, চিরজন্মের ঠিকানা বদল হল। মানুষের মা নাকি বদল হয় না। দেশ তো মায়ের মতো। সেই মা এখন হামেশাই নাকি বদলে বদলে যায়। মানুষ জন্মভূমি ছেড়ে পরদেশী হয়ে নানা ঠিকানায় ঘুরে বেড়ায়। কদমখণ্ডীর চেনা গাঁয়ের ছোট্ট চৌহদ্দিতে এতকাল থেকে গফুর যে কথাগুলোর মর্ম বুঝতে পারেনি কলকাতার মতো বড় শহরটা তাকে ধীরে ধীরে সেই মর্ম বুঝিয়ে দেয়। ট্যাংরা তো কদমখণ্ডী নয়, তবু সে বুঝতে পারে এখানে নারাণের সঙ্গে তার তফাত আছে। কদমখণ্ডীতে মহরমের লাঠি খেলায় নারাণরা ওদের সঙ্গে থাকতো। কিন্তু ট্যাংরাতে কোনও হিঁদুকে কেউ ডাকে না। কদমখণ্ডীর চৌধুরীদের আঙিনায় আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজো হত। অষ্টমীতে খিচুরি প্রসাদ লাইন করে বসে খেত গফুর, নারাণ, বিশু, আফজল, সনাতন আর রশিদরা। এখানে কি তেমন ধারা আছে? হয় তো আছে, কিন্তু গফুর তা জানে না। অচেনা শহরের সব কথা সে জানবে

কেমন করে। সে শুধু টের পায়, তার মধ্যে নতুন একটা ভয় জন্ম নিয়েছে। জলের ওপর ছিপের ফাতনার মতো সেই ভয়টা সর্বদা জেগে থাকে, যা কদমখণ্ডীতে কখনও হতো না।

জুতো কারখানার আব্দুল বলে, 'হিঁদুদের বিশ্বাস করবি না। বিশেষ করে ও দেশ থেকে আসা বাঙালগুলোকে। ওরা সুযোগ পেলে মোচলমানদের কচুকাটা করবে।'

গফুর তাজ্জব বনে গিয়ে বলে, 'কেন ? কচুকাটা করবে কেন ?'

আব্দুল বলে, 'ওরা ভাবে মোচলমানদের জন্যই ওরা দেশ ছাড়া হয়েছে। তাই যত রাগ মোচলমানদের ওপর। ওরা কী বলে জানিস ?

গফুর বলে, 'কী বলে ?'

আব্দুল মুখে খইনি পুরে পিচ করে থুতু ফেলে। তারপর বলে, 'হিঁদুরা বলে, মোচলমান শুধু জুতোয় সিধে। কেন বলে জানিস ? ওরা বলে, আমাদের সঙ্গে মোচলমানদের সব উল্টো। আমরা পুবে মুখ রেখে সূর্য প্রণাম করি, ওরা পশ্চিমে মুখ রেখে নামাজ পড়ে। আমরা কলাপাতার সোজা দিকে খাই, ওরা উল্টোদিকে। আমরা ধুতি পরি আর পিছনে কাছা দিই, ওরা লুঙি পরে ওতে কাছার বালাই নেই। শুধু জুতোটা আমাদের মতো সিধে পড়ে। তাই ওরা বলে, মোচলমান জুতোয় সিধে।'

গফুর ভেবে দেখল এমন কথা সে কদমখণ্ডীতে কখনও কোনও হিঁদুর মুখে শোনেনি। কিন্তু এখন আব্দুলের মুখে শুনে আহত হল। এ সব কথা নিয়ে নারাণের সঙ্গে আলোচনা করতে তার খারাপ লাগে। নারাণও তো তারই মতো।

জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের কারখানায় যারা কাজ করে তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান নেই। কিছু বিহারি আর কিছু বাঙালি। বিহারি বন্ধুরা বলে, 'তুই শালা বুদ্ধু ! মুসলমান হল সাপের জাত। ধর্মের নামে ওরা সব করতে পারে। বাপ-দাদাকে খুন করে ওরা ক্ষমতা দখল করে। ওদের সঙ্গে পিরীত করলে দেখবি, একদিন তোর বৌকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে গেছে। ওরা ভারতবর্ষে থাকবে, খাবে, গণ্ডা-গণ্ডা বাচ্চা পয়দা করবে, একটার জায়গায় চারটে বিয়ে করবে অথচ মনে মনে পাকিস্তান আর বাংলাদেশকে মদত দেবে। বাংলাদেশ যে বিপ্লব ফলাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী আর ইন্ডিয়া না থাকলে বাংলাদেশ হত ! ইয়াহিয়া আর টিক্কা খান ওদের বিপ্লবের কবর খুঁড়ে দিত। অথচ, এখন ওই বাংলাদেশের লোকেরা ইন্ডিয়ার নাম শুনলে জ্বলতে থাকে। ওদের বেইমান ছাড়া কী বলবি ?'

নারাণ বড় বিপাকে পড়ে যায়। এত কথা, এত দ্বন্দ্ব তো কদমখণ্ডীতে থাকতে সে টের পায়নি। এরা এত সব কথা জানল কেমন করে। সে বড় বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে আসে। গফুরের ছেলের কান্না শুনতে পায়। সে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'রাবেয়া, ছেলেটা কাঁদছে কেন ?'

রাবেয়া তোলা উনুনে আগুন দিচ্ছিল। আঁচলে মুখ ঢেকে নাক টেনে বলে, 'ঘরে ধোঁয়া ঢুকলেই শাহজাদা কাঁদতে লাগে। তা ধোঁয়া বন্ধ করি কেমন করে বলো।'

নারাণ এগিয়ে গিয়ে গফুরের ছেলে আকবরকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে আসে। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, 'পরে গিয়ে নিয়ে আসিস।'

পদ্ম স্বামীর কোলে রাবেয়ার ছেলেকে দেখে বলে, 'একটাকেই সামলাতে পারছি নে, তুমি আবার আরেকটা নিয়ে এলে।'

নারাণ বলে, 'উনুনটা ধরে গেলেই নিয়ে যাবে। কতক্ষণের আর ব্যাপার।'

পদ্ম নিজের উনুনের ওপর চায়ের জল চাপাতে চাপাতে বলে, 'তা এটু আগে আঁচ

BanglaBook.org

দিলেই হয়। ভর সন্ধেতে আঁচ দেবার কী আছে।'

নারাণ পদ্মর ব্যবহারে খুশি হয় না বটে কিন্তু মুখে কিছু বলে না। সে বুঝতে পারে সবাই আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। এমনকি পদ্মও। রাবেয়ার পেটে সন্তান আসার খবর পেয়ে পদ্ম খুশিতে সারা উঠোনময় যেন নেচে বেড়িয়েছিল। কালীতলায় পুজো দিয়ে মানত করে এসেছিল। নারাণকে বলে বলে রাজি করিয়েছিল বিলকান্দার ষষ্ঠীতলায় যেতে। ওখানেও পুজো দিয়েছিল পদ্ম। কিন্তু আজকের পদ্ম কি কদমখণ্ডীর সেই পদ্ম? কদমখণ্ডীতে তো রোজ উনুন জ্বলতো না। খিদের কষ্ট ছিল তবু মানুষের প্রতি ভালবাসায় কোনও টান পড়েনি। কিন্তু এখানে দু বেলা উনুন জ্বলে। পেটে দেবার মতো কিছু খাবারও জোটে, অথচ টান পড়েছে ভালবাসায়। পদ্ম কদমখণ্ডীতে থাকতে রাবেয়াকে ছাড়া কোথাও যেত না। কিন্তু সেদিন বলল, 'ভোরবেলা কালীঘাটে যাবো। তুমি যেন গফুর ভাই আর রাবেয়াকে কিছু বলো না। ওদের নিয়ে তো কালীঘাটে যাওয়া যাবে না।'

নারাণ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন যাওয়া যাবে না? কালী তো মা। সবার মা। মা কি হিন্দু-মুসলমান দেখে?'

পদ্ম বলল, 'এটা তোমার কদমখণ্ডীর দরগা নয়, বিলকান্দার ষষ্ঠীতলাও নয়। এটা কলকাতা।'

নারাণ বুঝতে পারে না, কলকাতার জন্য কি আলাদা কোনও নিয়ম আছে? কলকাতার দেবতাদেরও কি জাত আছে?'

শেষপর্যন্ত হার মানতে হয় নারাণকেই। পদ্মর কথায় সায় দেয় ট্যাংরা বস্তির অনেকেই। ওরা বলে, তুমি কি হিন্দু হয়ে মক্কায় যেতে পার? তুমি কি চিৎপুরের নাখোদা মসজিদের ভিতরের ঘরে ঢুকতে পার?'

নারাণ থেমে যায়। দুনিয়ার কোথায় কোন আইন, কোন দেশের কেমন কানুন সে কথা নারাণ জানে না। সে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। সে কেবল বিশ্বাস করে, দুনিয়ার সব মানুষই এক। তফাত ধর্মের নয়, তফাত শুধু গরিব আর বড়লোকের। জগতে দুটোই কেবল জাত, একটার নাম বড়লোক, অন্যটার নাম গরিব। একদল দুনিয়ার সব পায়, একদল এক মুঠো ভাতের জন্য কেবলই দরজায়-দরজায় ঘোরে। একদল শরীরের ঘাম ঝরিয়ে আধকিলো চাল অথবা আটা কেনে, অন্যদল তাদের শরীরের ঘাম আর রক্ত নিঙড়ে নিয়ে ঘরে ঠাণ্ডা মেসিন বসায়, মুরগির ঠ্যাং খায় আর দেদার খাবার ফেলে দেয়। নতুন-নতুন কারবার ফাঁদে। দুনিয়া জুড়ে নাকি এমনই চলে। ট্যাংরা বস্তির পাশে ছোটদের যে ইস্কুল সেই ইস্কুলের মাস্টারের সঙ্গে নারাণের পরিচয় হয়েছে। পঞ্চাশ পেরুনো ওই ভদ্রলোক জন্মেছিলেন ময়মনসিংহের শেওড়ায়। শেওড়া থেকে ময়মনসিংহ স্টেশন মাত্র পনেরো বিশ মিনিটের পথ। পঞ্চাশ সালে মুসলমানদের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতা তখন তাঁর কাছে অচেনা শহর। থাকবার কোনও ঠাঁই নেই। এসে আশ্রয় পেলেন শিয়ালদা স্টেশনে। শরীর-মন তখন অসাড়। দেশ ছাড়ার পর থেকে মা'র মুখে কোনও কথা নেই।

'কেন নেই?' নারাণ প্রশ্ন করে।

নারাণের দিকে তাকিয়ে মাস্টারমশাই চুপ করে থাকেন। তার প্রশ্নটা তিনি শোনেন। তারপর তিনি বলেন, 'তখন আমার কতই বা বয়েস। জন্মেছি বেয়াল্লিশ সালে। তখন সবে আট বছর। বিপদ হতে পারে ভেবে আমার বড়দিকে, তখন তার বয়েস সতেরো

ছাড়িয়ে আঠারোতে, তাকে পাঠালেন মামার বাড়ি কিশোরগঞ্জে। কিশোরগঞ্জ আর ময়মনসিংহে তেমন গণ্ডগোল নেই, তবে একটা তীব্র আতঙ্ক আছে। হিন্দুরা কেউই ঘুমোতে পারে না। বাতাস এসে দরজায় ধাক্কা দিলে ভাবে মুসলমানরা আক্রমণ করতে এসেছে। বাবাকে কে যেন খবর দিয়েছিল, আপনার বড় মেয়েকে সামলে রাখবেন। বাবা সেই ভয়েই কিশোরগঞ্জে মামাদের কাছে বড়দিকে পাঠালেন। কিন্তু তিন দিন পরে খবর এল, একদল মুসলমান বাড়ি চড়াও হয়ে বড়দিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। পরদিন এক মাঠের মধ্যে বড়দিকে পাওয়া গেল। বড়দি নয়, বড়দির মৃতদেহ। চার-পাঁচজন মিলে তাকে ধর্ষণ করেছিল। তাতেই বড়দি মারা যায়। এরপরেই আমরা দেশ ছাড়ি। রিফিউজি হয়ে স্টেশনে শেয়াল-কুকুরের মতো রাত কাটাই। ওই স্টেশনেই আমার ছোড়দিকে, তখন ওর বয়স মাত্র চোদ্দ, তাকে একদিন আমাদের সবার সামনেই হাত ধরে টানল। কে টানল জানো? কোনও মুসলমান নয়। হিন্দুস্তানের পুলিশ। পুলিশ থেকে রাস্তার মাতাল, ভদ্রবাবু থেকে দালাল সবার কাছেই আমরা, আমাদের ঘরের মেয়েরা ছিল পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো ফালতু। কত মেয়ে অনাথ হয়ে গেল, কত মেয়ে পেটের জ্বালায় কলকাতায় এসে বেশ্যা হয়ে গেল। দেশ ভাগের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের গায়ে যদি আঁচড় লাগত, তাহলে?

নারাণ ফ্যালফ্যাল করে মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাস্টারমশাইয়ের চোখে জল চিকচিক করে ওঠে। অনেকক্ষণ পর নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি মুসলমানদের শত্রু ভাবেন?'

মাস্টারমশাই বলেন, 'না, একদম না। একটা সময়, বিশেষ করে বড়দি যখন ওইভাবে মারা গেল তখন মনে হত যে কোনও একটা মুসলমানকে যদি আমি খুন করতে পারি তা হলে বড়দির আত্মা শান্তি পাবে। তখন ওই অল্প বয়সে আম কাটার একটা ছুরি পকেটে নিয়ে ঘুরতাম। ভাবতাম এটা দিয়েই একটা মুসলমানকে মেরে ফেলা যায়। ময়মনসিংহের কাছে জুবিলি ঘাটে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। গাড়িনাপারেও কয়েকবার চক্কর দিলাম। কিন্তু মারবার মতো একটা মুসলমানকেও পেলাম না। বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, খবর পেয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছেন হোসেন চাচা আর আমিনা চাচি। ওঁরা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন আর বলছেন, 'মানুষের মধ্যে এখন কুত্তার দল ঢুকে গেছে। ওই কুত্তারা আমাদের মেয়েকে মেরেছে, বেইজ্জত করেছে। আসমানে যদি আল্লা থাকে তাহলে ওদের শাস্তি হবেই। ওরা শুধু মোসলমানদের নয়, মানুষদেরও কলঙ্ক।'

যাবার আগে হোসেন চাচা আমার বাবার পায়ে হাত রেখে বললেন, 'দাদা, আমার ভাইজান, দ্যাশ ছাইড়া যাইবেন না। আমাগো শরীরে রক্ত থাকতে কোনও কুত্তার বাচ্চা আপনেগো শরীরে টুকা মারতে পারব না। ন্যাতারা যা করছে করুক, আমরা তাগরে হাতের পুতুল না। আমরা এক হইয়া থাকলে এই বাংলা সত্যি সত্যি সুনার বাংলা হইব।'

হোসেন চাচা সেদিন কেঁদেছিলেন। আমিনা বিবিও। তবুও আমরা থাকতে ভরসা পাইনি। আমরা বুঝেছিলাম, হোসেন চাচা আর আমিনা চাচিও আমাদের মতো সাধারণ লোক। সাধারণ লোকের কোনও কথাই নেতাদের কানে যায় না। নেহরু থেকে জ্যোতি বসু কেউই সাধারণ গরিব লোকের কথা ভাবেনি। অথচ গরিব লোকদের নাম ভাঙিয়ে, তাদের পীরিত দেখিয়ে ওরা ভোটে জেতে। কেন না, ভারতবর্ষের ভোটারদের মধ্যে এখনও গরিব লোকদের সংখ্যা বেশি। অথচ দেশে গরিবদের কোন যোগ্য প্রতিনিধি নেই। দেশের মূল ক্ষমতা এখনও দেওয়া আছে সচ্ছল এবং উচ্চবিত্তদের হাতে।

BanglaBook.org

গরিবদের কথা তাঁরা কেমন করে বুঝবেন।'

স্কুলের মাস্টার বিজয় মিত্রের কথা ভাবতে ভাবতে নারাণ উদাস হয়ে যায়। সে ভাবে, দুনিয়াতে কত জায়গায় কত কিছু ঘটে যাচ্ছে অথচ সে কিছুই জানে না। বেশি জানলেই কি মনের বিপদ বাড়ে? যতদিন কদমখণ্ডীতে ছিল, ততদিন এমন কথা তার মাথায় ঢোকেনি। ঢোকাবার প্রয়োজনই হয়নি। কলকাতায় এসে অনেক নতুন কথা সে শুনতে পাচ্ছে। এ সব কথায় অবিশ্বাস বেড়ে যায়। মানুষের প্রতি ভালবাসায় টান ধরে। যেন সংসারে আর সমাজেও খরা দেখা দেয়।

নারাণ আস্তে আস্তে উঠে হাঁটতে থাকে। কলকাতার রাস্তা কখনও নির্জন হয় না। তাদের বস্তির মধ্যে গুমোট গরম আর স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার। চামড়ার গন্ধটা এখন নাকে সয়ে গেছে। নিজের বারান্দায় পা রাখতে গিয়ে গফুরের ঘরের দিকে তাকায়। দরজা খোলা, ঘরের ভিতর থেকে রাবেয়ার গলা শোনা যাচ্ছে। তার মানে গফুর এসে গেছে। নারাণ এগিয়ে গিয়ে গফুরের বারান্দার সামনে দাঁড়ায়। ডাকে, 'গফুর, গফুর।'

ভিতর থেকে গফুর সাড়া দেয়, 'ভিতরে আয়।'

নারাণ গফুরের ঘরে ঢোকে। গফুর ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছে। ও ছেলের নাম রেখেছে আকবর, কিন্তু আদর করে ডাকে শাহাজাদা বলে। রাবেয়া একটা বেতের মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলে, 'দাদা, বসেন।'

গফুর ছেলেকে রাবেয়ার কোলে দিয়ে বলে, 'তুই নাকি ওভারটাইম করছিস?'

নারাণ বলল, 'এই হপ্তায় কাজ বেশি। দু ঘণ্টা করে ওভারটাইম করতে হচ্ছে।'

গফুর বলে, 'আমাদের এখন ওসব বন্ধ। আবার জুলাই-আগস্ট থেকে শুরু হবে। হিঁদুদের দুগ্গাপুজো' আসছে তো।'

'হিঁদুদের দুগ্গাপুজো' শব্দটা নারাণের কানে লাগল। কদমখণ্ডীতেও তো ফি বছর দুগ্গাপুজো আসতো, ওটা যে শুধু হিঁদুদের তেমন ধারণা গফুরদের মধ্যে কখনও দানা বাঁধেনি। নারাণ বলল, 'কাল একবার বাঘাদার কাছে যেতে হবে। তুইও চল।'

গফুর বলল, 'কেন?'

নারাণ এবার মনে মনে চটে গেল। সে গলায় উষ্মা ফুটিয়ে বলল, 'কেন মানে? বস্তিমালিক হুমকি দিচ্ছে ভাড়া বাড়াবার। কিন্তু প্রথমে বলেছিল তিন বছরের মধ্যে ভাড়া বাড়বে না। কথার খেলাপ করলে তাকে বাঘাদা ছাড়া কে রুখবে?'

গফুর কোনও উৎসাহ দেখাল না। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'বাঘাদাও তো হিঁদু, বস্তির মালিকও হিঁদু। ওরা ভাড়া বাড়াবার কথা বলে মোসলমানদের হটাতে চাইছে।'

নারাণ অবাক হয়ে গেল। সে বলল, 'এসব কথা কে বলেছে?'

গফুর বলল, 'আমারও তো চেনাজানা লোক আছে। তারাও কিছু কিছু খবর রাখে। মালিকের পয়সা খেয়ে তোর বাঘাদা বছর তিনেক আগে দশঘর মোসলমানদের ভয় দেখিয়ে এই বস্তি থেকে উৎখাত করেছিল। এবারও তেমনই ফন্দি আঁটছে। কিন্তু...'

নারাণ স্থির চোখে গফুরের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু কী?'

গফুর বলল, 'কিন্তু পারবে না। মোসলমানরা এবার এককাট্টা হয়ে আছে।'

নারাণ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। রাবেয়া তাকে চা এনে দিল। চায়ের কাপ শেষ করে নারাণ বলল, 'গফুর, আমরা কিন্তু কোনও দলাদলিতে যাব না। যা বলবার ভজনলাল স্যার আর বনওয়ারীলাল স্যারকে বলব।'

BanglaBook.org

গফুর ম্লান হাসল। চায়ের কাপ দুটো সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আমি যদি হিঁদু হতুম তা হলে দলাদলির মধ্যে না গেলেও চলতো। মোসলমান বলেই মোসলমানদের সঙ্গে নাড়া বেঁধে থাকতে হবে। আলাদা হয়ে গেলে কেউ দেখবে না।'

নারাণ আহত গলায় বলল, 'তুই কি এখন আমাকে শুধু হিঁদু ভাবিস ? আর কোনও পরিচয় নেই আমার ?'

গফুর বলল, 'তোর কথা হচ্ছে না। তুই একা কী করবি। পদ্ম আর তুই মিলে কালীঘাটে গেলি। তুই পারলি আমাদের সঙ্গে নিতে ? আমিই কি পারব তোকে মক্কায় নিয়ে যেতে, হজ করাতে। হয় না নারাণ, হয় না। বড় গাছে যেমন বড় ঝড়, তেমনই বড় শহরে বড় পাপ বাসা বাঁধে। আল্লা আর ঈশ্বরের আইন আলাদা।'

নারাণ গফুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে গফুরের হৃদয়ে গভীর কোনও ক্ষত তৈরি হয়েছে। সেই ক্ষতটা তাকে জানতে হবে। সে উঠে পড়ে। ঘরের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এসে বলে, 'গফুর, আমার মনে হয় তোরও যাওয়া দরকার। এবার তুই ভেবে দ্যাখ।'

গফুর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ভেবে দেখবো।'

গফুর নিজে থেকে এল না দেখে আসার পথে নারাণ ওকে ডাকতে গেল। রাবেয়া বলল, 'যাও না একবার।'

গফুর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে এল নারাণের কাছে। বাঘা বসে ছিল ওর আড্ডায়। নারাণের সঙ্গে গফুরকে দেখে বলল, 'এই যে মানিকজোড়।'

নারাণের কথা শুনে বাঘা বলল, 'বাড়াবে বলছে, কিন্তু বাড়ায়নি তো ? আগের ভাড়াই তো দিয়ে যাচ্ছিস ?'

নারাণ মাথা নেড়ে সায় দিল। লম্বা একটা সিগারেট ধরিয়ে বাঘা তাকাল গফুরের দিকে। ওর মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'গফুর তো খুব লায়েক হয়েছিস। খালপারের মুন্নার সঙ্গে খুব আমড়াগাছি চলছে। পরশুদিন খেলার মাঠে মুন্নার ছেলেরা ক্ষুর-টুর নিয়ে খুব পাঁয়তাড়া করেছে। তোর মুন্নাকে বলে দিস, এ অঞ্চলটা আমার। আমার হাতে অনেক রকম দাওয়াই আছে। এত সকাল-সকাল যদি গোরে যেতে না চায় তো যেন চুপচাপ থাকে।'

গফুর একবার নারাণের দিকে তাকাল। নারাণ অবাক চোখে গফুরকে একবার দেখে নিয়ে বাঘার দিকে চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাঘাদা, মুন্না কে ?'

বাঘা উত্তর দিল, 'মস্তানের ধানি পটকা। আগে শ্যালদায় ছেনতাই করত। এখন মস্তান হয়ে এলাকার শের বনতে চাইছে। টক্কর নিতে আসে আমার ছেলেদের সঙ্গে। গফুরের মতো কিছু লোক ওকে সত্যি-সত্যি শের ভাবতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ওই মুন্না কি তোদের বাঁচাতে পারবে ?'

গফুর ক্ষীণ গলায় জবাব দিল, 'কে যে আমাদের বাঁচাতে চায় আর কে-ই বা বাঁচাতে পারে সেই কথাটাই জানি না। খালি ভয়ে ভয়ে থাকি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল বাঘার। বলল, 'কিসের ভয় ?'

গফুর একবার ঢোক গিলে নিয়ে উত্তর দিল, 'হিন্দুস্থানে মোসলমানদের যে ভয়। কেবলই মনে হয় কবে তাড়িয়ে দেবে, কবে কোন গণ্ডগোলে গর্দান যাবে। সবাই যেন এখানে কেমন ভাবে তাকায়।'

বাঘা প্রশ্ন করল, 'তোদের কদমখণ্ডীতে এ রকম ভয় হত ?'

BanglaBook.org

গফুর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'একেবারে না। তবে গাঁয়ে গণ্ডগোল লাগবার পর খুব ভয় হত।' এবার নারাণ বলল, 'গফুর প্রায়ই বলে এখানে নাকি নিজেকে পরগাছার মতো লাগে। একটা ভয় নাকি ওর বুকের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। এর চাইতে হিন্দুস্থান ছেড়ে বাংলাদেশে চলে যাওয়াই নাকি ভাল।'

বাঘা চোখ তুলে একবার গফুরকে আর একবার নারাণকে দেখল। তারপর শেষ হয়ে আসা সিগারেট থেকে নতুন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'একটা কথা বলব, শুনবি ?'

ওরা অবাক হয়ে তাকাল। বাঘা বলল, 'শুধু শুনলে হবে না, মনে রাখতে হবে। পারবি মনে রাখতে ?'

ওরা কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু বিমূঢ় দৃষ্টিতে বাঘার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঘা বলল, 'হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিংহল, আরব, আমেরিকা পৃথিবীতে যত দেশ আছে তার কোনও দেশটাই গরিবদের জন্য নয়। শুধুমাত্র গরিবদের জন্য আজও কোন দেশ তৈরি হয়নি। অতএব যাদের ট্যাঁকে পয়সা নেই, যাদের সঙ্গে মন্ত্রী-আমলাদের চেনাশোনা নেই, তাদের বলবার এবং ধরবার মতো কোন অবলম্বন নেই, মোদ্দা কথা যাদের খুঁটি নেই তারা সব দেশেই ভয়ে ভয়ে থাকে। কেউ ভয়ে মাথা নিচু করে থাকে, কেউ ভয়কে কেনবার জন্য টাকা খরচ করে, যেমন করছি আমি। বৌবাজারে একজনকে জানি, তার নাম রশীদ ভাই। মাসে লাখ টাকার ওপর খরচা করে মাসে মাসে ভয়কে কিনে নেয়। আমিও মাসে মাসে অনেক টাকা দিয়ে ভয় কিনি। তবুও আমার ভয় আছে। সে জন্যই তো সঙ্গে সাঙাত আর আর্মস নিয়ে ঘুরি। গরিব হয়ে জন্মালে তুই কোথাও গিয়ে নির্ভয়ে থাকতে পারবি না। ঢাকা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, খুলনা, করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি কোথাও না। সাহেবদের দেশেও না। শুধু কি তুই ভয়ে ভয়ে থাকিস ? সাদ্দাম হোসেন নেই ? সারা পৃথিবীতে তাই। বড় আর ধনী দেশগুলো গিলে খেতে চাইছে ছোট দেশদের। এটা একটা বড় দিঘি। কচি মাছগুলোকে বড় মাছগুলো সুযোগ পেলেই গিলে খাবে। যারা বেঁচে থাকবে তাদের ধরবে ডাঙার লোকেরা। বঁড়শি দিয়ে না হয় জাল ফেলে। তুই কোথায় পালাবি ? কোন দেশে ?'

অনেকক্ষণ কথা বলে বাঘা থামল। হাতের সিগারেট পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বাঘা সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, 'ডাটন, চা নিয়ে আয়।'

নারাণ আর গফুর নিঃশব্দে চা খেয়ে যেতে লাগল। চায়ের কাপ শেষ করে নারাণ বাঘার মুখের দিকে তাকাল। ওই মুখে কোনও পাপের চিহ্ন নজরে আসে না। অথচ লোকে বলে বাঘা নাকি মস্ত বড় খুনে। নিজের হাতেই বিশ-তিরিশ জনকে খুন করেছে। খুনিদের মুখের চেহারা কি মানুষদের মুখের থেকে আলাদা হয় ? নারাণ এ সব জানে না। বাঘাদাকে তার ভাল লাগে। মানুষের আপদে-বিপদে এই লোকটাই তো বুক পেতে দাঁড়ায়। এমন লোক কি কখনও খুনি হয় ?

নারাণ বিনীত গলায় বলল, 'বাঘাদা, আপনার কেন ভয় হবে ? পুলিশ থেকে মন্ত্রী সবাই তো আপনার চেনা। পুলিশরা পর্যন্ত আপনাকে খাতির করে।'

বাঘা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, 'মন্ত্রীরা খাতির করে বলে পুলিশও খাতির করে চলতে চায়। কিন্তু মন্ত্রী বদল হলে ? বাঁ হাতের জায়গায় ডান হাত এলে তখন কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয় তারপর ওই বাঁ ছেড়ে ডানে ঢুকে যাও। দুর্গাপুজোয় কী কী লাগে জানিস ?'

BanglaBook.org

এই কথার মধ্যে হঠাৎ দুর্গাপুজো কেন এল সেটা নারাণ ঠাহর করতে পারল না। সে বলল, 'ওই তো ফুল, বেলপাতা, বাদ্যি আর সব কি যেন লাগে।'

বাঘা বলল, 'আর যা-যা লাগে তার মধ্যে আছে গণিকালয়ের উঠোনের মাটি। ও না হলে পুজো সিদ্ধ হয় না। যেমন কালীপুজোয় 'কারণবারি' অর্থাৎ কিনা মদ দরকার হয়। তেমনই এখনকার রাজনীতি, দেশসেবা, ভোট, শ্রমিককল্যাণ, সরকারি ক্ষমতা দখলে রাখা সব কিছুতেই আমাদের মতো খুনে মস্তানদের দরকার হয়। আমরা না হলে রাজনীতির মারণযজ্ঞ শুদ্ধ হয় না। সুতরাং যত দিন দেশ, দেশসেবার ভড়ং, রাজনীতি, ভোট আর দলে দলে কোন্দল আছে ততদিন আমাদের দাম কমবে না। শুধু দল পাল্টা-পালটি চলবে।'

নারাণ আবার জানতে চায়, 'তাহলে আর ভয় কিসের ?'

বাঘা টেবিলের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিতে নিতে বলে, 'আছে-আছে, তবুও ভয় আছে। আমার চাইতে জাঁদরেল আর এফেকটিভ...'

হঠাৎ কথা থামিয়ে বাঘা নারাণকে প্রশ্ন করে, 'এফেকটিভ মানে বুঝিস ?'

নারাণ মাথা নাড়তে নাড়তে জানায়, সে জানে না। বাঘা বলে, 'মানে আমার চাইতেও কাজের লোক যদি ওরা খুঁজে পায় তাহলে আমি হঠাৎ করে একদিন খুন হয়ে যেতে পারি। কোনও শালাই তো তাদের পাপের সাক্ষীকে বিনা স্বার্থে বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। প্রয়োজন শেষ হলে আমাকেও রেয়াত করবে না। তাই শালা শকুনের মতো এলাকাটা আগলে রাখি। অন্য কাউকে বাড়তে দিই না।'

নারাণ আর গফুর যেন রূপকথার গল্প শুনছে এমনভাব করে বাঘার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঘা আবার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় মস্তান কারা বল তো ?'

ওরা দুজনেই চোখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। বাঘা বলে, 'দেশের প্রশাসক, মানে মন্ত্রী-টন্ত্রীরা, পুলিশ আর বড়-বড় ব্যবসাদাররা। যা কিছু ফায়দা ওরাই নিয়ে নেয়। আমরা ওদের এঁটো পাই। তবে তারও ভাগ দিতে হয়। আর তোরা ? তোরা তো মশা-মাছির মতো। কে ভাবছে তোদের কথা।'

নারাণ আহ্লাদের গলায় বলে, 'কেন আপনি তো ভাবেন। বস্তির সবাই আপনাকে মান্যি করে।'

বাঘা সিগারেটে টান দিয়ে বলে, 'আমার অত প্রেম-পীরিত নেই। আমাকেও একটা ছকে চলতে হয়। ছক উল্টে গেলে সব পীরিত শুকিয়ে যাবে।'

আরও খানিকক্ষণ বসে নারাণ আর গফুর উঠে পড়ে। গোটা রাস্তা হেঁটে আসতে আসতে গফুর বিশেষ কোনও কথা বলে না। শুধু একবার একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলে 'খাবি ?'

নারাণ সিগারেটটা নেয়। একবার টান দিয়ে বলে, 'বাঘা বড় নতুন-নতুন কথা বলে।'

গফুর বলে, 'তাতে আমার ভয় বাড়ে বই কমে না।'

নারাণ বিরক্ত গলায় বলে ওঠে, 'তোর কেবলই ভয়। এত ভয় কেন ?'

গফুর উত্তর দেয়, 'তোকে বোঝানো যাবে না। তুই বুঝতে পারবি না। কাকের বাসায় কোকিলছানা মানুষ হয় জানিস ? কিন্তু কোকিলের মা'র মনে শান্তি থাকে না।'

নারাণ কথা বাড়াল না। নিজের বাড়ির সামনে এসে বলল, 'ভয় পেলে ভয়টাই ঘাড়ে চেপে বসবে। তখন আর নামাতে পারবি না।'

BanglaBook.org

গফুর শুধু একবার তাকাল কিন্তু কোনও কথা বলল না।

দুপুর গড়িয়ে গিয়ে ভাদ্রের ঘোলাটে বিকেল বস্তিতে ছায়া ফেলল। গুমোট গরম আর বিদ্যুৎ না থাকার নিত্যকার অন্ধকার, তার মধ্য থেকে রোজকার মতো মানুষের কথা বলার শব্দ, বাচ্চাদের কান্না, বড়দের ঝগড়া আর খিস্তি সব মিলে বিচিত্র একটা শব্দের তরঙ্গ কেবল বস্তির মধ্যে গড়াতে লাগল। সন্ধ্যার পর নারাণ এসে বারান্দায় বসে গফুরের ঘরের দিকে তাকাল। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। একবার ভাবল, গফুরকে ডাকে। কিন্তু তার আগেই পদ্ম এসে বলল, 'গফুর ভাইরা নাকি এই ঘর ছেড়ে দিয়ে খালের দিকে চলে যাচ্ছ ?'

নারাণ অবাক হল। সে শুধু বলল, 'কে বলল ?'

পদ্ম উত্তর দিল, 'আজই দুপুরে রাবেয়া বলছিল। ওখানে নাকি মুন্না ওদের ঘর দেবে। ভাল ঘর।' নারাণ বলল, 'কেন ? এখানে কিসের অসুবিধে ?'

পদ্ম নিজের পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'তা জানিনে। রাবেয়া বলছিল, গফুরভাই নাকি বলেছে ওদিকটায় মোচলমান বেশি। ইদিকে হিঁদুদের বসত বেশি। তাই...'

নারাণ চুপ করে গেল। গফুর কি সত্যিই বদলে যাচ্ছে ? এখানে গফুর ছাড়া তার আর কোনও বন্ধু নেই। গফুর কি তাকে সত্যি ছেড়ে যাবে ?

নারাণ থাকতে না পেরে গফুরকে জিজ্ঞেস করল। গফুর তখন সবেমাত্র কাজ থেকে ফিরেছে। মুখ ধোবে বলে হাতে ঘটি তুলে নিয়েছে। নারানের প্রশ্ন শুনে গফুর কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকল। তারপর ঘটি নামিয়ে রেখে বলল, 'এখনও কিছু স্থির করিনি।'

নারাণ এবার জেদের গলায় বলল, 'তোর এখানে কিসের অসুবিধে ?'

গফুর উত্তর দিল, 'সে তুই বুঝবি না।'

নারানের কণ্ঠে জেদ আরও স্পষ্ট হল। সে বলল, 'কেন বুঝব না। যা তুই বুঝতে পারিস তা আমি বুঝতে পারব না কেন ?'

গফুর আস্তে আস্তে বারান্দায় বসল। তাপহীন গলায় সে বলল, 'তুই কষ্ট পাবি তাই তোকে বোঝাতে চাই না। তোর-আমার কোনও দোষ নেই। এটাই বোধহয় নিয়ম। সব নিয়ম তো আল্লার হাত দিয়ে হয় না। কিছু কিছু নিয়ম শয়তান তৈরি করে।'

নারাণ গফুরের বারান্দায় ধপাস করে বসে পড়ে বলল, 'ওসব প্যাঁচের কথা রাখ। সোজা করে বল তোর কিসের অসুবিধে ?'

গফুর অভিমান জড়ানো গলায় বলল, 'জাতের অসুবিধে। কলে জল আনতে গেলে রাবেয়াকে সবাই দূরে দাঁড়াতে বলে। শিব মন্দিরের চাতালে আকবর হামাগুড়ি দিয়েছে বলে কত কথা শুনিয়ে দিল রাবেয়াকে। এখানে আমাকে মাথা গুঁজে থাকতে হয়। নিজেদের মহল্লায় গেলে এমন হবে না। এখানে উঠতে বসতে টের পাই আমি মোসলমান, আমার অধিকার হিন্দুদের চাইতে কম।'

নারাণ প্রশ্ন করল, 'ওখানে গেলে কি তোর অধিকার বেড়ে যাবে ?'

গফুর বলল, 'তা হয়তো যাবে না। কিন্তু সব সময় সেটা কেউ আমাকে মনে করিয়ে দেবে না। নিজের জাতের সঙ্গে মিশে থাকলে এসব কষ্ট কম টের পাব।'

নারাণ অভিমান জড়ানো গলায় বলল, 'আমরা কি তোর নিজের জাত নই ?'

গফুর ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বলল, 'তোর কথা হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

তারপর একটু থেমে হঠাৎ করে নারাণকে বলল, 'তবে তুইও চল না আমার সঙ্গে। ওখানে তোরও ঘর হয়ে যাবে। যাবি ওই পাড়ায় ? বেশি দূর তো নয়, একই বস্তির এদিক আর ওদিক। নারাণ বলল, 'না, কেন যাব ও পাড়ায় ?'

গফুর ম্লান হেসে বলল, 'দেখলি তো, তুইও তোর জাতভাইদের মধ্যেই থাকতে চাস। আমি জানি, তুই হিন্দু এলাকা ছেড়ে মোসলমানদের মহল্লায় যাবি না। অথচ আমি যেতে চাইলে তুই রাগ করবি।'

নারাণ ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল। সত্যিই কি তার মধ্যে এ রকম কিছু আছে ? কদমখন্ডীতে থাকতে এসব জিনিস কখনও ভাবনার মধ্যে আসেনি। কলকাতা, তার বিশাল জনপদ, কারখানার পরিবেশ, চারপাশের প্রতিবেশী—এরা কি গফুরের মতো তাকেও বদলে দিয়েছে।

নারাণ গফুরের দাওয়া থেকে উঠে এল। খালপার থেকে ভেজা বাতাস আসছে। ওই বাতাসে ভেসে আসছে খালপারের মসজিদ থেকে এশার আজান। নিজের দাওয়ায় পা রাখতে রাখতে নারাণ ভাবল, তার ভিতরেও কি হিন্দুর ব্যাপারটা থেকে গেছে। গফুর যেমন তার জাতভাইদের মধ্যে গিয়ে থাকতে চাইছে, সেও তেমনই তার জাতভাইদের ছেড়ে আজন্মের বন্ধু গফুরের সঙ্গে খালপারে যেতে পারছে না। এটা কি জাতের টান ? মানুষের গায়ে জাতের চিহ্ন থাকে না, কখনও নারাণ সে চিহ্ন খোঁজেনি, খোঁজার কোনও তাগিদও অনুভব করেনি। আজ কি তার চিন্তায় খুব গোপনে সেই তাগিদ মাথা চাড়া দিচ্ছে ? মানুষ নয়, মানুষের সান্নিধ্য নয়, তার চাইতেও কি বড় হয়ে উঠছে জাতের সান্নিধ্য ?

নারাণ নিজেকেই যেন আজ আর বুঝতে পারে না। এমনতর কোনও সমস্যা তার সামনে কখনও আসেনি। অথচ মানুষের মন কত দুর্বল। সে এখনও তার ভিতরের দ্বন্দ্বটাকে থামাতে পারে না। সে ভাবে, যে আশ্রয় পেয়েছি তাকে হট করে ছেড়ে যাব কেন ? পরক্ষণেই মনে হয়, আশ্রয় তো ওখানেও পাব। যদি পাই, যদি গফুরের পাশাপাশি থাকতে পারি তাহলে ক্ষতি কী ?

পদ্মকে কথাটা বলে না নারাণ। সে জানে, পদ্ম কখনও রাজি হবে না। এখানে এতদিনে তার সংসারের শিকড় মাটির নীচে নেমেছে, তাকে সে ওপড়াতে চাইবে না। হোক না দশ মিনিটের পথ, তবুও সে এই ঠাঁই ছেড়ে যাবার কথা ভাবে না।

আশ্বিনের গোড়ায় সত্যি-সত্যি এক সকালে গফুর উঠে গেল খালপারে। নারাণ কারখানা থেকে ফিরে পদ্মর মুখে ওদের যাবার কথা শুনল। গফুর যে চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে সেটা নারাণ জানতো, কিন্তু সত্যিই যে চলে যাবে সেটা ভাবতে তার খারাপ লাগছিল। পদ্ম বলল, 'যাবার সময় রাবেয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল।'

নারাণ বলল, 'আর গফুর ?'

পদ্ম নাক টেনে বলল, 'আমায় বলল, পদ্ম, তোরা আসিস। আমিও আসবো। নারাণকে বলিস, ও যেন আমায় ভুল না বোঝে।'

নারাণ অনেকক্ষণ নিজের বারান্দায় বসে রইল। থেকে-থেকে চোখ চলে যাচ্ছিল গফুরের ঘরের দিকে। ঘরের দরজায় তালা। ঘরের ভিতর থেকে আজ আর আকবরের কান্না ভেসে আসছে না। বারান্দা থেকে কেউ আর ডেকে বলছে না, 'নারাণ, চা খাবি ?'

নারাণ নিজের হাঁটুতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় বসে রইল। খালপার

BanglaBook.org

থেকে মগরিবের আজান বাতাসে ভেসে ভেসে এল এখানে। ঝাপসা চোখ তুলে নারাণ খালপারের ধোঁয়ামাখা অন্ধকারের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

॥ ৮ ॥

গফুরের চলে যাওয়ার দুঃখটা আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল। এই বুঝি জীবনের নিয়ম। মানুষ কত বড়-বড় শোক ভুলে যায়, ভুলে গিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। একসময় মনে হত নাকের ডগায় গফুর না থাকলে সে বাঁচবে কেমন করে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। শহর তাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তাতে সে বুঝতে পারে, আজকের মানুষ কারও জন্যে বাঁচে না, সে বাঁচে তার নিজের জন্যে। দু'দিনের জন্যে মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। স্বার্থের টান পড়লে সেই সম্পর্ক ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। গফুর বুঝেছে, এখানে নারাণের চাইতে মুন্না আর তার জাতভাইরা তাকে অনেক বেশি আশ্বাস আর নিরাপত্তা দিতে পারে, তাই সে নারাণকে ফেলে উঠে যেতে পেরেছে মুন্নাদের কাছে। এমনটা যদি নারাণের ক্ষেত্রে হত তাহলে নারাণও কি তাই করত না? গফুরের সঙ্গে সঙ্গে সেও তো পারেনি ওপাড়ায় গিয়ে আরও শস্তায় ঘর নিতে। তবে কি জাতের টান তার মধ্যেও থেকে গেছে?

নারাণ বিষম দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। থেকে থেকে তার মধ্যে নানা প্রশ্ন মাথা খোঁড়াখুড়ি করে। কিন্তু নারাণ নিজেই তো সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা যেমন জানে না, তেমনই জানে না সব প্রশ্নের উত্তর। সে কেবল ভাবে। কারখানায় ওভারটাইম বাড়তে থাকে। বাড়ি ফিরতে রাত হয়। রাতে শুয়ে শুয়ে সে অনেক কিছু ভাবে, তারপর একসময় ঘুম এসে তার সব ভাবনা ঢেকে দেয়। ইদানীং পদ্ম মাঝে মাঝে বলে, 'দুটো টাকা দেবে?'

নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

পদ্ম হাসি হাসি মুখে জবাব দেয়, 'শিবতলায় ভিডিও দেখাবে। মাথা পিছু এক টাকা লাগবে।'

নারাণ বলে, 'তবে দু' টাকা কেন চাইছিস?'

পদ্ম বলে, 'বারে! সঙ্গে একটা টাকা রাখতে হয় না। একেবারে খালি হাতে যাব।'

শিবতলার ভিডিও নারাণও দেখেছে। বেশ বাহারি রঙিন ছবি। দেখতে দেখতে দিব্যি সময় কেটে যায়। কদমখণ্ডীতে এ জিনিস কখনও দেখেনি। সদরহাটিতে সিনেমা হল ছিল। ওখানে ভিডিওতে ছবি দেখাবার দুটো দোকানও খুলেছিল পালবাবুরা। ওই দোকানে নারাণ, গফুর, আফজল আর সনাতন দু'বার ছবি দেখেছে। সদরহাটিতে আটআনা লাগত, এখানে এক টাকার নীচে হয় না। পদ্মর কাছে কদমখণ্ডীর চাইতে কলকাতার বেলেঘাটা অনেক ভাল। এখানে বিজলিবাতি আছে, সুইচ টিপলে বন বন করে পাখা ঘোরে। সেই পাখাতে দেদার হাওয়া। এসব সুখ কদমখণ্ডীতে পদ্ম কখনও ভাবতে পারেনি। পদ্ম বলে, 'শাপে বর হয়েছে। ভাগ্যিস কদমখণ্ডী ছেড়েছিলে, তাই এখানে আসা হল। ওখানে তো খেতের কাম। না জুটলে পেটে গামছা বেঁধে থাকতে হত। এখানে কোম্পানির কাজ। মাস গেলে মাইনে। এত টাকা খেতের কাম করে কখনও পেয়েছ?'

নারাণ জবাব দেয় না। তার বুকের মধ্যে একটা জায়গায় যে শূন্যতা রয়ে গেছে সেটা

কাউকে বোঝাবার নয়। হয়তো পদ্মও বুঝবে না। এখনও, এতদিন পরেও সে কদমখণ্ডীকে ভুলতে পারে না। ঘুম ভেঙে গেলে তার মনে হয় কদমখণ্ডী যেন তাকে ডাকছে। তার সারা বুক জুড়ে কদমখণ্ডী জেগে থাকে। তার ঘুম চলে যায়। কদমখণ্ডীর স্মৃতির মধ্যে ডুবতে ডুবতেই আবার একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। সময়ের স্রোতে স্রোতে দিন গড়িয়ে যায়। বছরের পর বছর ঘুরে আসে, তবুও কদমখণ্ডীকে সে ভুলতে পারে না। তার বড় সাধ হয়, একটিবার কয়েকদিনের জন্য কদমখণ্ডী থেকে ঘুরে আসে। তার ওই ভিটেতে ছেলেটাকে একবার নিয়ে যায়। মাটির উঠোনে খোকাকে একবার ছেড়ে দিয়ে সে দেখতে চায় বাপ-চোদ্দপুরুষের ভিটেতে খোকা খেলা করছে, ধুলো ভর্তি উঠোনে ছুটছে, ছুটতে ছুটতে পড়ে যাচ্ছে। কদমখণ্ডীর ধুলো তার খোকার গায়ে লাগছে। তার ইচ্ছে করে খোকাকে একবার বাঘমারির জঙ্গল দেখায়। খোকাকে নিয়ে যায় ধোবিডাঙায়। ওখানে বাদশাদের ভাঙা দুর্গ, আর ভাঙা প্রাচীর দেখাতে দেখাতে সেই সব গল্প শোনায় যে গল্প সে শুনেছে তার বাবার মুখ থেকে। বাবা হয়তো শুনেছেন তাঁর বাবার মুখ থেকে। সেই শোনা গল্পটাই খোকাকে শোনাতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু কদমখণ্ডীতে যাবার সাধ থাকলেও তার সাধ্য নেই। তেনারা না বললে নারাণের যাবার ক্ষমতা নেই।

কলাকার স্ট্রিটে একবার গিয়ে নারাণ দেখা করেছিল তেনার সঙ্গে। ভজনলাল স্যার তখন পনেরো দিনের জন্য সদরহাটি ছেড়ে কলকাতায় আছেন। সদরহাটির মতো কলকাতাতে হুটহাট তেনার সঙ্গে দেখা করা যায় না। দেড়ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর নারাণের ডাক এল। শরীর শীতল করা ঠাণ্ডা ঘর। নারাণের বাসনার কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ। সদরহাটির পুলিশের খাতায় এখনও তোমার নাম আছে। অনেক চেষ্টা করেও নাম কাটাতে পারিনি। এর মধ্যে দুবার ডি. এম আর এস. পি বদল হল। একজন চেনা জানা এস. পি অথবা ডি. এম. এলে নামটা কাটাবার চেষ্টা করব। দু'দিনের জন্য ভিটে দেখতে গিয়ে যদি থানার লক আপে যাও তাহলে কলকাতার চাকরিটাও যাবে ওদিকে ভিটেতেও থাকতে পারবে না। ওই শিশুপুত্র নিয়ে যুবতী বউটা কোথায় যাবে ? তার চেয়ে যা করছ তাই করো।'

নারাণ আর কথা বলতে পারে না। বলবার সুযোগও কম। ভজনলালের মতো পদ্মও বলে, 'কাম নেই আর ভিটে দেখে। তার চেয়ে বেচে দিয়ে কলকাতায় থাকো। দু' বিঘে জমি ছাড়া আর কী-ই বা আছে ভিটেতে।' নারাণ বৌয়ের কাছেও চুপ করে যায়। নিজের ভিতরে যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা সে পদ্মকে বোঝাতে পারে না। শহরের মায়া পদ্মকে গ্রাস করেছে। কদমখণ্ডী আর পদ্মকে টানে না। কিন্তু গফুর আর রাবেয়াকে এখনও টানে।

সেদিন খালপারে গফুরের বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে বলতে গফুর বলল, 'বুঝলি নারাণ, কলকাতার আমও মানুষগুলোর মতো পানসে। দেখতে-শুনতে বেশ, কিন্তু সোয়াদ নাই। কদমখণ্ডীর টক আমেও একটা ত্যাজ ছিল। শহরের লঙ্কা বল লঙ্কা, তেঁতুল বল তেঁতুল কোনওটাতেই ত্যাজ নাই। কেমন যেন ম্যান্দামারা পানসা-পানসা ভাব। কদমখণ্ডীতে পৌষের পর মূলা চোখে দেখি নাই। শহরে বার মাস মূলা। সবই পাওয়া যায় কিন্তু কোনওটাতেই আসলের সোয়াদ পাই না।'

নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'তোদের কদমখণ্ডী যেতে ইচ্ছে করে না ?'

গফুর উদাস গলায় জবাব দেয়, 'করে, খুব করে। কিন্তু উপায় নাই। তোর মতো

BanglaBook.org

আমিও কলাকার স্ট্রিটে গিয়ে স্যারের সঙ্গে দেখা করেছি। আমাকেও একই কথা বলেছেন। প্রাণের ভয় তো বড় ভয়।'

রাবেয়া বলে, 'নারাণদা, যদি আমি একা-একা যাই, তাহলে আমারেও ধরবে ?'

গফুর বলে ওঠে, 'তোরে একা পাঠানো যায় নাকি !'

বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে নারাণ বিমর্ষ গলায় বলে, 'জানি না, আর কখনও যেতে পারব কি না। তবে গাঁয়ে যেতে বড্ড সাধ হয়।'

গফুর কথা বলতে পারে না। ট্যাংরার ধোঁয়েটে অন্ধকার আস্তে আস্তে খালপারের বস্তিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে তোলে। নারাণ উঠে পড়ে। নিজের বাড়িতে এসে দেখে, পদ্ম তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে। কয়লা জ্বলছে লাল হয়ে, তারই আভা লেগেছে পদ্মর মুখে, ওর নাকছাবিতে। সারা মুখে তিরতির করে জমেছে ঘাম। নারাণ গায়ের জামা খুলে বারান্দার দড়িতে রাখে। ছোট্ট উঠোনে তখন ছমছমে অন্ধকার। রাস্তার বাতিগুলো আজও জ্বলেনি। এমনটা প্রায়ই হয়। রাতের বেলা হঠাৎ হঠাৎ বাতি চলে যায় আবার হঠাৎ হঠাৎ চলেও আসে। এই রোগটার কী যেন একখানা ইংরেজি নাম আছে। লোডশেডিং না পাওয়ার কাট কী যেন বলে। রোগটা কদমখণ্ডীর ম্যালেরিয়ার মতন। এই কম্প দিয়ে জ্বর এল, আবার খানিকবাদেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলে। কদমখণ্ডীতে বিজলীবাতির মুখ দেখেনি পদ্ম, অথচ এখানে ওর স্বভাব এমনই বদলে গিয়েছে যে বাতি চলে গেলে ও ঠিক থাকতে পারে না। বস্তির বকুল পিসির মতো পদ্মও গাল পাড়তে থাকে। কিন্তু নারান গাল দেবে কাকে ? কে যে আলো দেয় আর কে যে কাড়ে সেটাই তো তার জানা নেই।

বাতি এল সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার অনেক পরে। পদ্ম রান্না শেষ করে গা ধুয়ে এসে বলল, 'খোকার ব্যাপারে কিছু ভাবলে ?'

নারাণ উত্তর দেয়, 'কী ভাবব ?'

পদ্ম বলে, 'খোকারে ইস্কুলে দিতে হবে না ?'

নারাণ চোখ তুলে পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এখনই ?'

পদ্মর গলায় রাগ ফোটে। সেই গলাতেই বলে, 'এখনই মানে ? আসছে পৌষে খোকা তিন বছরে পা দেবে। এখানে ওই বয়সেই ছেলেরা ইস্কুলে যায়। এ কি তোমার কদমখণ্ডী যে ধাড়ি হলে তবে পাঠশালাতে যাবে।'

নারাণ ভেবে দেখল কথাটা ঠিকই। যাতায়াতের পথে ওই টুকুন বয়সের ছেলে-মেয়েদের ঝাঁক ধরে ইস্কুলে যেতে দেখে। পিঠে ব্যাগ, হাতে জলের বোতল আর পরনে ঝকমকে পোশাক। এখানে কি এই বয়সেই ভর্তি করতে হয় ? এটাই কি শহরের নিয়ম ?

নারাণ গেল বিজয় মাস্টারমশাইয়ের কাছে। তিনি তখন হাতলভাঙা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। নারাণের আর্জি শুনে বললেন, 'এতো খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার স্কুলে তো পাঁচ বছরের আগে ভর্তি করার আইন নেই।'

নারাণ থমকে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, 'আমার বৌ বলছিল শহরে নাকি তিন বছর হলেই...'

বিজয়বাবু হাসলেন। হাতের ইশারায় নারাণকে বসতে বললেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে বললেন, 'শহরে অনেক রকম আইন চলে। একটা আইন হচ্ছে সরকারি আইন। ওটা সর্বসাধারণের জন্য। ওটা মানলেও হয়, না মানলেও চলে। আরেকটা

BanglaBook.org

হচ্ছে বড়লোকদের আইন। ওটা বড্ড কড়া। বড়লোকের ঘরের ছেলেমেয়েরা আমার স্কুলে পড়ে না। কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ে গরিবরা। তা ওই বড়লোকদের নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ওইসব জায়গায় তিন বছর বয়স থেকেই ভর্তির ব্যবস্থা আছে। এবার তোমরা ভেব দেখো, তোমাদের ছেলেকে কোথায় ভর্তি করবে ?'

নারাণ উঠে আসছিল। মাস্টারমশাই বললেন, 'তোমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেট আছে তো ? যেখানেই ভর্তি কর ওটা লাগবে।'

নারাণ জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী জিনিস ?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তোমার সন্তান কবে কোথায় জন্মেছে তার প্রমাণপত্র।'

নারাণ ঢোক গিলল। হঠাৎ করেই পৌষের একটা রাত্রির খণ্ড খণ্ড কয়েকটা দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে এল। সে মাস্টারমশাইয়ের কাছে এসে বলল, 'তেমন কাগজপত্র তো স্যার কিছু নেই।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'কেন নেই ?'

নারাণ বলল, 'পোয়াতি বৌ নিয়ে দেশ ছেড়ে শহরে এলাম। কাউকে তখনও চিনি না। আসার মাস দেড়েক বাদে একদিন রাত্রে ব্যথা উঠল। খোঁজাখুঁজি করে রিকশা ডাকারও সময় ছিল না। রিকশা এসে পৌঁছবার আগেই তো আমার ঘরের বারান্দায় খোকা জন্মাল। শিবতলার বকুলপিসিই ধাইমার কাজ করলেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু তারপরে কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে ছেলের জন্মের ব্যাপারটা লেখাওনি ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'ওই অফিসটাই তো চিনি না। আমি তো এতসব জানতামও না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তবে তো কোনও স্কুলেই ভর্তি করতে পারবে না। এখন থেকে চেষ্টা করো। জন্মের তারিখ দিয়ে যদি কোনও সার্টিফিকেট বার করতে পার। তারিখটা মনে আছে তো ?'

যে ছেলে জন্মে গেছে সেই ছেলে যে সত্যি জন্মেছে তার প্রমাণ বার করতে দু'দিন কাজ কামাই করে ঘোরাঘুরি করল নারাণ। কর্পোরেশন অফিসের বাবুরা তাকে পাত্তাই দিল না। সে কেবলই এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ঘোরাঘুরি করল। দালাল গোছের একটা লোক বারান্দায় আসার পর নারাণকে ডাকল। সব শুনে বলল, 'আপনার কেস বিশ বাঁও জলের তলায়। ছেলে তো পরে, আগে প্রমাণ করুন আপনি কে এবং কে আপনার বৌ। তারপর প্রমাণ করুন আপনার সত্যি সত্যি বিয়ে হয়েছিল কি না। তারপর আসবে ছেলের ব্যাপার।'

নারাণের মাথা ঘুরতে লাগল। সে বলল, 'তাহলে কি হবে না ?'

দালালটা ফিক করে হাসল। বাঁ হাত নারাণের কাঁধে রেখে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল একটা দোকানে। দোকানে এসে কাঠের বেঞ্চিতে বসতে বসতে বলল, 'অ্যাই, দুটো ঘুঘনি রুটি আর চা দে।'

দালালটা দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দাঁতে কাটছিল। ঘুঘনি দিয়ে পাউরুটি খেতে খেতে বলল, 'এই শহরের নাম কলকাতা। এখানে হয় না এমন কোনও কাজ নেই। কিন্তু তার জন্যে মাল ছাড়তে হবে।'

নারাণ খাবার মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেল। প্রশ্ন করল, 'মাল মানে ?'

দালালটা এবার দু' আঙুলের মুদ্রাতে টুকটুকিয়ে বুঝিয়ে দিল 'টাকা।'

নারাণ জিজ্ঞেস করল, 'কত ?'

BanglaBook.org

দালালটা জল খেল। চায়ের কাপ কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, 'সবাইকে দিতে-টিতে হবে তো। তা পনেরোশো টাকা লাগবে।'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল নারাণের। সে বলল, 'পনেরোশো!'

দালালটা শ্লেষের গলায় বলল, 'তবে কি পনেরো টাকা ভেবেছেন। এই টাকা থেকে কতজনকে খাওয়াতে হবে জানেন? আমার ভাগে পঁচিশ-তিরিশের বেশি আসবে না। যদি রাজি থাকেন তবে কাল বাদ পরশু এই দোকানে এসে খোঁজ করবেন।'

দোকান থেকে ওঠবার সময় দালালটা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'ভোলাদা, কত হয়েছে?'

দোকানদার বলল, 'পাঁচ টাকা।'

দালালটা এবার নারাণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাঁচটা টাকা দিয়ে দিন। পরশু বেলা বারোটায় চলে আসবেন।'

লোকটা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনই হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। নারাণ বাধ্য হয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। পনেরোশো টাকা তার কাছে অনেক টাকা। এত টাকা সে কোথায় পাবে?

রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যাবার জন্য নারাণ দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল একটা জিপগাড়ি কর্পোরেশন বাড়ির ভিতর থেকে হর্ন বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে আসছে। ওই জিপের মধ্যে ড্রাইভারের পাশে বাঘা বসে। বাঘা তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ভিড়ের জন্য জিপটা থামতেই নারাণ ছুটে গিয়ে বাঘার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'বাঘাদা!'

বাঘাদার হাতে শহর কলকাতার সব রোগের নিদান আছে। গাঁয়ে যেমন পীরের দরগা আর ষষ্ঠীতলা, এখানে তেমনই বাঘাদা আর তার দল। বাঘাদার ওপর ভক্তি রাখলে সব মুশকিলের আসান করে দেন। ভগবানের চাইতেও চট্‌জলদি কাজ করেন বাঘাদা।

নিজের ডেরায় নারাণকে ডেকে সব শুনে বললেন, 'কালকে একশো টাকা নিয়ে চলে আসিস। ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

নারাণ একটু ইতস্তত করছিল দেখে বাঘা বলল, 'কী হল? ঘরে টাকা নেই?'

নারাণ উত্তর দিল, 'মাইনে পেতে এখনও দিন সাতেক দেরি। ঘরে তো একশো টাকা নেই। তাই...'

বাঘা সিগারেট ধরিয়ে আঙুলের টোকায় দেশলাইয়ের কাঠিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। মাইনে পেলে আমায় দিয়ে দিস।'

সিগারেটে পর-পর কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'স্কুলের বড় দিদিমণির সঙ্গে লাইন আছে?'

নারাণ জিজ্ঞেস করল, 'লাইন মানে?'

বাঘা আগের মতো ভঙ্গিতে বলল, 'লাইন মানে জানাশোনা। জানাশোনা না থাকলে ভর্তি হওয়া অত সহজ নয়। একটু ভাল স্কুল হলে বাপেরা পাঁচ-দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করায়। তোর খালা এত আঠা কেন? কিছুদিন পর কর্পোরেশন স্কুলে ঢুকিয়ে দিলেই তো পারতিস।'

নারাণ অপরাধীর মতো ভঙ্গি করে বলে, 'না, মানে আমার বৌয়ের খুব ইচ্ছে তাই। আমার তো বেশি লেখাপড়া নেই, তাই ছেলেটারে...'

বাঘা হাতের তুড়ি বাজিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, 'তাই ছেলেটাকে শিক্ষিত খচ্চর করে তুলতে চাইছিস। তা ভাল। এ শহরে বাঁচতে হলে খচরামো জানতে হবে।

BanglaBook.org

স্কুলে আমি ভর্তি করিয়ে দেব, কিন্তু পরের হ্যাপা সামলাতে পারবি ? যা রোজগার করিস তার ডবল বেরিয়ে যাবে ছেলের পিছনে। তার চাইতে এখন বস্তির স্কুলে দে। সড়গড় হোক, তারপর কর্পোরেশন স্কুলে পুরে দে।'

বাঘাদার প্রস্তাবটাই মনে মনে মেনে নিয়ে উঠে আসছিল নারাণ। বাঘাদা হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। তারপর গলাটা গম্ভীর করে বলল, 'গফুরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ?'

নারাণ বলল, 'হ্যাঁ।'

বাঘা বলল, 'মাখামাখি কমিয়ে দে। গফুর মুন্নাদের চামচে হয়েছে। মুন্নার সঙ্গে আমার টক্কর হবে। ও শালা গোপেন মিত্রের মদত পেয়ে নিজেকে শের ভাবছে। শ্যালদা আর হাড়কাটা গলিতে খুব চমকাচ্ছে আমাদের ছেলেদের। আমার পেছনে হাফ ডজন মন্ত্রী আছে। পুলিশ আছে। আমি এবার জঙ্গল সাফ করব।'

বাঘার পিছন থেকে ওরই এক সাকরেদ বলল, 'দেরি করলে জঙ্গল বড় হয়ে যাবে। মুন্না রাজাবাজার আর কলাবাগানের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। মেটিয়াবুরুজ থেকে আর্মস পাচ্ছে।'

বাঘার চোখ কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে গেল। পরক্ষণেই প্যাকেট থেকে আরও একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা মালগুলো কোন ডেরায় রাখে জানিস ?'

প্রশ্নটা কাকে করা হল সেটা নারাণ জানে না। কিন্তু উত্তর দিল অন্য একটা ছেলে। বলল, 'খালপারে শিশি-বোতলের যে গুদাম আছে...'

ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই বাঘা বলল, 'এটা দেড় বছরের পুরনো খবর। ওরা এখন মাসে-মাসে ডেরা পাল্টায়। এখন ডেরাটা কোথায় সেটা জানতে হবে।'

কথাটা শেষ করেই বাঘা তাকাল নারাণের দিকে। নারাণ ভয় পেয়ে গেল। তার ভিতরটা কাঁপতে লাগল। কিন্তু বাঘা কিছু জিজ্ঞেস করল না। চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'শুধু সিগন্যালের অপেক্ষায় আছি। সিগন্যাল পেলেই অ্যাকশন শুরু হবে। মেটিয়াবুরুজের স্মাগলড আর্মস মুন্নাদের পিছনে ঢুকে যাবে।'

এ সব কথাবার্তায় নারাণের ভয় বাড়তে লাগল। তার সবচেয়ে বেশি ভয় গফুরকে নিয়ে। ওরা কি গফুরকেও মারবে ? গফুর তো তারই মতো একজন মানুষ। মুন্নাদের সঙ্গে বাঘাদার কেন গণ্ডগোল, কিসের গণ্ডগোল তা সে জানে না। শহরের সব ব্যাপার বোঝা যায় না। কদমখণ্ডীতে থাকতেও সে বুঝতে পারেনি কে বা কারা বাঘমারির জঙ্গলে বরখেকে বে-ইজ্জত করার চেষ্টা করেছিল, কেনই বা মংলুরা দলবেঁধে মোল্লাপাড়ায় ধেয়ে গেল, দাঙ্গা হল, আর কারাই বা সাঁওতাল পল্লীতে আগুন লাগাল। এ সব কাণ্ড-কারবার ঠিক-ঠাক বোঝা যায় না। নারাণ বাড়ি ফেরার পথে গফুরের কারখানায় গেল। গফুরকে আড়ালে ডেকে সব বলার পর বলল, 'তুই মুন্নাদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ কর।'

গফুর বলল, 'আমিও জানি মুন্নারা সুযোগ খুঁজছে দল বাড়াচ্ছে। যে কোনও সময় বাঘাদাদের সঙ্গে মারদাঙ্গা লেগে যাবে। কিন্তু আমি কী করব ? আমি তো মারদাঙ্গা করব না। শুধু মুন্নার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নানা ব্যাপারে সাহায্য চাইলে সাহায্য করে। এদিকে যেমন বাঘাদাদের খাতির না করে কেউ থাকতে পারে না, ওখানেও তাই। এটাই এখন বেঁচে-বর্তে থাকার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

নারাণ বলল, 'সে যাই হোক, তুই কিন্তু মেলামেশা বন্ধ করে দে।'

BanglaBook.org

গফুর বলল, 'পরিচয় থাকা আর দোস্তি থাকা তো এক জিনিস নয়। আমি যদি বলি তুই বাঘাদার সঙ্গে মিশবি না, কথা কইবি না, তাহলে ?'

নারাণ একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তুই রাগ করিস না। আমার খুব ভয় হয়। বাঘাদা খালি বলে তোর দোস্ত গফুর ও-পাড়ায় গিয়ে মুন্নার চামচে হয়েছে। আমার শুনতে ভাল লাগে না।'

গফুর আহত গলায় বলে, 'আমারও শুনতে খারাপ লাগে যখন মুন্নার ছেলেরা আমাকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, তোর বন্ধু বাঘার জিপ গাড়িতে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। ওরা বলে, হিঁদুরা কখনও মোসলমানদের পাড়ায় এসে ঘর নেবে না, হিঁদু পাড়াতেও ঘর করতে দেবে না। ওরা মোসলমানদের এখনও মন থেকে বিশ্বাস করে না। এখনও অনেক হিঁদু মোসলমানদের ছোঁয়া খায় না। কিন্তু এমন মোসলমান দেখাতে পারবি না যারা হিঁদুর ছোঁওয়া বিচার করে। সে যেমন হিঁদুই হোক না কেন।'

নারাণ গফুরের কারখানা থেকে নিজের বাড়ি ফেরে। আজ নিজে কাজ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছে বাঘাদার কাছে ছেলের ব্যাপারে যেতে হবে বলে। আসার পথে মাস্টারমশাই ডাক দেন। নারাণ মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে সব ঘটনা জানিয়ে শেষে বাঘাদার কথা বলে। নারাণ জানায়, 'বাঘাদা বলেছেন একশো টাকাতেই নাকি হয়ে যাবে।'

মাস্টারমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'হ্যাঁ, ওরাই তো সব। দেশ, প্রশাসন, কর্পোরেশন এসবের অর্ধেক তো ওরাই চালায়। বাঘা ইচ্ছে করলে আমাকে জেলের ঘানি ঘোরাতে পারে, কিন্তু আমি হাজার চেষ্টা করলেও বাঘার কণামাত্র ক্ষতি করতে পারব না।'

নারাণ অবাক গলায় বলে, 'আপনি তো মাস্টারমশাই। আপনি লোককে শিক্ষা দেন, জ্ঞান দেন। আপনার চাইতে বাঘাদা বেশি হবে কেমন করে ?

বিজয়বাবু নারাণের অজ্ঞতায় হাসলেন। একটা হাত নারাণের কাঁধে রেখে চলতে চলতে বলতে লাগলেন, 'জঙ্গলে মানুষের চাইতে জন্তুদের দাপট বেশি। এ রাজ্যেও ভদ্রলোকদের চাইতে গুণ্ডাদের দাম বেশি। যে ভদ্রলোক নিজের বিবেক, বিচারবুদ্ধি আর প্রজ্ঞাকে ক্ষমতবান শাসকদলের কাছে বাঁধা না রাখতে পারবে তার শিক্ষার কোনও মূল্য নেই। কারও দোষ নেই নারাণ, কারও দোষ নেই। সরোবরের সব জল বিষিয়ে গেলে ওই সরোবরের মাছেরাও আর বেঁচে থাকতে পারে না। হয় মরে নয়তো রোগগ্রস্ত হয়ে যায়।'

মাস্টারমশাই বাঘাদাকে খুব একটা পছন্দ করেন না সেটা নারাণ টের পায়। কিন্তু মাস্টারমশাই যা বলেন, এখন যা বললেন সে সব কথার অনেক কিছুই তার মাথায় ঢোকে না। নারাণ তাই অবুঝের মতো মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকায়। মাস্টারমশাই সম্ভবত ওর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারেন। তিনি চলতে চলতেই বলতে থাকেন, এখন এম.এ, এম.এসসিতে কেউ ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হলে কাগজে তার ছবি তো দূরের কথা, নামও বোধহয় বেরোয় না। একজন গবেষক বা তরুণ বৈজ্ঞানিককে দেশের লোক চিনতে পারে না। কিন্তু গুণ্ডাদের ছবি ছাপা হয়, তাদের নাটকীয় উত্থান-পতনের জীবনী ছাপা হয়, তাই নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চর্চা হয়। জানি না, রামমোহন, বিদ্যাসাগর আর রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি একদিন পাঠ্যপুস্তকে চার্লস শোভরাজ, দাউদ ইব্রাহিমদের জীবনীও ছেলেদের পড়াতে হবে কি না।'

রাস্তার মোড়ে এসে মাস্টারমশাই দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে কী যেন

BanglaBook.org

দেখলেন। তারপর বললেন, 'তুমি ভয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছ। আমিও তাই। দেশভাগের পর কেমনভাবে, কোন পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়ে এসেছিলাম, কেমনভাবে এখানে কাটিয়েছি সে সব কথা তোমায় বলেছি। আমরা যদি না আসতাম তাহলে কী হত ? হয়তো খুন হতাম, নয়তো ভয়ে আর অপমানে জীবন কাটাতে হত। অনেকেই তো থেকে গিয়েছিল। সবাই তো অপমানিত হয়নি, খুন হয়ে যায়নি।'

নারাণ মাথা নাড়ল। মাস্টারমশাই বললেন, 'অপমান সইতে পারব না বলে এখানে এলাম। এখানে কী হল জান ? প্রকাশ্য দিবালোকে ওই বাঘা আর তার দলের ছেলেরা স্কুলে যাবার পথে আমাকে ঘিরে ধরল। বাঘা আমার জামার কলার ধরে এই গালে চড় কষিয়ে বলেছিল কুত্তার বাচ্চা, বাচ্চুদার নামে বদনাম রটানো। তোর শালা বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব। সেদিন একটা লোকও ছুটে আসেনি ওই গুণ্ডাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে। কর্পোরেশন ইলেকশনে ওই বাচ্চুদা মানে শ্যামল দত্ত ছিল ক্যান্ডিডেট। আমি জানতাম, লোকটা ভাল নয়। অতি খারাপ। আমি শুধু বলেছিলাম, অমন চরিত্রহীন বদমাইসকে আমি ভোট দেব না। কারও দেওয়া উচিত নয়। এই অপরাধে আমাকে ওইভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল। সেদিন বুঝেছিলাম, শিক্ষা নয়, মানবতা নয়, শুধু ক্ষমতা। টাকার ক্ষমতা নয়তো প্রশাসনের ক্ষমতা, নতুবা দলের ক্ষমতা না থাকলে সে মানুষ শুধুই অপমানিত হয়, হয়ে থাকে। আমার অভিযোগ থানাও শোনেনি। উল্টে পরামর্শ দিয়েছিল, বাঘার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন। সেদিন বাঘার একটা চড়ের আঘাতে আমার চোখে জল আসেনি, জল এসেছিল অপমানে। একজন শিক্ষকের অপমানে সেদিন একটা মানুষও এগিয়ে আসেনি। এসেছিল দশ বছরের একটা ছেলে। রাস্তার একটা পাথর তুলে সে ছুঁড়েছিল ওদের জিপ গাড়িটার দিকে। গাড়িটার গায়ে লাগেনি। জিপ ততক্ষণে ওর নাগালের বাইরে।'

মাস্টারমশাই থামলেন। তাঁর গলার স্বর শেষের দিকে বদলে গিয়েছিল। সেদিনের সেই অপমানের স্মৃতি এসে তাঁর গলা বুজিয়ে দিয়েছিল। মাস্টারমশাই রাস্তা পার হয়ে চলে গেলেন। বিমূঢ় নারাণ অনেকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল, এমন নাম-করা শহরের অস্থি-মজ্জায় এত পাপ কবে ঢুকল ? সেই পাপ এখন শহরের গায়ে দগদগে ঘা হয়ে বেরিয়ে আসছে।

নারাণ নিজের বাড়িতে ফিরে এল। ফিরে এসে দেখে রাবেয়া তার ঘরের বারান্দায় বসে আছে। রাবেয়া একা কেন ? পদ্ম কোথায় ?

প্রশ্নটা করার আগেই রাবেয়া নিজে থেকেই বলল, 'ভাইজান, পদ্ম আমাকে বসিয়ে দোকানে গেছে।'

নারাণ রাবেয়ার পাশে বসতে বসতে বলল, 'আমি গফুরের কারখানায় গেছলাম।'

রাবেয়া বলল, 'কেন ?'

নারাণ একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'একটু দরকার ছিল। শহরের মতি-গতি বুঝতে পারি না। কেবলই ভয়-ভয় করে।'

রাবেয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'হক কথা কয়েছো ভাইজান। তোমার বন্ধুও তাই বলে। খালপারের লোকরা বলে, দিন নাকি পাল্টে যাবে। হিন্দুস্থানে আর কোনও মোসলমান থাকতে পারবে না।'

নারাণ বলে, 'এমন জিনিস হয় নাকি ! ওসব বাজে কথা।'

রাবেয়া ভয় পাওয়া গলায় বলে, 'বাজে কথা নয় গো ভাইজান। আমাদের মসজিদে

BanglaBook.org

যে আজান দেয়, সেই মুয়াজ্জিন বলছিলেন, অযোধ্যা বলে নাকি একটা দেশ আছে, সেই দেশে বাবরি মসজিদ বলে একটা পুরানা মসজিদ আছে। ওই মসজিদ নাকি হিঁদুরা ভেঙে দিয়ে ওখানে হিঁদুদের মন্দির তৈরি করবে।'

নারাণ জীবনে এই প্রথম বাবরি মসজিদ বলে একটা মসজিদের নাম শুনল। অযোধ্যা নামটা শুনলেই তার যাত্রাগানের কথা মনে হয়। ওই নামের একটা দেশে নাকি রামচন্দ্র জন্মেছিলেন। তা সে সব তো গল্পকথা। সে কি সত্যি নাকি? কিন্তু অযোধ্যা নামের দেশটা কোথায়?

নারাণ রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করে, 'অযোধ্যা দেশটা কোথায়?'

রাবেয়া উত্তর দেয়, 'কে জানে কোন মুলুকে।'

একটু পরে দোকান থেকে আটা কিনে পদ্ম ফিরে আসে। অনেকদিন পর ঘরের দাওয়ায় বসে তিনজন গল্প করে। বারান্দার অন্যদিকে খোকা আর আকবর নিজেদের মধ্যে খেলা করে। নারাণ এক সময় বলে, 'পদ্ম, বারোটা বাজতে চলল। খোকা আর আকবরকে খাইয়ে দাও।'

এক থালায় ভাত মাখে পদ্ম। রাবেয়া ওদের দু'জনকে খাইয়ে দেয়। নারাণের মনে পড়ে বাবা মারা যাওয়ার পরের বছরেই মা'র খুব অসুখ হল। বিছানা থেকে ওঠবার ক্ষমতা নেই। তখন গফুরদের বাড়িতে নারাণকে কোলে করে নিয়ে যেতেন গফুরের বাপ। গফুরের মা এইভাবেই তাকে আর গফুরকে এক থালায় ভাত মেখে খাইয়ে দিত।

গফুরের বাপ ঠাট্টা করে বলতেন, 'মোচলমানের হাতে খেলে হিঁদুদের নাকি জাত যায়। তুমি নারাণের জাত মেরে দিলে?'

গফুরের মা নারাণের মুখে ভাতের দলা তুলে দিতে দিতে উত্তর দিতেন, 'মায়ের হাতে কখনও ছেলের জাত যায়?'

গফুরের মায়ের কথা ভেবে নারাণের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। শোকে-দুঃখে স্বামী মারা যাবার পর স্বামীর ভিটে আঁকড়ে চাচি এখনও কদমখণ্ডীতে পড়ে আছেন। মাথাটাও নাকি খারাপ হয়ে গেছে। গফুর বার কয়েক খবর পাঠিয়েছিল, কিন্তু চাচি আসেননি। মাত্র কয়েক বছরে কত কিছু ঘটে গেল এই জীবনে।

বেলা গড়িয়ে যাবার পর পদ্ম আর রাবেয়া একসঙ্গে খেল। রাবেয়াকে পৌঁছে দিয়ে আসবার পর নিজের ঘরের দরজায় বকুলপিসির সঙ্গে দেখা। বকুলপিসি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'নারাণ, অত আদিখ্যেতা ভাল না। এক গাঁয়ের লোক, একসঙ্গে এয়েচো ভাল কথা। মুখে ভাব-ভালবাসা থাকুক ক্ষতি নেই। তাই বলে নেড়েদের সঙ্গে এক হাঁড়িতে খাওয়া, এক পাতে আহার। জাতের বিচার করবে না! এতে যে ঘরের লক্ষ্মী কুপিত হন। তাঁর আসন টলে যায়। এসব অনাচার ফের করলে তোমাদেরও খালপারে চলে যেতে হবে।'

নারাণ শঙ্কিত বোধ করে। এসব কথা কদমখণ্ডীতে সে কখনও শোনেনি। এতবড় শহরের মনটা এত ছোট হয়ে যায় কেমন করে। সে মাথা নিচু করে থাকে। বকুলপিসি তাকে প্রায় শাসাতে শাসাতে চলে যায়। সে নিঃশব্দে বাড়ির ভিতর ঢোকে। পদ্ম দেওয়ালে মুখ রেখে তখন কাঁদছে। সে এই কান্নার কারণ জানে। সে আসবার আগে বকুলপিসি তাকেও যাচ্ছেতাই করে শাসিয়েছে।

নারাণ আস্তে আস্তে বারান্দায় বসে। এই মুহূর্তে তার মুখে কোনও কথা আসে না। কেবল বুক জুড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

BanglaBook.org

বস্তিতে তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। পুবের আলো মেঘের আড়াল ভেঙে তখনও বস্তিতে আলো ফেলতে পারেনি। এসময় কখনও ঘুম ভাঙে না নারাণের। খোকার কান্নায় তার ঘুম ভাঙল। গত রাত্রে বস্তির মধ্যে অনেকক্ষণ কুকুরের চিৎকার শুনেছে। দেরি করে ঘুম এসেছিল বলে খোকার কান্নায় ঘুম ভাঙলেও নারাণ কিছু না বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারল না। একটু পরেই পদ্ম তাকে ডেকে তুলল।

ঘুম জড়ানো চোখে নারাণ বলল, 'কী হল ?'

পদ্ম ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'সকালে কল থেকে জল আনতে গিয়ে শুনে এলাম।'

পদ্মর গলা কাঁপছে। নারাণ এবার চোখ খুলে পদ্মর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী শুনে এলি ?'

পদ্ম বলল, 'খালপারের মুন্না খুন হয়েছে। কারা যেন ওর বুকে আর পেটে চারটে গুলি করেছে। লাশ পড়ে আছে বাল্‌ব ফ্যাক্টরির পাঁচিলের পাশে একটা ডোবায়।'

বিছানার ওপর উঠে বসল নারাণ। প্রথমেই গফুরের কথা মনে হল। গফুররা কি জানে ? নারাণ বাইরে এল। বস্তিজীবনে মুন্নার মৃত্যু কোনও ছায়া ফেলেছে কি না বোঝার উপায় নেই। জলের কলে লাইন, দুধ আনতে যাওয়া লোক, স্কুলে যাবার বাচ্চারা কারও মুখ দেখেই কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নারাণ ইচ্ছে করেই চায়ের দোকানে এসে বসল। কেউ কাগজ পড়ছে, কেউ চা খাচ্ছে। কেউ মুন্নাকে নিয়ে কোনও আলোচনা করছে না। তবে কি পদ্ম ভুল শুনেছে ?

চা খেয়ে উঠে আসার সময় হারান মণ্ডল বলল, 'মুন্নার দল একটা বদলা নেবার চেষ্টা করবে। তার মানে হাঙ্গামা হবেই।'

দোকানদার বলল, 'কিচ্ছু হবে না। খালপারে পুলিশ পিকেট বসে গেছে। দু'চারজন নেতা এসে ঘুরে যাবে। নরম-গরম কথা বলবে, ব্যস সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

নারাণ যেন কিছুই জানে না তেমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে হারানদা ?'

হারাণ মণ্ডল উত্তর দিল, 'খালপারের মুন্না মার্ডার হয়েছে। কারা যেন গত রাত্রে খুন করে গেছে।'

নারাণ কথাটা শুনে আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। দিনের আলো ততক্ষণে প্রখর হচ্ছে। রাস্তার মোড় থেকে চলমান অটো, বাস আর মিনিবাসের শব্দ আসতে আরম্ভ করেছে। বস্তির স্কুলে ছেলেমেয়েরা সার বেঁধে তখন প্রার্থনা সঙ্গীত গাইছে 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ...।'

নারাণ এক বুক আশঙ্কা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে এল।

॥ ৯ ॥

মুন্না খুন হওয়ার সংবাদে নারাণের মনে হয়েছিল এ নিশ্চয়ই বাঘাদাদের দলের কাজ। অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে না, আর করবেই বা কেন ? কিসের স্বার্থ ? কিন্তু সেই সন্দেহটা নারাণের ঘুচে গেল। মুন্না খুন হওয়ার দু'দিন আগে বাঘাদা ভর্তি হয়েছিল হাসপাতালে। বাঘাদার পেটে নাকি কিসের ব্যথা হয়, সেটা সারাতেই হাসপাতালে গিয়েছিল। যে লোক হাসপাতালে শুয়ে, সে খুন করতে আসবে কেমন করে ?

নারাণের একবার মনে হল, বাঘাদা তার অনেক উপকার করেছে। তার চেষ্টাতেই হয়তো ছেলেটাও ভর্তি হয়ে যাবে কর্পোরেশন ইস্কুলে। বাঘাদার জন্যই বার্থ সার্টিফিকেট জোগাড় করা সহজ হবে। এ সময় হাসপাতালে তাকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাঘাদা কোন হাসপাতালে আছে ?

খালপারের উত্তেজনা ঝিমিয়ে আসার পর নারাণ একদিন গেল বাঘাদার আড্ডায়। ওখানে গিয়ে নারাণ অবাক! যেখানে আট-দশজন ছেলে সব সময় মজুত থাকতো সেখানে মাত্র দু'জন অচেনা বুড়ো বসে-বসে তাস খেলছে। নারাণকে দেখে ওই দুই বুড়োর একজন কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'বাঘাদার খবর নিতে এয়েছিলাম।'

এবার দুজনেই নারাণের দিকে তাকাল। দুজনের চারটে চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মতো নারাণকে বিদ্ধ করতে লাগল। নারাণ মনে মনে ভয় পেল। একটু দূরেই রেলপার, ওখান থেকে ইঞ্জিনের হুইসিল বাজতে বাজতে মিলিয়ে গেল। নারাণ একবার ঢোক গিলল। এবার অন্য বুড়োটা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের খবর ?'

বুড়ো লোকটির প্রশ্ন করার ধরনটা এমনই যে, নারাণ ঘাবড়ে গেল। সে আবার ঢোক গিলে নিয়ে বলল, 'আমি শুনেছি বাঘাদা হাসপাতালে আছেন। কেমন আছেন, কোন হাসপাতালে আছেন তাই জানতে এয়েছিলাম।'

এবার ওই দুই বুড়ো হাতের ইশারায় নারাণকে ভিতরে ডাকল। নারাণ এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল দরজার গোড়ায়। ওদের ডাকে নারাণকে বাধ্য হয়ে ভিতরে যেতে হল। ভিতরে যাওয়ার পর নারাণ দেখল ঘরের কোণে আবছা অন্ধকারে আরও দু'জন বয়স্ক লোক বসে। এবার চারজন লোক একসঙ্গে নারাণের দিকে তাকাল। নারাণের শিরদাঁড়া দিয়ে ঘাম নামতে শুরু করেছে। এখন অঘ্রানের শুরু। কদমখণ্ডীতে এসময় মাঠে-মাঠে কুয়াশা জমতে থাকে, সূয্যি ডোবার পরেই পথে-ঘাটে আঁধার জমে। সরষে খেতের মাথায় পাতলা ন্যাকড়ার মতো ভাসতে থাকে হালকা কুয়াশা। কিন্তু কলকাতায় অঘ্রান বোঝা যায় না। এখানে নতুন ধানের আঁটি মাথায় করে কেউ ঘরে ফেরে না, এখানে গরুর গাড়িতে ধানের আঁটি বোঝাই হয় না। খেজুর গাছের গলায় রসের হাড়ি বাঁধে না। এখানে কুয়াশা নেই, শুধু ধোঁয়া আর ধুলো। চোখ জ্বালা করা বাতাস। এখানে শীত আসে না। পৌষ আর মাঘের মাত্র কয়েকটা দিন শুধু এটুখানি শীত আর শীতলতা। ব্যস, এরপর আর শীত টের পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ ভোর রাত্রে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামায় ঠাণ্ডা ভাবটা অন্যদিনের চাইতে বেশি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে ঠাণ্ডা টের পাচ্ছিল, কিন্তু এখন ? এখন তার শরীর ঘেমে যাচ্ছে।

আবছা অন্ধকারের দিকে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী ? থাকা হয় কোথায় ?'

নারাণের জবাব পেয়ে সামনে বসা দুই বুড়োর একজন তাসে ভাঁজ দিতে দিতে বলল, 'বাঘা কোন হাসপাতালে আছে তা জানি না। তবে বড্ড অসুখ। এখানে আসতে কয়েকদিন সময় লাগবে।'

এরপর আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই নারাণ যেন স্বস্তি পায়। সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। ভিতরের ভয়টা হালকা হয়ে যেতেই সে ভাবল, ওই লোকগুলা কেমনতর মানুষ ? বাঘাদার ডেরায় বসে আস পেটাচ্ছে অথচ বাঘাদা কোন হাসপাতালে কেমন আছে সে খবরটুকু পর্যন্ত রাখে না। বাঘা যদি শক্ত

BanglaBook.org

ব্যামোতে আরও অনেকদিন হাসপাতালে থেকে যায় তাহলে খোকার ভর্তি হওয়া আটকে যাবে। এই বস্তির কেউই কি জানে না, বাঘাদা কোন হাসপাতালে আছে? বস্তির অনেকেই তো বাঘাদার কাছ থেকে অনেক রকম সুযোগ-সুবিধে পায়।

নারাণ ঘরে ফিরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। পদ্ম জিজ্ঞেস করল, "চা খাবে?'

নারাণ বলল, 'না।'

আরও একটু পরে পদ্ম জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'না।'

রাতের রান্না শেষ করে পদ্ম এসে বসল নারাণের পাশে। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ গো করসেবা কারে কয়?'

নারাণ উত্তর দেয়, 'জানি না। মানুষ মানুষের জন্যি কত রকম সেবা-টেবা করে ওই রকম একটা কিছু হবে।'

পদ্ম আবার প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ গো অযোধ্যা কোথায়?'

নারাণ এবার বিরক্ত গলায় জবাব দেয়, 'তুই কি আমারে ইস্কুলের মাস্টার ঠাওরেছিস। ও সব আমি জানি না।'

এবার পদ্মর গলাতেও উষ্মা ফোটে। সে বলে, 'তুমি তো কিছুই খবর রাখো না। মুদি দোকানে লোকে বলাবলি করছিল ওই অযোধ্যাতে নাকি করসেবা হবে। তাতে গণ্ডগোল হতি পারে।'

নারাণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেয়, 'তাতে আমাদের কী! কোন মুলুকে অযোধ্যা, সেখানে কারা গণ্ডগোল করবে তাতে বেলেঘাটা আর ট্যাংরাতে কী হবে। তুই বেগুন পোড়া মাখতে যা।'

বেগুনপোড়া খেতে নারাণ খুব ভালবাসে। গাঁয়ে থাকতে বেগুন কিনতে হত না, কিন্তু এখানে কিনতে হয়। হাতে পয়সা থাকলেই তাই নারাণ বেগুন কেনে। কদমখণ্ডীতে ঘরের পিছনে নিজের জমিতেই ধনেপাতা হত। দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়ে থাকলেও ধনে পাতার গন্ধ পেত নারাণ। কিন্তু এখানে তেমন গন্ধ নেই। হাতে নিয়ে রগড়ালে তবে এটু মিনমিনে গন্ধ ছাড়ে। সেই ধনে পাতাও এখানে আঁটি ধরে বিক্রি হয়। শীতকালে বেগুন, পেঁয়াজ আর ধনেপাতা হলে নারাণের আর কিচ্ছু লাগে না। কিন্তু পদ্ম ঘ্যানঘ্যান করে। নাক ফুলিয়ে বলে, 'শুধু বেগুন আর ধনেপাতা কিনলেই হল। তেলের ছেরাদ্দ হয়ে যায়, সেটা বোঝ না?'

নারাণ বোঝে, কিন্তু লোভ সামলাতে পারে না। তাই পদ্মর ঘ্যানঘ্যানানি তাকে সহ্য করতে হয়। রাত্রে খেয়ে শুয়ে পড়ার পর পদ্ম আবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি অযোধ্যার কথা জান না?'

নারাণ বলল, 'না। ইস্কুলে পড়েছি, অযোধ্যাতে নাক রামচন্দ্র জন্মেছিলেন। তা সে তো ছিল গল্প কথা। ও আবার সত্যি হয় নাকি! তবে তো রূপবানও সত্যি! বারো দিনের ছেলের সঙ্গে একটা ধামসী মেয়ের বিয়ে।'

পদ্ম এবার বিছানার ওপর উঠে বসে বলে, 'বকুল পিসি তো সরকারি হাসপাতালে কাজ করে, সেই বকুল পিসি অনেক খবর রাখে। পিসিই বলছিল, খালপারের মোসলমানরা নাকি ভয়ে ভয়ে আছে। ওরা বলছে, কিছু একটা ঘটলে এবার আমরাও ছেড়ে দেব না। হয় মরব নয়তো দেশ ছাড়ব।'

নারাণ চোখ খুলল। অন্ধকারে পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বকুলপিসি

BanglaBook.org

কোন হাসপাতালে কাজ করে ?'

পদ্ম উত্তর দিল, 'তা বলতে পারব না।'

নারাণ আবার জিজ্ঞেস করে, 'বকুল পিসি জানে, বাঘাদা কোন হাসপাতালে আছে ?'

পদ্ম উত্তর দিল, 'তা কেমন করে জানব। তুমি পিসিরে শুধায়ে দেখলেই পার।'

কিন্তু বকুল পিসি নারাণকে অবাক করে দিল। বাঘাদার ব্যামো হয়েছে শুনে বকুল পিসি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। কারও অসুখের কথা শুনে কেউ এমন করে হাসতে পারে ? বকুল পিসি হেসে যাচ্ছে আর নারাণ ক্রমাগত অবাক হয়ে যাচ্ছে। হাসি থামলে বকুল পিসি বলল, 'বাঘার তো ইচ্ছে অসুখ। কখন কোন হাসপাতালে সেঁধোয় সে কথা কে জানবে।'

নারাণ আরও দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করেও হাসপাতালের নামটা জানতে পারল না। এরপর আর সে কী করতে পারে। বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিল। নিজের কারখানায় গিয়ে খবর পেল সদরহাটি থেকে স্যার এয়েচেন কলকাতার অফিসে। কারখানা থেকে ছুটি হবার পরই নারাণ ছুটল কলাকার স্ট্রিটে স্যারের অফিসে। গেলবার স্যার কথা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি পুলিশের খাতা থেকে নারাণ আর গফুরের নাম কাটিয়ে দেবেন। নাম কাটিয়ে দিতে পারলেই নারাণ কদমখণ্ডীতে নিজের ভিটেতে ফিরে যেতে পারবে। কলকাতার চাকরিটা সে ছাড়বে না। শুধু মাঝে-মধ্যে গিয়ে ভিটেতে থাকবে। ওই ভিটের সঙ্গে তার নাড়ির টান। এখনও শেষরাতের স্বপ্নে কদমখণ্ডীকে সে দেখতে পায়। ওকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

কলাকার স্ট্রিটে গিয়ে আধঘণ্টা বসতে হল। কিন্তু স্যারের ঘরে ঢুকে তার দু'চোখে বিস্ময় উপচে পড়ল। সে দেখল ঘরের একটা চেয়ারে বাঘাদা, অন্য চেয়ারে টকটকে ফর্সা মতন এক ভদ্রলোক আর নিজের আসনে ভজনলাল স্যার, তার পাশে বনওয়ারীলাল স্যার।

নারাণ বাঘাকেই প্রথমে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ব্যামো সেরে গেছে বাঘাদা।'

নারাণের প্রশ্ন শুনে সবাই মুহূর্তের জন্য চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সবার মুখেই পাতলা হাসি। কিন্তু উত্তর দিলেন ভজনলাল স্যার। তিনি বললেন, 'এখন একটু ভাল আছে। তবে আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে হবে।'

নারাণ বলল, 'আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ বলতে পারেনি আপনি কোন হাসপাতালে আছেন।'

ভজনলাল বললেন, 'ওদের তো জানানো হয়নি। জানতে পারলে সবাই ভিড় করে দেখতে যেত। তাতে খুব অসুবিধে। বাঘা ছিল আলিপুরে বনওয়ারী ভাইয়ের নার্সিং হোমে।'

টকটকে ফর্সা রঙের যে ভদ্রলোকটি বসেছিলেন, যার নাম নারাণ জানে না, সেই ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে ভজনলাল স্যারকে কী যেন বললেন। ভজনলাল স্যারও ইংরেজিতে উত্তর দিলেন। এই কথাবার্তার অর্থ নারাণ বুঝতে পারল না। শুধু চারটে শব্দ তার শোনা, মাস্টারমশাইয়ের মুখেও শুনেছে, 'ইনোসেন্ট' আর 'ইডিয়ট বাট অবিডিয়েন্ট'।

বনওয়ারীলাল নারাণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গাঁয়ের চাইতে এখানে বেশ ভালই তো আছো। গাঁয়ে খেতে পেতে না, চৌধুরীবাবুদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে ক্ষেতে কাজ জুটত। খাটতে যত, পয়সা পেতে তার চাইতে কম। একখানা ছেঁড়া লুঙি না হয় খেটো ধুতি পরে রাস্তায় বেরুতে। এখানে ফুলপ্যান্ট পরছো, জামা গায়ে দিচ্ছো, মাসে

BanglaBook.org

একবার-দু'বার সিনেমা দেখছো—কী দেখছো না ?'

নারাণ মাথা নাড়ল। বনওয়ারীলাল তাই দেখে বললেন, 'তবে আর গাঁয়ে যাবার জন্যে হাঁকু-পাকু করছ কেন। সময় এলে আমরাই ডেকে বলে দেব। কলকাতায় এসে তো তোমার ভাগ্য ফিরে গেছে।'

খিদের কষ্টটা কমেছে, পরনের প্যান্ট-জামারও ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, এসব মিথ্যে নয়। কিন্তু তার রক্তে যে কদমখণ্ডী জেগে আছে, ভিটের টান যে তাকে এখনও টানে, সে কথাটা নারাণ বোঝাবে কেমন করে।

ভজনলাল নিচু গলায় অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ নারাণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নারাণ, তুমি ওই পাশের ঘরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করো। চলে যেয়ো না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নারাণ পাশের ঘরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। মোটা কাচের দরজা বন্ধ হলে ও-ঘরের কোনও কথা এ-ঘরে এসে পৌঁছয় না। ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করার পর ডাক এল নারাণের। টকটকে ফর্সা ভদ্রলোকটি তখন নেই। ঘরের মধ্যে ভজনলাল, বনওয়ারীলাল আর বাঘাদা।

ভজনলাল নারাণকে দেখে বললেন, 'বাঘার কাছে শুনলাম, তুমি ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে চাও। শুনে খুব ভাল লাগল। বাঘা আমাদের উপকারী বন্ধু। ওকে আমরা বলে দিয়েছি তোমাকে দেখতে। তোমার কোনও অসুবিধে হলে বাঘাকে বলবে। কিন্তু তোমাকেও বাঘার কথা শুনে চলতে হবে। মনে থাকবে তো ?

নারাণ মাথা নাড়ল। বাঘা বলল, 'আমাকে যে এখানে দেখেছিস সে কথাটা মুখ থেকে বার করবি না। একবার কথাটা বলে ফেললে দেখবি ম্যাজিকের মতো তোর জিভটা আমার হাতে চলে আসবে।'

ভজনলাল আর বনওয়ারীলাল দু'জনে এমনভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন যে, তাঁরা যেন বাঘার কথাটা শুনতেই পাননি। ওঠবার আগে ভজনলাল বললেন, 'নারাণ, তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। আমরাই ফিরিয়ে দেব। শুধু বাঘার কথা শুনে থেকো।'

ফেরার সময় কলকাতায় বেশ রাত হয়ে গেছে। ন'টা বাজতে যাচ্ছে। বাঘা জিপ গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'তোর বন্ধু, ও নেড়েটা, কী যেন নাম ?'

নারাণ বলল, 'গফুর।'

বাঘা সিগারেট দাঁতে চেপে জিজ্ঞেস করল, 'তোদের দু'জনের খুব ভাব-ভালবাসা, তাই না ?'

নারাণ ভীরু গলায় উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো। ছোটবেলা থেকে এক গাঁয়ে, একসঙ্গে মানুষ। আমার বিপদে গফুর কখনও মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।'

সিগারেট টান মেরে বাঘা মুখে শুধু 'হুঁ' বলে একটা শব্দ করল। জিপে উঠতে উঠতে বলল, 'পরশু নিজের পাড়ায় যাব। শোন, ...'

নারাণ কাছে গেল। বাঘা নারাণের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'গফুরকে বলে দিস বৌ-বাচ্চা নিয়ে ওই বস্তি ছেড়ে যেন অন্য জায়গায় চলে যায়।'

দম আটকে এল নারাণের। সে শুধু ভীত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন ? গফুর কী করেছে ?'

বাঘা বলল, 'কিছু করেনি বলেই তো চলে যেতে বলছি। তোর বন্ধু তো, তাই। দিন

BanglaBook.org

পনেরোর মধ্যে বস্তি পোদ্দারদের দখলে না গেলে ওখানে আগুন জ্বলবে। পোদ্দাররা ওখানে দশ-বারোতলা বাড়ি বানাবে। ওতে রোজগার বেশি।'

নারাণ বলল, 'পোদ্দার কে?'

বাঘা উত্তর দিল, 'তা জেনে তোর বাপের কী হবে। পোদ্দারের পিছনে আছেন ভজনলাল, বনওয়ারীলাল। আর তাদের পিছনে আমাদের দাদারা। রুখবে কোন শালা? শুধু একটু কায়দাবাজি করতে হবে। সেই কায়দাটাই খোঁজা হচ্ছে।'

বাঘা জিপ গাড়িতে উঠে বসল। নারাণ কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থেকে রাস্তা পেরিয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। কলকাতার বুকে তখন অঘ্রানের রাত। উত্তরদিক থেকে সিরসির করে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস।

অনেক ভেবেচিন্তে দিন দুই পর কথাটা গফুরকে বলল নারাণ। গফুর অদ্ভুত চোখে নারাণের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। একেবারে পলকহারা দৃষ্টি গফুরের। তারপর চোখ নামিয়ে এনে বলল, 'এসব কথা তুই কেমন করে জানলি?'

নারাণ বলল, 'সে সব জেনে তোর কাজ নেই। আমার কানে এসেছে তাই তোকে বললাম। তোর কোনও ক্ষতি হলে সেটা আমার সইবে না।'

গফুর হাতের সিগারেটটা হাতে নিয়েই কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর বিমর্ষ গলায় বলল, 'তোর কোনও ক্ষতি হলেও আমার সইবে না। তবুও আমার থেকে-থেকে মনে হয়, আমরা আর আগের মতো দুজন দুজনকে বিশ্বাস করতে পারি না। কদমখণ্ডী আমাদের বিশ্বাস কাড়েনি, কিন্তু কলকাতা বুঝি সেটা একটু একটু করে নষ্ট করছে।'

নারাণ গফুরের কথাটা হজম করল। তার এছাড়া কোনও উপায় নেই। বাঘাদার চর বাতাসেও ঘুরে বেড়ায়। মুখ থেকে কথা খসালে বাঘাদা তাকে ছেড়ে দেবে না। নারাণ গফুরের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'গফুর, সব কথা সব সময় বলা যায় না। এখানে আমাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। কেউ আমাদের দেখবে না। খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। তাই...'

নারাণের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গফুর বলল, 'আমরা আরও ভয়ে ভয়ে থাকি। খালপারে যাওয়ার পর বুঝেছি আমরা এখানে কত অসহায়। মুন্না খুন হওয়ায় পর পুলিশ এসে মুন্নার দলের ছেলেদেরই ধরেছে। কেউ-কেউ ভয়ে পালিয়েছে। জামালউদ্দিন বলেছে, এটাও একটা খেলা। পুলিশহাজত থেকে মুন্নার দলের যারা বেরিয়ে আসবে তারা গিয়ে বাঘার দলে ভিড়বে। না ভিড়লে নানা ছুতোয় আবার তাদের ধরবে। তাই বাঁচবার জন্যে ওরা বাঘার দলে আশ্রয় নেবে।'

নারাণ প্রশ্ন করল, 'মুন্নাকে কে খুন করেছে?'

গফুর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কে করতে পারে?'

নারাণ উত্তর দিল, 'আমি শুনেছি ওর দলের ছেলেরা টাকার হিস্যা নিয়ে কাজিয়া বেধেছিল।'

সিগারেটে টান দিয়ে গফুর এবার হাসল। তারপর বলল, 'কদমখণ্ডী থাকলে এসব বুঝতে পারতুম না। পুলিশ এই কথাটাই রটিয়ে দিয়ে মুন্নার দলের ছেলেদের ধরছে। পুলিশ তো নিজের মর্জিতে করছে না, তাদের দিয়ে করানো হচ্ছে।'

নারাণ এবার অবাক গলায় প্রশ্ন করে, 'তাহলে কে খুন করল?'

গফুর বলল, 'সবাই মনে মনে তার নামটা জানে কিন্তু মুখে উচ্চারণ করে না। সে খুব

BanglaBook.org

হিসেবি লোক। কাউকে খুন করার দু'দিন আগে সে তার পেটোয়া একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়। ওখান থেকে এসে খুন করে আবার সোজা হাসপাতালে চলে যায়।'

গফুরের কথায় নারাণের বুক কেঁপে উঠল। গফুররা কি তাহলে সব জানে, সব বোঝে? সে বলল, 'ও সব কথায় আমাদের গিয়ে কাজ নেই। বিপদ এলে কেউ কাউকে দেখবে না। তুই বরং অন্য জায়গায় উঠে যা।'

গফুর বলল, 'বৌ-বাচ্চা না থাকলে আমি কারও পরোয়া করতুম না। কিন্তু ওদের জন্য খুব ভাবনা হয়। জামালউদ্দিন বলছিল কে এক পোদ্দার নাকি বস্তিটা কিনতে চাইছে। এবার মারদাঙ্গা বাধিয়ে দখল নেবে। সে জন্যে মুন্নাকে খুন করিয়ে তার দলটা ভেঙে দিয়েছে।'

নারাণের গলায় এবার আকুতি ফুটে উঠল। সে বলল, 'যাই ঘটুক, তুই কোনও দলে যাস না। তুই খালপার ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যা। এমন একটা জায়গা খোঁজ যেখানে তুই-আমি একসঙ্গে থাকতে পারি।'

গফুর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'তেমন জায়গা কি আর আছে? খোদার পৃথিবীটাকে মানুষরাই কসাইখানা বানিয়ে ফেলছে।'

গফুরের কারখানায় যাবার তাড়া ছিল বলে সে চলে গেল। নারাণ ওর সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ সাইকেল করে একটা ছেলে এসে তার সামনে দাঁড়াল। নারাণকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, 'বাঘাদা দেখা করতে বলেছে।'

কথাটা বলেই ছেলেটা সাইকেল নিয়ে চলে গেল। নারাণ বাড়ি না গিয়ে চলে গেল বাঘাদার কাছে। কয়েকটা টুকরো-টাকরা কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'গফুর এসেছিল তোর বাড়িতে?'

নারাণ বলল, 'হ্যাঁ, আমিই ডেকে এনেছিলাম।'

বাঘা প্রশ্ন করল, 'কথাটা বলেছিস?'

নারাণ বলল, 'বলেছি।'

বাঘা গলাটা আরও খাটো করল। খাটো গলায় বলল, 'ওদের পাড়ায় জামালউদ্দিন বলে একটা লোক আছে। গফুরকে খুব ভালবাসে। ওর বাড়িতেই মুন্না জিনিসপত্র রাখত। তুই গফুরের কাছ থেকে পাকা খবরটা জোগাড় করতে পারবি?'

নারাণের যেন কান্না পেতে লাগল। বাঘাদা তাকে এসব কাজে কেন ভেড়াচ্ছে। কিন্তু মুখ ফুটে না বলার সাহস নেই তার। সে শুধু ঢোক গিলে বলল, 'চেষ্টা করব।'

বাঘা বলল, 'গফুর জামালদের বাড়িতে যায়। মুন্নার ছেলেদের ধরপাকড় করার সময় পুলিশ অনেক বাড়িতে তল্লাসি করেছে। পাছে জামালের বাড়িতেও তল্লাসি হয়, তাই ইসলাম বিপন্ন, এই ধুয়া তুলে বস্তিতে মিটিং করে পুলিশকে ঝাঁবড়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। ওদের কত সব সংগঠন আছে না, সে সব থেকেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাই ওর বাড়িটা পুলিশ সার্চ করতে পারেনি। দুবাই থেকে আসা কিছু বিদেশি আর্মস মুন্না মেটিয়াবুরুজ থেকে পেয়েছিল। ওগুলো আমার দরকার।' জামাল আবার সংখ্যালঘু সেল-টেলের নেতা।

নারাণের মনে হল এ যেন এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, আর তাকেও ওই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। আপাত শান্ত কলকাতা শহরের বুকের মধ্যে অশান্তির একটা আগুন ধিক ধিক করে জ্বলে উঠছে। এই আগুন কারা জ্বালায়? তারা কেমন দেখতে?

BanglaBook.org

নারাণ উঠে আসার সময় বাঘা আবার বলল, 'খবরটা কিন্তু চাই। হাতে বেশি সময় নেই। দশ দিনের মধ্যে গফুরকে পটিয়ে খবরটা বার করে আন।'

কিন্তু দশ দিনের আগেই কলকাতার বুকের আগুন তার সর্বাঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। নারাণ কিছু টের পাবার আগে, কিছু বুঝে ওঠবার আগে, ভাল করে কিছু জানবার আগে সে বুঝল ধলাডাঙার সাঁওতাল পল্লীর মতো কলকাতাও জ্বলছে। একটা ঘটনা রাতারাতি শহরটাকে বদলে দিল।

সেদিন ছিল রবিবার। অঘ্রানের রবিবারে বকুল পিসির বাড়িতে নাটাইচণ্ডীর পুজো হয়। খোকাকে কোলে নিয়ে পদ্মর সঙ্গে নারাণও গিয়েছিল বকুল পিসির বাড়িতে। একচিলতে উঠোনে কলাপাতার ওপর পুজোর উপকরণ। মাটি কেটে আধ বিঘত চওড়া একটা গর্ত। তার একদিকে সিঁদুরের ফোঁটা। ওটা হল পুকুর। ব্রতকথা বলতে বলতে ওই পুকুরে জল ঢালতে হয়। জল ঢালার সময় মেয়েরা দল বেঁধে উলু দেয়। কদমখণ্ডীতে থাকতে এমন ব্রত সে কখনও দেখেনি। এটা ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষরা করে। মাস্টারমশাইয়ের বৌও করেন। তবে এ বড় জবর পুজো। চালবাটা, না হলে আটা দিয়ে ছোট ছোট পিঠে বানাতে হয়। যদি চোদ্দটা পিঠে বানাও তা হলে সাতখানা হবে নুন দিয়ে আর বাকি সাতখানা আলুনি। তারপর পিঠেগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ওটাই হল মূল প্রসাদ। খাবার সময় সবাইকে দুটো করে পিঠে দিতে হবে। কার ভাগ্যে কী পড়বে কেউ জানে না। কিন্তু যে প্রথমে নুন দেওয়া পিঠে খাবে সে খুব ভাগ্যবান। মানে তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এই পিঠে খাওয়ার সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ফুটে ওঠে, এমনকি পদ্মর মধ্যেও। নারাণ জানে না, এসব জিনিস সত্যি হয় কি না। কিন্তু অন্যদের মতো সেও বিশ্বাস করে। এবার বকুলপিসির বাড়িতে আসবার সময় মনে মনে ভেবেছিল, যদি সে প্রথমে নুন খায় তা হলে গফুর যেন কোনও ঝামেলায় না পড়ে, এটাই প্রার্থনা করবে। যদি দ্বিতীয়টাও নুন হয় তাহলে সে যেন একটিবার কদমখণ্ডীতে যেতে পারে।

তখন সবে সন্ধ্যা হচ্ছে। এরই মধ্যে রাস্তা-ঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। রবিবার দিন সাধারণত এমনটা হয় না। চায়ের দোকানে নানা বয়সী লোকরা ভিড় করে আছে রেডিয়োর সামনে। নারাণ এসব দৃশ্য থেকে কিছু অনুমান করতে পারেনি। পদ্ম আর খোকাকে নিয়ে সে পৌঁছে গেল বকুল পিসির বাড়িতে। ব্রতকথা শুরু হবার একটু পরেই বকুল পিসির বর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, 'ব্রত থামিয়ে বাজারের ব্যাগ দাও। কাল বাংলা বনধ।'

বকুল পিসি অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন ? কী হয়েছে ?'

বকুল পিসির বর নিজেই দেওয়ালের হুকে ঝোলানো নাইলনের ব্যাগটা নামিয়ে নিতে নিতে বলল, 'কেন আবার কী। করসেবা করতে গিয়ে বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারই জন্যে বামফ্রন্ট আর কংগ্রেস দু পক্ষই বনধ ডেকেছে।'

কে একজন প্রশ্ন করল, 'দু' দলই একসঙ্গে ডেকেছে ? তবে তো দারুণ বনধ হবে।'

বকুল পিসির বর বলল, 'কে কত বেশি পীরিত দেখাতে পারে এখন তারই প্রতিযোগিতা চলবে। নেড়েদের তোয়াজ করে করে ওদের মাথায় তুলেছে। পোড়ো মসজিদ নিয়ে সারা দেশে কান্নার বান ডেকে যাচ্ছে।'

নারাণ মনে মনে ভাবল, কতদূরে কোন একটা দেশে মসজিদ ভাঙা নিয়ে বকুল পিসির বরের এত উত্তেজনা কেন ? এসব নিয়ে কলকাতাতেও কোনও গণ্ডগোল হবে কি। বকুল

BanglaBook.org

পিসি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের ব্রতকথা শুরু করে। আগের মতো ধীরে ধীরে গল্প বলার ভঙ্গিতে আর বলতে পারে না। তরতর করে কোনও মতে গল্পটা শেষ করতে পারলেই সে বাঁচে। ব্রতকথা যখন শেষ হতে যাচ্ছে তখন ছুটতে ছুটতে এল বকুল পিসির ছেলে গোবিন্দ। মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি ব্রত ফিনিশ কর। দাঙ্গা লেগে গেছে।

'দাঙ্গা' শব্দটা যেন কেউটের ছোবলের মতো সবাইকে একসঙ্গে ভীত আর সন্ত্রস্ত করে তুলল। বকুল পিসির গলায় আতঙ্ক আর আর্তনাদ একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছেলেকে বলল, 'তোর বাবা তো বাজারে গেল।'

অসহিষ্ণু গলায় গোবিন্দ বলে উঠল, 'ওস্তাদি করে তাঁর যাবার দরকার কী। গোলক সাহার দোকান থেকে আলু, ডিম আর ডাল এনে রাখলেই তো হত। একে চোখে দেখে না—'

গোবিন্দ গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পিছন থেকে বকুল পিসি ডাকল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস ?'

গোবিন্দ উত্তর দিল, 'বাবাকে নিয়ে আসি।'

ব্রতকথা শুনতে যারা এসেছিল তারা অনেকেই চলে গেছে। বকুল পিসি বলল, 'নাও-নাও চটপট প্রসাদ নাও। মা নাটাইচণ্ডী সবাইকে ভাল রেখো।'

পদ্মকে নিয়ে ফিরে আসার মুখে বকুল পিসির বরের সঙ্গে দেখা হল নারাণের। নারাণকে দেখে বকুলপিসির বর বলে উঠল, 'তোমরা এখনও যাওনি ? ওদিকে মেটেবুরুজ, হাওড়া, তিলজলাতে খুন-খারাপি শুরু হয়ে গেছে। এই মসজিদের জন্য কত প্রাণ যাবে কে জানে।'

বস্তির রাস্তায় পা দিয়ে নারাণ টের পেল আতঙ্কটা বিষাক্ত ধোঁয়ার মতো শহরটাকে গিলে ফেলছে। দোকানগুলো খোলা এবং তার সামনে ছোট-ছোট জটলা। শিবমন্দিরের চাতালে লুঙি পরে যে ছেলেগুলো ক্যারাম খেলে তারা আজ খেলছে না। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ব্যস্ত। নারাণ আর তার বৌকে দেখে ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'কলকাতায় গণ্ডগোল লেগে গেছে। মেয়েছেলে নিয়ে বাইরে ঘুরবেন না ; বাড়ি যান।'

নারাণ বাড়ি এল। খোকা আসবার সময়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। পদ্ম তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে শাড়ি বদল করল। বস্তির গা ঘেঁষে একটা মিছিল যাচ্ছে। 'বাংলা বন্‌ধ—বাংলা বন্‌ধ' ছাড়া মিছিলের আর কোনও কথা স্পষ্ট করে শোনা গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নারাণ খালপারের দিকে তাকাল। তার বারবার গফুরের কথা মনে পড়ছে। গফুরের শরীরে মায়ের দয়া হয়েছে। পরশুদিন নারাণ গিয়ে দেখে এসেছে গফুরকে। গফুর সেদিনই বলেছিল, 'বড্ড ভয় হচ্ছে রে। জামালউদ্দিন বলছিল, বাবরি মসজিদ ভাঙা হতে পারে। যদি হয় তাহলে জোর গণ্ডগোল হবে।'

নারাণ বলেছিল, 'দেখ কে ভাঙবে, কেন ভাঙবে, ভেঙে কী লাভ হবে আমরা তার কিছুই জানি না। ভয় ছাড়া আর কিছুই তো আমাদের পাওয়ার নেই।'

গফুর তার শুকনো মুখ তুলে মশারির ভিতর থেকে নারাণকে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'যদি তেমন কিছু ঘটে তবে সাবধানে থাকিস।'

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে নারাণের ইচ্ছে করছিল একবার গফুরের কাছে যায়। এখন গফুরের পাশে সে থাকলে গফুর কি একটু সাহস পেত ?

বাংলা বন্‌ধের দিনই কলকাতায় কার্ফু জারি হয়ে গেল। নানা মুখ থেকে নানারকম আতঙ্ক বাতাসে ছড়াতে লাগল। কেউ কেউ বলছে পার্ক সার্কাসে, তিলজলায় আর মেটেবুরুজে একশোর ওপর হিন্দুকে কুপিয়ে মারা হয়েছে। মেটেবুরুজে মেয়েদের পরনের শাড়ি খুলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে মুসলমানরা। খালপারের মুসলমানরা মসজিদের ভিতর অস্ত্র জমা করছে। যে কোনও সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে এপাড়ার হিন্দুদের ওপর। বন্‌ধের দিন কলকাতা একেবারে থমথমে। নারাণ শহরের অবস্থা বুঝতে গুটি গুটি পায়ে বড় রাস্তার মুখে এসে দাঁড়াল। গলির মুখ থেকে রাস্তাটা দেখা যায়। বন্দুক উঁচিয়ে এক গাড়ি ভর্তি পুলিশ চলে গেল। দূরে কোথাও বুঝি দমকল ছুটে যাচ্ছে। তার ঘন্টাধ্বনি এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। নারাণ গলির মধ্যে দিয়ে ফিরে আসতে গিয়ে দেখল ক্লাবঘরের বারান্দায় সবাই হুমড়ি খেয়ে কাগজ পড়ছে। ক্লাব ঘরের সামনে দিয়ে আসতে আসতে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। প্লাসটিকের বালতি করে কল থেকে জল নিচ্ছিলেন। নারাণ গিয়ে সামনে দাঁড়াল। নারাণকে দেখে মাস্টারমশাই বললেন, 'চারপাশে খুব গণ্ডগোল। সাবধানে থেকো। রেডিয়োতে শুনলুম কালও বন্‌ধ। কাল আবার ভারত বনধ।'

নারাণ জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, শহরে নাকি দাঙ্গা লেগে গেছে। মুসলমানরা নাকি কুপিয়ে কুপিয়ে বহু হিন্দুকে মেরেছে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'দাঙ্গার সময়ই এসব রটে। হিন্দুপাড়ায় রটবে মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে আর মুসলমান পাড়ায় ছড়ানো হবে হিন্দুরা শয়ে-শয়ে মুসলমান নিধন করছে। তবে দাঙ্গা চলছে। লোকও মরছে। সবই সাধারণ মানুষ। দাঙ্গাবাজরা তো মরে না। শুধু কলকাতায় নয়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে দাঙ্গা চলছে। বহুলোক বলি হবে সন্দেহ নেই।'

নারাণ আরও একবার খালপারের দিকে তাকাল। গফুরের জন্য তার মন ছটফট করছে। বাড়ি এসে খানিকক্ষণ ভাবল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকের কাছে খবর নিল এদিকে কোনও গণ্ডগোল আছে কি না। তারপর একসময় তার মধ্যে মরিয়া জেদ চেপে গেল। নারাণ এ গলি, সে গলির ভিতর দিয়ে বড় রাস্তায় এল। রাস্তা পেরিয়ে গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে এসে পৌঁছল গফুরের ঘরের সামনে। বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা দিতেই ভয় পাওয়া গলায় গফুর বলল 'কে ? কে ?'

বাইরে থেকে নারাণ উত্তর দিল, 'আমি, নারাণ।'

দরজা খুলল গফুর। একটা চাদরে তার গা ঢাকা। রুগ্ন মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া তাকে আরও রুগ্ন আর কাহিল করে রেখেছে। সে শুধু বলল, 'তুই। চারপাশে এত গণ্ডগোল, এর মধ্যে তুই এলি ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'না এসে পারলাম না। তোর কথা বড্ড মনে হচ্ছিল।'

গফুরের ছেলেটা নীচে শুয়ে কাঁদছিল। নারাণ বলল, 'শাহজাদা কাঁদে কেন ? রাবেয়া কই ?' গফুর বলল, 'আর বলিস না। বিপদ যখন আসে তখন একসঙ্গে আসে। কাল থেকে রাবেয়ার গায়েও গুটি বেরিয়েছে। ছেলেটাকে যে কে দেখবে, কে খাওয়াবে আল্লা জানে।'

নারাণ এবার খেয়াল করে দেখল চৌকির তলায় মাদুর পেতে রাবেয়া শুয়ে। নারাণ শাহজাদাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল, 'আমি ওকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোদের দেখভাল করবে কে ?'

BanglaBook.org

মিন মিন করা গলায় রাবেয়া বলল, 'আমাদের তবে ভাবনা নাই। শাহজাদারে নিয়েই ভয় আর ভাবনা। ওরও যদি হয় তাহলে তো মরে যাবে।'

নারাণের আদর পেয়ে শাহজাদার কান্না কমে গেল। গফুর জিজ্ঞেস করল, 'শহরে নাকি জোর গণ্ডগোল বেধেছে?'

নারাণ বলল, 'হ্যাঁ।'

গফুর বলল, 'কাল সন্ধেবেলা জামাল ভাই দেখতে এয়েছিল। পীরের জলপড়া দিল। তিনিই বলছিলেন, মসজিদটারে একেবারে ভেঙে দিয়েছে। বিলেতি টিভিতে নাকি সব দেখিয়েছে।'

নারাণ বলল, 'ওই নিয়েই তো শহরে গণ্ডগোল। দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে।'

গফুর বলল, 'হ্যাঁ, জামাল ভাই বলছিলেন হাওড়া আর তিলজলায় হিন্দুরা বেছে বেছে মুসলমানদের গুলি করছে, ভোজালি দিয়ে গলা কাটছে। নাখোদা মসজিদেও নাকি বোমা মেরেছে।'

নারাণ বলল, 'দেখ ভাই, আমি অত জানিনে। তবে লোকে যত কথা বলে তত কথা সত্যি নয়।'

চৌকির তলা থেকে রাবেয়া কান্নার গলায় বলল, 'আমাদের কী হবে গো। আমাদের কি হিন্দুরা কেটে ফেলবে?'

একথার উত্তর নারাণ জানে না। তবুও সে বলল, 'শহরে পুলিশ ঘুরছে। মিলিটারিও ঘুরছে। কাটাকাটি বন্ধ হয়ে যাবে। ঘরে এসে কাটা অত সোজা নয়।'

তারপর গফুরের দিকে ফিরে নারাণ বলল, 'গফুর, তুই মোটেও বেরুবি না। রাস্তায় কাউকে দেখলেই মিলিটারি গুলি করে মেরে দেবে।'

ক্লান্ত গলায় গফুর বলল, 'সারা গায়ে গুটি। এসময় কে আর ঘরের বাইরে যায়।'

শাহজাদাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নারাণ বলল, 'কালও কিন্তু বন্ধ। কালকে ভারত বন্ধ। মাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছি। সারা দেশে নাকি মিলিটারি টহল দিচ্ছে। গোলমাল বাধতে দেখলেই গুলি করবে।'

দরজার গায়ে হাত রেখে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে গফুর বলল, 'এত মিলিটারি একদিন আগে টহল দিলে হয়তো দাঙ্গা বাঁধত না।'

গফুর লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল।

নানা গলি ঘুরে বড় রাস্তা পেরুবার আগে নারাণ থমকে দাঁড়াল। মধ্য দুপুরের এমন থমথমে শহর সে আগে কখনও দেখেনি। শাহজাদা নারাণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাঁধের ওপর থেকে শাহজাদার ঘুমন্ত মুখটা কেবলই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। নারাণ শাহজাদাকে বুকে চেপে ধরে রাস্তাটা পেরিয়ে এসে আবার গলির মধ্যে ঢুকে গেল। বস্তির মধ্যে জায়গায়-জায়গায় মানুষের জটলা আছে। সবার মুখেই অধীর উত্তেজনা, ভয় পাওয়া শুকনো মুখ, নয়তো অজানা আতঙ্কে গুম মেরে থাকা মুখগুলো দেখলে বোঝা যায়, মানুষের পাপ মানুষকেই কত বিপন্ন আর অসহায় করে তুলেছে। শাহজাদা তখনও ঘুমিয়ে। বস্তির কেউ কেউ নারাণকে চোখ তুলে দেখল। বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা শিশুর জাত নিয়ে বস্তির কেউ কি প্রশ্ন তুলবে? কিন্তু কেউ কোনও কথা বলল না। প্রশ্নও করল না। শুধু হারানদা বললেন, 'ভরদুপুরে ছেলে কোলে কোথায় গিয়েছিলে?'

নারাণ কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল। হাসিটা চেষ্টাকৃত। যে গতিতে সে আসছিল তার চাইতে গতিটা বাড়াল। গফুরের কাছ থেকে শাহজাদাকে নিয়ে আসার

সময় তার খেয়াল হয়নি এটা কলকাতা, কদমখণ্ডী নয়। কদমখণ্ডী গ্রামের নিয়ম এখানে চলে না। জানতে পারলে তার বস্তির মানুষরা হয়তো খুশি হবে না। কিন্তু তাই বলে ওই বাড়িতে শাহজাদাকে ফেলে আসবে কেমন করে। কে দেখবে ছেলেটাকে? নারাণ নিজের ঘরে এসে পদ্মর কোলে ঘুমন্ত শাহজাদাকে দিয়ে বলল, 'কাউকে কিচ্ছু বলো না।'

পদ্ম বলল, 'যদি দেখতে পেয়ে কেউ কিছু বলে।'

নারাণ বলল, 'তাহলে যা সত্যি তাই বলবে। বাপ-মা দুজনেরই মায়ের দয়া হয়েছে। কচি বাচ্চাটাকে দেখার কেউ নেই। তাই নিয়ে এসেছে।'

পদ্ম ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'লোকে বলাবলি করছিল আজ রাতেই নাকি খালপারের মোচলমানরা দল বেঁধে এপারে আসবে। রাজাবাজারের লোকেরাও আসবে ইদিক থেকে।'

নারাণ বলল, 'ওদিকে গফুর আর রাবেয়া শুনেছে হিঁদুরা নাকি নাখোদা মসজিদ ভেঙে ফেলেছে। রাজাবাজার জ্বলছে। যে কোনও সময় ওদের ওপর হিঁদুরা ঝাপিয়ে পড়বে।'

শঙ্কিত চোখে পদ্ম জানতে চায়, 'কোনটা ঠিক?'

অসহায় গলায় নারাণ জবাব দেয়, 'কিচ্ছু জানি না। নানা লোকে নানা কথা রটাচ্ছে। কেমন করে বুঝব কার কথাটা সত্যি।'

দুপুরের খাবার খেয়ে ওঠার পর বকুল পিসির ছেলে গোবিন্দ এসে নারাণকে ডাকল। গোবিন্দ মাঝে-মধ্যেই আসে। গোবিন্দ কোথাও চাকরি করে না বটে, তবে ওর রোজগার অনেক। ও লটারির টিকিট বেচে, পিয়ারলেস করে, আরও কত কিছু নাকি করে। নারাণের কাছে মাঝে-মধ্যে লটারির টিকিট বেচতে আসে। গত দু'মাস থেকে নারাণকে দিয়ে পিয়ারলেস করাবার জন্য গোবিন্দ উঠে পড়ে লেগেছে। গোবিন্দর ডাক পেয়ে নারাণ দরজা খুলে বেরিয়ে এল। গোবিন্দ বলল, 'নারাণদা, কলকাতায় আট-দশজন খুন হয়ে গেছে। একটু আগে রেডিওতে বলল মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজস্থান মানে কথা সব জায়গাতেই খুন খারাপি চলছে। মুসলমানরা সোর্ড নিয়ে রাজাবাজার থেকে চলে এসেছে শেয়ালদায়। সে জন্য বেলা চারটেতে শিবতলায় আমাদের মিটিং আছে। আমাদেরও তৈরি হতে হবে। হিন্দুস্থানে থেকে নেড়েদের হাতে মার খাব এটা চলবে না।'

নারাণ বলল, 'মাস্টারমশাই বলছিলেন পুলিশ-মিলিটারি নেমে গেছে। বড় গণ্ডগোল কিছু হবে না।'

গোবিন্দর গলায় রাগ ফুটে উঠল। সে বলল, 'মাস্টারমশাই একটা গাঁড়োল। নেড়েদের হাতে মার খেয়ে দেশ থেকে পালিয়ে এল অথচ নেড়েদের জন্যে পীরিত কমে না। নেতারা পীরিত দেখিয়ে নেড়েদের তোয়াজ করে, তার মানে বুঝি। তাদের ভোট চাই। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের ধান্দাটা কী?'

নারাণ চুপ করে থাকে। গোবিন্দ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলে, 'মেটিয়াবুরুজে কী হচ্ছে সেটা মাস্টারমশাই জানে? কাশ্মীরে যখন হিন্দুদের মন্দির ভেঙেছিল তখন আমরা কলকাতায় দাঙ্গা করেছি? ওদের আল্লা আছে, আমাদের ভগবান কি ফ্যালনা। এবার শালা লড়তে হবে। তুমি চলে এসো।'

গোবিন্দ চলে যেতে নারাণ সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বসল। তার মনে হল এ তো বিষম গেরো। আগুন না থামিয়ে কেবলই খুঁচিয়ে দিচ্ছে গোবিন্দরা। অথচ মিটিঙে না গিয়ে উপায় নেই। না গেলেই উল্টো পাল্টা ভাববে। কিন্তু মিটিং সম্পর্কে নারাণ যা ভেবেছিল এই মিটিংটা তেমন হল না। সকলেই কিছু-কিছু কথা বললেন। মাস্টারমশাই

BanglaBook.org

বিজয় মিত্র, নিত্যানন্দ হাজরা আর হরিহর চাটুজ্জ্যের সঙ্গে রেলের চাকুরে ওসমান আলি আর আশ্রব আলিও দু'চার কথা বললেন। মোদ্দা কথা হল, সবাই মিলে-মিশে থাকবেন। বাইরে থেকে কোনও হামলাবাজরা এলে একসঙ্গে রুখতে হবে। দরকার হলে নেতাদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের অনুমতি নিয়ে আমরা পাড়ায় শান্তি কমিটি করব। নারাণ মনে মনে স্বস্তি পেল। সবাই যদি একসঙ্গে থাকে, হিন্দু-মুসলমান সবাই যদি বোঝে, এই দাঙ্গা তাদের ভাল করবে না, তাহলে আর ভয় কিসের। কিন্তু মিটিং শুনে তার মনে যে শান্তি এসেছিল, মিটিং ভাঙার পর সেটা উবে গেল। বস্তির লোকেরা নিজেদের মধ্যেই ফিসফিস করে বলছিল, 'শান্তি কমিটির পাছায় আগুন। আগে বিশ-তিরিশটা নেড়ে কাটব, দু'দশটা মসজিদ ভাঙব তবে শান্তির কথা ভাবব। মেটিয়াবুরুজ আর তিলজলা কি শান্তি মারাচ্ছে? এবার প্যাঁদানির ভয় পেয়েই ওসমান এসেছে শান্তি মারাতে। শালা তিনকুড়ি বয়সে তিনটে বৌ নিয়ে শোয়। শেষ বিয়েটা করেছে পঞ্চাশ বছরে। আটাশ বছরের ডবকা মাল। ভোট পাবার জন্যে ওদের জন্যে আলাদা আইন। বিলেতে ওদের জন্যে আলাদা আইন আছে? যত রঙবাজি ইন্ডিয়াতে?'

নারাণের বুকে আবার ভয় জমতে শুরু করে। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরে আসে। ঘরের বারান্দায় খোকা আর শাহজাদা খেলছে। নারাণ ওদের দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে পদ্মকে বলে, 'এট্টু চা দেবে।'

পরের দিন সকালে বকুল পিসির গলা কলকলিয়ে ওঠে। ঘরের বাইরে এসে নারাণ দেখে বকুল পিসি বাঁহাতে পরনের শাড়িটা একটু তুলে একটা পা রেখেছে তাদের বারান্দার সিঁড়িতে। অন্য হাতটা নাড়তে নাড়তে বলছে, 'তোদের আক্কেল দেখে মরে যাই। গফুরের ছেলেটাকে এনে ঘরে রেখেছিস। ওদের বাপ-মায়ের বসন্ত হয়েছে তাতে তোদের এত প্রাণ জ্বলে কেন। মুসলমানদের ঘরের সঙ্গে পীরিত দেখালে তোদেরও সর্বনাশ হবে। দেখছিস না দিনকালের অবস্থা। তোদের কি চোখ নেই?'

নারাণ ছুটে এসে বকুল পিসির পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'পিসি তোমার পায়ে পড়ি। এ নিয়ে সোরগোল তুলো না। ওখানে থাকলে ওকে কে দেখবে? কে খাওয়াবে? শাহজাদাও অসুখে পড়বে। তাই ওকে নিয়ে এলাম। আমার খোকার সঙ্গে ওর কী তফাত বলো!'

বকুল পিসি গলায় ঝঙ্কার তুলে বলল, 'অনেক তফাত। জাতের তফাত, ধম্মের তফাত। এর চাইতে বড় তফাত আর কী আছে?'

পদ্ম ছলছল চোখে বকুল পিসির দিকে তাকায়। ওর নাক ফুলে ফুলে ওঠে। হঠাৎ করে পদ্ম বলে ফেলে, 'ধম্ম কি মানুষের চাইতে বড়?'

পদ্মর কথায় নারাণ চমকে যায়। এমন কথা পদ্ম শিখল কোত্থেকে? বকুল পিসি কয়েক মুহূর্ত পদ্মকে দেখতে থাকে। তারপর বলে, 'শেখাচ্ছে বুলি আউরে কদিন বাঁচবি। আমি ওদের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়েছি। আমি জানি ওরা কেমন।'

বকুল পিসি গজ গজ করতে করতে চলে যায়। গোটা বস্তিটা ঝিম ধরে থাকে। নারাণ বুঝতে পারে বড় ঝড় আসবার আগে গাছ-পালা যেমন শান্ত হয়ে যায়, এই ঝিম ধরা ভাবটা তেমনই। হয়তো আরও বড় কোনও অঘটন ঘটবে। নারাণ পদ্মর চোখের দিকে তাকায়। ওর দু'চোখে গভীর শঙ্কা। নারাণ আলতো করে পদ্মর পিঠে হাত রাখে। পদ্ম অসহায় গলায় বলে, 'শাহজাদার কী হবে?'

নারাণ গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'শাহজাদা থাকবে। গফুরের মা বলতেন,

BanglaBook.org

মায়ের কাছে ছেলের কোনও জাত থাকে না। শাহজাদাও তোর কাছে ছেলের মতন। তুই কেন জাত-ধম্মের কথা ভেবে ভয় পাস ?'

পদ্ম আকাশের দিকে মুখ তুলে উদাস গলায় বলে, 'বসুন্ধরাও তো আমাদের মা। তেনার বুকে যারা জন্মায় তাদের এত জাতের বিচার কেন ? মা বসুন্ধরার সব সন্তানই তো এক।'

নারাণ অবাক চোখে পদ্মর দিকে তাকায়। এ যেন কদমখণ্ডীর পদ্ম নয়, এই পদ্ম যেন এতদিনে অনেক জেনে গেছে, অনেক বুঝে গেছে। ওর মধ্যে বড় হয়ে উঠছে মায়ের মন।

নারাণ পদ্মর পিঠে হাত বোলায়। পদ্মর চোখ এখন বারান্দার কোণে। সেখানে মাদুরের ওপর পাশাপাশি শুয়ে আছে খোকা আর শাহজাদা। ওরা জানে না ওদের ধর্ম কী ? ওদের জাত কী ? ওদের দেখে বিশ্বাস হয় না, এরাই একদিন বড় হয়ে শয়তানের দোসর হবে। পরস্পরের দিকে ছোরা বাগিয়ে ধরে ধর্ম রক্ষা করবে। মানুষ মেরে মানুষের ধর্মরক্ষা করে কারা ? কোন শয়তানের শাগরেদরা ?

নারাণের খুব ইচ্ছে করে এখন একবার মাস্টারমশাইয়ের কাছে যায়। ওঁর কথা শুনতে নারাণের ভাল লাগে। নিজের ওপর বিশ্বাস বাড়ে কিন্তু যাবার সময় কোথায় ? আজও বনধ বলে কোনও দোকান-পাট খোলেনি। হারান মণ্ডল কিছু সময়ের জন্য দোকানের ঝাঁপ খুলেছিল। কেউ কেউ সামান্য কিছু কিনেছে। কিন্তু নারাণ সে খবর জানত না। ওদের কারখানায় দশ তারিখে বেতন হয়। এ মাসের বেতন কবে তুলবে সেটা নারাণ বুঝতে পারছে না। বস্তির অনেকেই বলেছে এই দাঙ্গা আরও সাত-আটদিন চলবে।

নারাণ নিজের ঘরের দাওয়া ছেড়ে বাইরে এল। বস্তির অলি-গলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লোকেরা কথা বলছে। সব কথাতেই টগবগে উত্তেজনা। শহরের বাতাসে যতটুকু ভয় ছড়ানো আছে বস্তির লোকেরা মুখে-মুখে তাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। নারাণ এর আগে দাঙ্গার কথা শুনেছে কিন্তু কখনও দেখেনি। দাঙ্গা মানে কি এমনই একটা অবস্থা যাতে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না ?

নারাণ যাচ্ছিল হারান মণ্ডলের দোকানের উদ্দেশে। দোকানের একটা ঝাঁপ তখনও খোলা। নারাণকে দেখে হারান মণ্ডল বলল, 'তুমি নাকি গফুরের ছেলেডারে নিজের ঘরে এনে রেখেছো ?'

নারাণ মাথা নাড়ল। হারান মণ্ডল ডাল মাপতে মাপতে বলল, 'এ সময় এনে ভাল করোনি। পারলে এখনই ফেরত দিয়ে এসো। মুসলমানরা এখন আমাদের শত্রু।'

ব্যাকুল গলায় নারাণ বলল, 'কিন্তু গফুর তো আমার বন্ধু। ওদের অসুখ। ছেলেটাকে দেখবার কেউ নেই। তাই...'

হারান মণ্ডল ডালের ঠোঙা নারাণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যা ভাল বোঝ করো। লোকে কুনজরে দেখছে তাই কথাটা বললুম।'

সন্ধ্যা হবার আগে বকুল পিসির বর এসে ধমক দিয়ে বলল, 'কাজটা ভাল করোনি। কাল সকালেই আপদটাকে খালপারে দিয়ে এসো। যদিও এখন নেড়ে পাড়ায় যাওয়া ঠিক নয়। ওরা ঘরে অস্ত্র নিয়ে তৈরি। মসজিদের ভিতরে বিদেশি বোমা রেখেছে। ওই বোমা খান পাঁচেক মারলে গোটা কলকাতা ছাই হয়ে যাবে। সব আরব দেশের মাল। এখন এসব উৎপাত কেউ ঘরে এনে তোলে ?'

বকুল পিসির বর চলে যাবার পর পদ্ম জিজ্ঞেস করল, 'কী হবে গো ?'

BanglaBook.org

নারাণ অস্ফুটে বলল, 'শাহজাদা থাকবে। ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারব না।'

বিকেল ফুরিয়ে গিয়ে রাত নামল। সেই রাতও একসময় শেষ হল। সকালের আলো ফুটল বস্তিতে। বেলা বাড়তে শোনা গেল কলকাতা শান্ত হয়ে আসছে। পুলিশ আর মিলিটারি দাঙ্গা থামিয়ে এনেছে। মেটিয়াবুরুজে মিলিটারি টহল দিচ্ছে। নারাণ শুনল, বস্তির ভিতরে বাজার বসেছে। আনাজের সঙ্গে মাছও বিক্রি হচ্ছে।

নারাণ গিয়ে বাজার করে আনল। বড় রাস্তার চেহারা আগের দু'দিনের চাইতে স্বাভাবিক। বাসে অফিসযাত্রীদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। নারাণ ভাবল আজ কারখানায় যাওয়া যেতে পারে।

নারাণ কারখানায় গেল। নানা লোকের নানা কথা আর রোমহর্ষক বর্ণনার মধ্যে কাজ করতে করতে যখন চারটা বাজল তখন ম্যানেজার সবাইকে জানিয়ে দিলেন, সবাই যেন কার্ফুর আগে কারখানা থেকে বাড়ি চলে যায়। নারাণ বাড়ি ফিরে এল বাসে করে। শেষ অঘ্রানের হিমেল হাওয়া তখন টের পাওয়া যাচ্ছে। নারাণ বাড়ি ফিরে খোকা আর শাহজাদাকে আদর করল। পদ্ম এসে বলল, 'রাবেয়ার ছেলেটা বড় দস্যি গো?'

নারাণ শুধোল, 'কেন?'

পদ্ম লাজুক মুখে বলল, 'আমার বুকে কি এখনও দুধ আছে নাকি। ওর দুপুরে ঘুমের অভ্যেস যাবে কোথায়? খোকারও ওই অভ্যেস ছিল। মুখে গুঁজে দিতেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল। রাতের বেলাও তাই করে।'

নারাণ বলল, 'ও তো ছোট। রাবেয়া অভ্যেস ছাড়াতে পারেনি। আমি তো ছ' বছর পর্যন্ত মা'র দুধ খেতুম।'

পদ্ম বলল, 'সে সব এখন আছে নাকি! তুমি কৌটোর দুধ এনো।'

নারাণ বলল, 'মাইনে পেলেই আনব। এখন তো গোলমাল থেমে আসছে। মাস্টারমশাই বললেন, দুদিনের মধ্যে সব থেমে যাবে।'

সন্ধ্যার পর ছমছমে রাত নামল। বস্তির ভিতরে এবং বাইরে কোনও কোলাহল নেই। শিবমন্দিরের ঘণ্টা আজও আর তেমন জোরে কেউ বাজাল না। গোটা কয়েক কুকুর থেকে থেকে ঘেউ ঘেউ চিৎকার করতে করতে একসময় থেমে গেল। পদ্মর বুকের কাছে শুয়ে শাহজাদা খুনখুন করে কাঁদছিল। কাঁদতে-কাঁদতে একসময় শাহজাদাও থেমে গেল। বোধহয়, ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরে রাত বাড়তে লাগল কিন্তু নারাণের চোখে ঘুম এল না। ঘুম না এলেই কদমখণ্ডীর কথা তার মনে পড়ে। বন্ধ চোখের পাতায় কদমখণ্ডী ভেসে এল। ভাসতে লাগল বিলকান্দার বিল, ধলাডাঙার মাঠ, বাঘমারির জঙ্গল আর নিজের ভিটেটা। যেন রুপোলি স্বপ্নের মতো একটা ব্যাপার। নারাণের চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ করেই তন্দ্রাটা কেটে গেল নারাণের। চোখ খোলার আগে সে শুনল কেউ যেন তীব্রভাবে শিস বাজাচ্ছে। প্রথমে একটা শিসের শব্দ, তারপর নানা দিক থেকে আরও কয়েকটা। অন্ধকার ঘরে দিক ঠিক করা কঠিন। নারাণের মনে হল বস্তির বিভিন্ন দিক থেকেই শিসের শব্দ আসছে। এখন রাত কত? এত রাত্রে কে শিস বাজাবে? পর-পর কয়েকটা শিসের শব্দ অন্ধকার বস্তিটাকে মুহূর্তের জন্য জাগিয়ে দিয়ে হঠাৎ করে থেমে গেল। নারাণ বিছানার ওপর উঠে বসতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু তখনও চোখের পাতা বোজেনি। মিনিট দুয়েক যেতে না যেতেই পর-পর দুটো বোমা ফাটার আওয়াজ। আওয়াজটা এতই বিকট যে পদ্মও ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে

BanglaBook.org

কাঁপতে লাগল। ঘুম ভেঙে গিয়ে খোকা আর শাহজাদা কাঁদতে আরম্ভ করেছে। পদ্ম দু'হাত দিয়ে দুজনকে সামলাচ্ছে। পদ্ম ভয়ার্ত গলায় বলল, 'কিসের শব্দ হল গো ?'

নারাণ অন্ধকারে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'বুঝতে পারছি না। ঘরগুলান তো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।'

পদ্ম বলল, 'আলো জ্বালব ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'দাঁড়া। জানলা দিয়ে দেখি আর কেউ আলো জ্বেলেছে কি না।'

অন্ধকারেই নারাণ মশারির বাইরে এসে জানলার সামনে দাঁড়াল। জানলার একটা পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গোটা বস্তি জুড়ে বোমার আওয়াজ আর প্রবল হই-হল্লায় নারাণ জানলা বন্ধ করে দিল। কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো শব্দে বোমা ফাটছে। কেঁপে উঠছে নারাণের ঘর। দুম-দাম করে কী যেন ছিটকে এসে পড়ছে তাদের টালির চালে, ঘরের দরজায় আর বারান্দার রান্নাঘরে। বোমার শব্দ, মানুষের হল্লা আর চিৎকার মিশে এমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যে নারাণ কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে তাকে ঘিরেই যেন প্রবল একটা কলরোল ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু এই কলরোল যে সুখ বা উল্লাসের নয় সেটা নারাণের বুঝতে দেরি হল না। সে আস্তে আস্তে জানলার পাট খুলল। ঘর ভাঙার শব্দ, থালা বাসনের শব্দ আর সেই সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ। খোলা জানলা দিয়েই সে দেখল বাইরের অন্ধকারে আলোর অশান্ত দাপাদাপি। নারাণ জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিতেই টের পেল বস্তি জ্বলছে। নারাণ ঝড়ের বেগে এসে দরজা খুলল। প্রথমেই তাকাল খালপারের দিকে। ও দিকের আকাশটা লাল। খালপারের গোটা বস্তিটাই নিশ্চিন্তে জ্বলে যাচ্ছে। আগুন এপারেও। ছুটন্ত মানুষের বিলাপ, মেয়েদের আর্তনাদ আর শিশুদের কান্না মিলে গোটা বস্তি যেন মানুষের হাতে গড়া এক নরক। নারাণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবল, সে কী করবে ? ঘরে থাকবে না বাইরে বেরিয়ে আসবে ? কিন্তু বাইরে কোথায় যাবে ? কোন ঠাঁয় ? বস্তির আগুনটা ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। কালীপুজোর বাজি পোড়ানোর মতো ফেটে যাচ্ছে বোমা। আর একটু পরেই আগুন এসে লাফিয়ে পড়বে তাদের ঘরগুলোতেও। নারাণ আর দেরি করল না। শাহজাদা আর খোকাকে বুকে চেপে ডাকল, 'পদ্ম, বেরিয়ে আয়। আমাদের চালেও আগুন।'

বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নামতে দিয়ে দেখল তার পাশে দীনবন্ধু ঘোষের চালায় আগুন এসে গেছে। আর মাত্র কয়েক হাত দূরেই তার ঘর। নারাণ হতভম্ব হয়ে গেল। সে ঠিক করতে পারল না এখন সে কী করবে ? কোন দিকে যাবে। সে শুধু চিৎকার করে ডাকল, 'পদ্ম বেরিয়ে আয়। আমাদের ঘরেও আগুন।'

শিবতলার দিকে ছুটতে গিয়ে দেখল তার সামনে কয়েকজন লোক। দলের আগে বাঘাদা। চারপাশের ঘরগুলো জ্বলছিল। সেই আলোতে বাঘাদাকে চিনতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। সে বলল, 'বাঘা দা।'

কে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সেটা নারাণ বুঝতে পারল না। তার মনে হল, এখন, এই মুহূর্তে গোটা জগৎ তাকে বলে চলেছে, 'নারাণ পালা, পালিয়ে যা।'

আর্ত মানুষের চিৎকার, ধোঁয়া আর বিকটশব্দের মধ্যে নারাণ পালাতে যাবার আগে পদ্মকে খুঁজল। চিৎকার করে পদ্মকেই ডাকতে চাইল কিন্তু শুকিয়ে যাওয়া গলা থেকে আওয়াজ বেরুবার আগেই বিকট শব্দে একটা বোমা ফাটল। এক ঝলক আলো বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেই থেমে গেল। সে পালকের জন্য মুখ ঘুরিয়ে দেখল তার ঘর

BanglaBook.org

জ্বলছে। আর্তনাদ আর আগুনের মধ্যে দিয়ে এবার সত্যিই নারাণ পালাতে লাগল।

॥ ১০ ॥

পৌষের এক কুয়াশা ঢাকা সকালে নারাণ আবার কমদখণ্ডীতেই ফিরে এল। সে জানত এখানেও আজ আর তার কোনও আশ্রয় নেই। কলাকার স্ট্রিটের অফিসেই সে শুনেছে তার ভিটে এখন ভজনলালের গুদামঘর। নারাণ শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করেছে, 'আমার বাস্তুভিটে ?'

ভজনলাল পানপরাগ চিবুতে চিবুতে উত্তর দিয়েছেন, 'কিসের বাস্তুভিটে ? ওটা তো টাকা দিয়ে আমাকে কবেই বেচে দিয়েছ। তোমার সই-সাবুদও রয়েছে। ওটা এখন আমাদের।'

নারাণের গলা চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছিল। ভজনলাল শান্ত গলায় ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা অফিস। কাজ কারবারের জায়গা। এখানে উঁচু গলায় কথা বলতে নেই। বেশি গলা তুললে হাজতে পুরে দেব।'

নারাণ বনওয়ারীলালের দিকে তাকাল। তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'দেখলে তো তোমাদের ওদিকে কী হল ? দু'বছর থেকে বলছিলাম হাজার বিশেক করে নগদটাকা দিচ্ছি, বস্তি খালি করে দাও। তা শুনলে না। এখন কী হবে ?

নারাণ আস্তে আস্তে উঠে এল। বেরুবার মুখে বাঘাদার সঙ্গেদেখা। বাঘাদা ঘুরছে পুলিশের জিপে। বাঘা নারাণকে দেখল কিন্তু কথা বলল না। দরজাটা বন্ধ হবার আগে শুধু শুনতে পেল বাঘাদা বলছে 'আমার কাজ করে দিয়েছি। জঙ্গল সাফ। এবার অন্যদের ম্যানেজ করার ব্যাপার আপনাদের।'

নারাণ দরজায় গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভজনলাল আক্ষেপের গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা বড্ড ওপেন হয়ে গেল। কেউই ম্যানেজ হবে না। লাখ-লাখ টাকা আগুনে গেল।'

নারাণ আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে এসেছিল পোড়া বস্তিতে। ওই আগুনে গফুর আর রাবেয়া পুড়ে মরেছে। পালাতে গিয়ে পেটে বোমা লেগে রাস্তার ওপর মরেছে পদ্ম। নিষ্ঠুর ঈশ্বর শুধু তাকে আর তাদের দুই সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের বুকে নিয়েই পৌষের কুয়াশা-ঢাকা সকালে কদমখণ্ডীতে এসেছে নারাণ। গাঁয়ের রূপ বদল হয়েছে। হবেই তো, গাঁয়ের অর্ধেক জমি এখন ভজনলাল আর বনওয়ারীলালের। পুড়ে যাওয়া সাঁওতাল পল্লীতে ভজনলালদের করাত কল, আর পেরেক কল। বড় মসজিদের পাশে গফুরদের জমিতে মাদ্রাসা হয়নি। ওটাও দখল নিয়েছেন তেনারা। গাঁয়ের সব জায়গাতেই তেনাদের হাতের থাবা।

নারাণকে দেখে গাঁয়ের লোক অবাক চোখে তাকায়। নারাণ জনে জনে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের চাচি, মানে গফুরের মা কোথায় থাকে ?'

ঠিকানা দিতে পারে না কেউ। সবাই বলে, চাচি তো পাগল হয়ে গেছে। কবে কোথায় থাকে কে জানে। এর-ওর বাড়ি ঘুরে ঘুরে খায়।'

নারাণ থামে না। সে গোটা গ্রাম ঘুরে ঘুরে গফুরের মাকে খুঁজতে থাকে। একদিন পড়ন্ত বেলায় আফজল খবর দেয়, 'চাচি এয়েছে। বাঁশবাগানের ধারে, দরগাতলায় বসে আছে।'

BanglaBook.org

নারাণ ছুটতে ছুটতে আসে। দরগাতলার শান বাঁধানো চাতালে চাচি শুয়ে আছে। নারাণ গিয়ে ডাকে, 'চাচি, ও চাচি।'

চাচি মুখ তুলে দেখে। চোখ পিটপিট করে তাকায়। তার ধুলো মাখা রুক্ষ চুলে বেলাশেষের মলিন আলো এসে লাগে।

নারাণ চিৎকার করে উঠে বলে, 'চাচি আমি নারাণ। গফুরের বন্ধু নারাণ। গফুরের ছেলে...'

চাচি হাতের লাঠিটা তুলে নারাণকে থামতে ইঙ্গিত করে। শরীর ঘষড়ে ঘষড়ে একটু এগিয়ে এসে বলে, 'গফুর কই ? আসে নাই ?'

নারাণের কথা ফুরিয়ে যায়। তার চোখ ঝাপসা হতে থাকে। সে ভেজা গলায় বলে, 'গফুরের ছেলে এয়েছে। তোমার নাতি।'

চাচি আবার শুয়ে পড়ে। হাতের লাঠিটা রাখে পাশে। তারপর পড়ন্ত বিকেলের মলিন আলোর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। বকুল গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ে চাচির মাথার ওপর। দূর থেকে আফজল বলে, 'আর উঠবে না। রেতেরবেলা উঠে একা-একা ঘুরে বেড়াবে। বাইরে থেকে খেতে চাইবে। কারও বাড়িতে ঢোকে না, নিজের ভিটেতেও না।'

নারাণ উঠে এল। আফজলের বারান্দায় খোকা আর শাহজাদা বসে আছে। পাশের খেত থেকে সর্ষেফুলের গন্ধ ভেসে আসছে আফজলের বারান্দায়। নারাণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

আফজল জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবি ? এখানেই থাকবি না কলকাতায় ফিরে যাবি ?'

নারাণ উত্তর দিল, 'জানি না।'

সকালে ঘুম থেকে উঠল নারাণ। একটু আগে ফজরের আজানে তার ঘুম ভেঙেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখল গোটা গ্রাম ঘন কুয়াশায় ঢাকা। দু'হাত দূরের মানুষ নজরে আসে না। নারাণ মোটা চাদরে খোকা আর শাহজাদাকে ভাল করে জড়িয়ে নিল। দরজা থেকে বেরুবার মুখে মশারির ভিতর থেকে আফজল জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

নারাণ বেরিয়ে যেতে যেতে উত্তর দিল, 'জানি না।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সে ভাবল এই দুই শিশুকে নিয়ে সে কোথায়, কোন ঠিকানায় যাবে ? কোথায় এদের নিরাপদ আশ্রয় ?

আফজল উঠে এল তার সঙ্গে সঙ্গে। নারাণ এসে নিজের ভিটের সামনে দাঁড়াল। ভজনলালের গুদামঘরের দরজায় মস্ত তালা ঝুলছে। নারাণ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাঁটতে আরম্ভ করল। দরগাতলায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। দরগার ভিতরে মিটমিটে আলো। দরজার সামনে জনাতিনেক লোক টের পাওয়া যাচ্ছে। পিছন থেকে আফজল এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে ?'

হাতের লণ্ঠন আফজলের মুখের কাছে তুলে ধরে জান মহম্মদ। সে বলে, 'আজানের পর দরগায় বাতি দিতে এসে দেখি রহমত ভাইয়ের বৌ মরে পড়ে আছে।'

নারাণ এগিয়ে এসে চাচিকে দেখে। মুখটা হাঁ করে আকাশের দিকে তুলে চাচি মরে আছে দরগার দরজাতে। একটা পোকা গাছের পাতা থেকে উড়ে এসে বসেছে চাচির

BanglaBook.org

কপালে। নারাণের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

আফজল আস্তে করে ডাকে, 'নারাণ ফিরে চল। কোথায় যাবি ?'

নারাণ কথা বলতে পারে না। সে শুধু একটা আশ্রয় খোঁজে যেখানে তার খোকা আর শাহজাদা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।

কিন্তু কোথায় সে আশ্রয় ? নারাণ দু'চোখে জল নিয়ে তাকায়। কিন্তু কিছু দেখা যায় না। ঘন কুয়াশা সব দৃশ্যপট ঢেকে রেখেছে, এমনকি তাদের গ্রামটাকেও সে আর এখন দেখতে পাচ্ছে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG